ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

১০ম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

দশম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(২০১৯ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন)

দশম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০২০

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এ প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা-নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ অলংকরণ
জাহিদা হক চৈতী

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র
মো. জাকিরুল মাজেদ কনক

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-8757-5

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

পার্লামেন্ট ওয়াচ : দশম জাতীয় সংসদ ১৩
মোরশেদা আক্তার ও নিহার রঞ্জন রায়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ৩১
শাহজাদা এম আকরাম, জুলিয়েট রোজেটি, তাসলিমা আক্তার, কুমার বিশ্বজিৎ দাস ও নাজমুল হুদা মিনা

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার : নীতি এবং চর্চা ৫৫
মহুয়া রউফ

Review Report on Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions ৬৭
Shahzada M. Akram, Juliet Rossette, Marufia Noor

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা ও অধিকার

ঢাকা ওয়াসা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১০৭
মো. শাহ্নূর রহমান ও মো. শহিদুল ইসলাম

ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১২৭
নিহার রঞ্জন রায় ও শাম্মী লায়লা ইসলাম

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৪৩
মো. জুলকারনাইন ও মো. মোস্তফা কামাল

বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী : অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় ১৭১
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, মো. মোস্তফা কামাল ও মো. খোরশেদ আলম

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৮৯
দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ ২০৯
নাজমুল হুদা মিনা

চতুর্থ অধ্যায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অর্থায়ন

বন্যা ২০১৯ মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণকার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ ২২৭
মো. নেওয়াজুল মওলা, মো. মাহ্‌ফুজুল হক, অমিত সরকার, আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া ও এম জাকির হোসেন খান

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ২৪৭
মো. শাহ্‌নূর রহমান, নাজমুল হুদা মিনা ও গোলাম মহিউদ্দীন

জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণ : কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ? ২৬৭
ড. এ কে এনামুল হক, ইশতিয়াক বারী ও ড. রুমি শামিন

গবেষক পরিচিতি ২৭৪

মুখবন্ধ

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিক চাহিদা সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনসহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ৯টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের দশম সংকলন ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা ও অধিকার, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে *শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে* দশম জাতীয় সংসদের (২০১৪-২০১৯) সবগুলো (প্রথম থেকে ২৩তম) অধিবেশনের ওপর টিআইবির নিয়মিত পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা 'পার্লামেন্ট ওয়াচ'-এর সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। ফলে সরকারি জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পায়। সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক উন্নতি দেখা গেলেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি এবং প্রকৃত অর্থে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী হিসেবে ঘোষিত দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করলেও তথাকথিত প্রধান বিরোধী দলের আত্মপরিচয়ের সংকট ও দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তারা প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ ছাড়া সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্বসহ সক্রিয়তার ঘাটতি এবং কমিটিসংশ্লিষ্ট তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-প্রক্রিয়ার পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে; যেখানে দেখা যায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে

নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন একদিকে সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারেনি, আবার অন্যদিকে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ হয়ে যাওয়া কমিশনের ওপর আস্থার ঘাটতি তৈরি করেছে। নির্বাচনে তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ছিল যা নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ক্ষমতাসীন দল ও জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। সংসদ না ভেঙে নির্বাচন করার ফলে একদিকে সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রাধিকার ভোগ করায় ক্ষমতাসীন দল ও জোটের জন্য অতিরিক্ত সুবিধাজনক হয়েছে, অন্যদিকে সরকারবিরোধী দলের নেতৃত্ব ও কৌশলগত দুর্বলতা, নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া, নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড় ও গ্রেপ্তার করার কারণে বিরোধী দল প্রচারণায় অনেকখানি অপারগ ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ছিল ব্যাপক। গবেষণায় নির্বাচনে প্রশাসনিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশের ব্যাপক কারচুপির তথ্য উঠে আসে যা নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সার্বিকভাবে দেখা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হতে পারেনি।

তৃতীয় প্রবন্ধে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা যায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন-সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতনকাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন, সরকারি সেবায় ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন– এ পাঁচটি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক। অন্যদিকে বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন– এ তিনটি কৌশলের চর্চা এখনো শুরু হয়নি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি)। নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণের কারণে জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতিবছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে। অন্যদিকে পদায়নের জন্য উপযুক্ত পর্যাপ্ত পদ না থাকার ফলে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সুফল রাষ্ট্র পাচ্ছে না। সর্বোপরি প্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটার ফলে পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর লক্ষ্য ১৬ অর্জনে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারের সাথে সাথে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ও অবদানের একটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সাথে সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নাগরিক সমাজের এসব প্রতিষ্ঠান একই সাথে নজরদারি ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সরকারি নীতিনির্ধারণকে সঠিক পথে চালিত করতে সফল হয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান করছে। বেশির ভাগ নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষেত্রজুড়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা প্রদান

করছে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের *‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’* নীতি সমুন্নত রাখতে অবদান রাখছে। সরকারের উচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বিশেষ করে লক্ষ্য ১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা এবং তাদের অবদান ও গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া।

সেবা খাত ও অধিকার বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে উঠে এসেছে যে ঢাকা ওয়াসা বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহকসেবা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার চেষ্টা করলেও পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসেবায় এখনো ব্যাপক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ঢাকা ওয়াসার ভিশন ও মিশন অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন এবং পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি রয়েছে। কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ-প্রক্রিয়া, গ্রাহকসেবা কার্যক্রম, ক্রয়-প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। ঢাকা ওয়াসা-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া এলাকাভেদে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসেবার মানের তারতম্য ও ন্যায্যতার ঘাটতি বিদ্যমান। পানির নিম্নমানের কারণে সেবাগ্রহীতাদের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় এবং পানি বিশুদ্ধ করার জন্য জ্বালানির পেছনে খরচ বাবদ বড় অঙ্কের রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। ঢাকা ওয়াসার সেবার নিম্নমানের কারণে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি সেবাগ্রহীতা অসন্তুষ্ট।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দলিল নিবন্ধনের কাজে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের মাত্রা বা প্রবণতা অত্যন্ত বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের জন্য নিবন্ধন-প্রক্রিয়ার সাথে সেবাগ্রহীতাদের একাংশসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ধারাবাহিক স্বার্থান্বেষী যোগসাজশ বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রবন্ধে উঠে এসেছে। ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবা জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়া সত্ত্বেও এই সেবার যুগোপযোগী মান উন্নয়নে আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতির ফলে নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট সব পর্যায়ের দুর্নীতি-সহায়ক পরিবেশ বিকাশ লাভ করেছে এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি কাঠামো অকার্যকর হয়েছে। ফলে ভূমি নিবন্ধনসেবায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ সেবাগ্রহীতা ও সরকার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পরের প্রবন্ধে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে গবেষণার সারাংশ আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ঢাকা শহরের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না রেখে দুই সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতিনির্ভর যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এ ধরনের কীটনাশকনির্ভর মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি থাকার ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা উপযুক্ত ও কার্যকর অ্যাডাল্টিসাইড নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে কীভাবে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কীটনাশক ক্রয়ে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয়

আইন অনুসরণ না করে সরকারি অর্থের অপচয় করা হচ্ছে, নির্ধারিত বাজেটের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না এবং মানহীন কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদ্ধতির দুর্বলতার কারণে সার্বিক মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যায়। এ ছাড়া ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত না করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় না থাকা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির ফলে সময়মতো যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে লোক দেখানো অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের সমন্বয়ের ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে, যা লক্ষাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ।

এ অধ্যায়ের বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে দেখা যায় যে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিতে আদিবাসী, দলিতদের জাতিসত্তা, বর্ণভিত্তিক পরিচয়, ঐতিহাসিক বঞ্চনার বিষয় ও অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং স্বীকৃত নয়। এ ছাড়া সমাজে প্রবহমান '*অস্পৃশ্যতা*' ও বৈষম্যের সংস্কৃতি স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্টজনের একাংশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ফলে সেবা প্রদান-প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। অধিকার পূরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক চর্চা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতীয়মান যে আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ একদিকে তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট নয়, আবার অন্যদিকে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ, চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবাপ্রাপ্তিতে অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ দূরীভূত না হলে তাদের প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন অবশ্যম্ভাবী। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য '*কাউকে পেছনে রাখা যাবে না*' অনার্জিত থেকে যাওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের ওপর দুটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা যায় গত এক দশকে চা-শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা, শৌচাগার ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও সুশাসনের ঘাটতির কারণে সামগ্রিকভাবে তারা এখনো দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। একদিকে মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী যতটুকু অধিকার প্রাপ্য তা থেকেও চা-শ্রমিকরা বঞ্চিত। অন্যান্য প্রদেয় সুবিধার যুক্তিতে তাদের দৈনিক যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের মজুরির তুলনায় অনেক কম। নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির কারণে পুরুষানুক্রমিকভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার থেকে। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানও বাগান মালিকদের প্রভাবে ও দুর্নীতি-সহায়ক যোগসাজশের ফলে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব এবং কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকির কারণে চা-শ্রমিক ইউনিয়নও তাদের পক্ষে

অধিকার আদায়ে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দর-কষাকষি করতে পারছে না।

পরবর্তী প্রবন্ধটি তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে টিআইবির ধারাবাহিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে রচিত। দেখা যায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী ছয় বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। মালিকপক্ষ রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখাকে প্রাধান্য দিলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়লেও ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবা ব্যবহারবান্ধব করা ইত্যাদি বিষয়ে এখনো চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে আইনি সীমাবদ্ধতা ও যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া মজুরি বৃদ্ধিসংশ্লিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে, বিশেষ করে অর্জিত অগ্রগতি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আবার আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ খাতে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনসংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে ২০১৯ সালের বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা যায়, এ বছর বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা এবং বন্যা মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশ প্রতিপালনে ব্যত্যয় লক্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে এনজিওদের কার্যক্রমের সাথে সরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা হয়নি, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করা হয়নি, দুর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়নি এবং অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। আবার ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য সরকারি বরাদ্দও যথেষ্ট ছিল না। এ ছাড়া স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ে ঘাটতি ছিল। ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বন্যাকালীন প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যা আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানেও ঘাটতি ছিল।

পরবর্তী প্রবন্ধে মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থানের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যায় ২০১৭ সালে আসা রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তযোগাযোগ ও তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। রোহিঙ্গা-সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় একদিকে মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যা দীর্ঘায়িত

হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকি ও অর্থনীতির ওপর চাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। সর্বোপরি প্রত্যাবাসন-প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর কর্মসংস্থানসহ বহুমুখী আর্থসামাজিক চাপ ও জাতীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং পরিবেশ ও বনায়ন বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণ করার একটি প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধে দেখা যায়, প্রকল্পগুলোর উপকারভোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর এবং বৈদেশিক সাহায্যের মূল্যায়নে ব্যবহৃত ডিএসি মানদণ্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। জলবায়ু অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প নতুন এবং এখনো মূলত প্রতিক্রিয়ামূলক হওয়ার কারণে একই মাপকাঠিতে বাস্তবায়নে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে অধিকতর অভিগম্যতা অর্জনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত এসব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলামূলক কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট ও পৃথক করা গুরুত্বপূর্ণ।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে– এই প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন– টিআইবির এই প্রত্যাশা। পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

পার্লামেন্টওয়াচ : দশম জাতীয় সংসদ*

মোরশেদা আক্তার ও নিহার রঞ্জন রায়

প্রেক্ষাপট

জাতীয় সংসদ জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদের মূল কাজ– আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। সাংসদরা সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ (১) ধারায় সুনির্দিষ্ট বিধান সাপেক্ষে সংসদকে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'-এর লক্ষ্য ১৬,৬ ও ১৬,৭-এ যথাক্রমে সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এ ছাড়া, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২'-এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন[২] এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের[৩] সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নে সাংসদদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের ওপর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত প্রতিবেদন, যেখানে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* ২০১৯ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংসদীয় কার্যকারিতা

নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করায় দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। কিন্তু সরকারপক্ষের সাথে প্রধান বিরোধী জোটের সমঝোতা আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জন করে। দুই পক্ষের আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি ও বাস্তবসম্মত সমঝোতার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মহলের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী জোটসহ দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করে।[৪] এই সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির আগে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ১৫৩ জন সাংসদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরিক দলগুলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮২ শতাংশ) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে।

২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি দশম সংসদের যাত্রা শুরু হয়। দশম সংসদে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি আসন ও তার শরিক দল ১৩টি আসন; প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি ৩৪টি আসন এবং অন্যান্য বিরোধী ১৯টি আসনে প্রতিনিধিত্ব করে। সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব প্রায় ৭৯; এইচএসসি বা সমমানের প্রায় ১২, এসএসসি ও এর কম ৯ শতাংশ। সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৯, আইনজীবী ১৩, রাজনীতিক ৭ ও অন্যান্য ২১ শতাংশ (শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তা, গৃহিণী, পরামর্শক ইত্যাদি)। জাতীয় পার্টির দ্বৈত অবস্থান– একদিকে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের পরিচয়, অন্যদিকে সরকারের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্তি যা নিজেদের বিতর্কিত অবস্থান নিয়ে পরিচিতির সংকট এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দশম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- দশম সংসদের অধিবেশনের বিভিন্ন পর্বসহ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সাংসদদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা;
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

তথ্যের উৎস ও গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড, অধিবেশন সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়া, সংসদ অধিবেশনে সরাসরি উপস্থিত থেকে অধিবেশন চলাকালে গ্যালারির পরিবেশ, সদস্যদের আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়।[৫] পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ ও সংবাদপত্র।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে সংসদের কার্যক্রম শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। এতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে আছে কার্যদিবস-সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম-সংকট ও সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াকআউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশসংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটিসংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণসংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশক

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগুলোর ভিত্তিতে যেসব বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ–

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম : বিল উত্থাপন, আলোচনা (সংশোধনী ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব), মন্ত্রীর বক্তব্য ও বাজেট (অর্থ আইন) আলোচনা;

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম : প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের ওপর আলোচনা, অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম-সংকট, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ও সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা;

জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা এবং বিভিন্ন আলোচনাপর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়;

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা : সংসদ পরিচালনায় স্পিকারের ভূমিকা এবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার; এবং

সংসদীয় উন্মুক্ততা : সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা।

গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০১৪ থেকে অক্টোবর ২০১৮ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দশম সংসদে কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৪১০, ব্যয়িত মোট সময় ১ হাজার ৪১০ ঘণ্টা ৯ মিনিট এবং বৈঠককাল প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট। সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কিত কার্যক্রমে (৬০ শতাংশ), আইন প্রণয়নে (বাজেট ব্যতীত) ব্যয়িত সময় ১২ শতাংশ।[৬]

আইন প্রণয়ন

দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১৬৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়, যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১২ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সাংসদরা ৬০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট বিভিন্ন বিল উত্থাপনে আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারি সংশোধনী সম্পর্কে বক্তব্য দেন; যা আইন প্রণয়নে ব্যয়িত মোট সময়ের শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৯ সময়কালে ভারতের ১৬তম লোকসভা[৭] আইন প্রণয়নে ৩২ শতাংশ সময় ব্যয় করে।

চিত্র ১ : আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সদস্যদের দলভিত্তিক অংশগ্রহণের সময়ের শতকরা হার

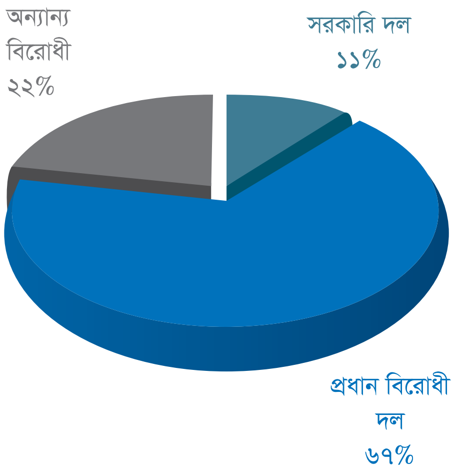

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়। ফলে বিল উত্থাপনের পর এর ওপর সংসদের বিরোধী সদস্যদের আপত্তি, সংশোধনী ও যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচসহ বিল চূড়ান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কণ্ঠভোটের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়। যদিও আইন প্রণয়ন কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায়

বিল পাসের আলোচনায় সরকারি দল ১১ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দল ৬৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ২২ শতাংশ সময় ব্যয় করেছেন। দশম সংসদে পাসকৃত বিলের সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই বিলগুলো উত্থাপন ও বিলের ওপর সাংসদদের আলোচনা এবং মন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৩১ মিনিট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ বিল পাসে ১ থেকে ২০ মিনিট, ৪৫ শতাংশ বিল পাসে ২১ থেকে ৪০ মিনিট, ৮ শতাংশ বিল পাসে ৪১ থেকে ৬০ মিনিট ও ১ শতাংশ বিল পাসে ৬০ মিনিটের অধিক সময় ব্যয় হয়েছে (চিত্র ২)। উল্লেখ্য, দশম সংসদের অধিকাংশ বিল (৭১ শতাংশ) ১ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে পাস হয়। এ ক্ষেত্রে, ভারতে ১৬তম লোকসভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে আলোচনায় প্রতিটি বিলে গড়ে প্রায় ১৪১ মিনিট ব্যয় হয়।[৮] দশম সংসদে ১৯৩টি আইন পাস হয় এবং শেষ সময়ে এসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে দশ কার্যদিবসের ২২তম অধিবেশনে ১৮টি এবং আট কার্যদিবসের শেষ অধিবেশনে ১৯টি আইন পাস হয়। উল্লেখ্য, এই সংসদে ১৬টি বেসরকারি বিল উত্থাপিত হলেও কোনোটি পাস হয়নি।

চিত্র ২ : বিল পাসে ব্যয়িত সময়ের চিত্র

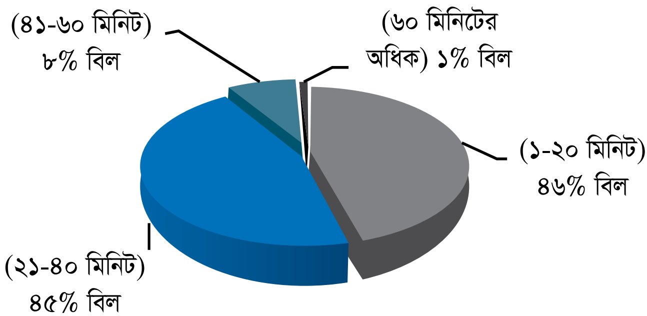

দশম সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে উত্থাপিত বিলগুলোর ক্ষেত্রে মোট ১১ জন সাংসদ বিল উত্থাপনে আপত্তি, ৩১ জন সাংসদ বিলের ওপর সংশোধনীবিষয়ক আলোচনায় এবং ৩৫ জন সাংসদ বিলের ওপর জনমত যাচাইবিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৬ জন প্রধান বিরোধীদলীয় ও দুজন অন্যান্য বিরোধী সদস্য বিল উত্থাপনে আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারি সংশোধনী উভয় অলোচনায় অংশ নেন। আগের সংসদগুলো, বিশেষত অষ্টম ও নবম সংসদের মতো দশম সংসদেও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সাংসদদের মধ্যেও কয়েকজন ছাড়া অন্যরা আইন প্রণয়নের (বাজেটসংক্রান্ত আইন বাদে) আলোচনায় অংশ নেননি। সংসদের এই পর্বে বিরোধী দল ৪৮ শতাংশ সময় ব্যয় করলেও সরকারি দলের অংশগ্রহণ ছিল ২৫ শতাংশ সময়।

এ প্রসঙ্গে দশম সংসদের স্পিকার বলেন, 'বিলের ওপর সরকারি দলের সদস্যদেরও সংশোধনী দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, এমনকি নজিরও রয়েছে। তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তারপরও এত কমসংখ্যক সদস্য বিল পাসের প্রক্রিয়ায় কেন অংশ নিচ্ছেন, সেটা সাংসদরাই ভালো বলতে পারবেন। অভিযোগ রয়েছে, মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সংশোধনীগুলোর যথাযথ জবাব দেওয়া হয় না। প্রস্তাব কেন নাকচ করা হলো, তা-ও জানানো হয় না। এমনকি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ও মন্ত্রীরা টেনে আনেন। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনাও থাকে তাদের বক্তব্যে। মন্ত্রীরা বেশির ভাগ সময়ই বলেন, বিলটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পরে ভেটিং হয়েছে, সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাই এখন বেশি কিছু আলোচনার নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে সক্রিয় জাতীয় পার্টির সাংসদ ফখরুল ইমাম বলেন, 'মন্ত্রীদের সময়ের বড় অভাব। তারা সংসদে যে বিলটি উত্থাপন করেন, তা-ও ভালোভাবে পড়ে দেখেন না। বিলের ওপর প্রশ্ন করা হলে তারা অন্য প্রসঙ্গে জবাব দেন। সংশোধনী প্রত্যাখ্যান করলেও তার কারণ বলেন না। এদিকে তারা মনোযোগ দেন না বলেই একই বিল পাঁচ বছর পার হওয়ার আগেই আবার সংশোধনের জন্য আনতে হয়। বিলটি নানা পর্যায় পেরিয়ে সংসদে আসার যুক্তি দিয়ে তড়িঘড়ি করে পাস করার ব্যাপারে মত দেন মন্ত্রীরা। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সংসদে বিল পাসের প্রক্রিয়াগুলো রাখার দরকার কী'।[৯] এ ছাড়া খসড়া বিল পর্যালোচনা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে এবং আইন সম্পর্কিত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের আগ্রহের ঘাটতি এবং পূর্ববর্তী সংসদের মতোই বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার পাশপাশি আইন প্রণয়নে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের চর্চার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে এই সংসদে। পাসকৃত বিলের ওপর যেসব সংশোধনী সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বিলের বিভিন্ন দফায় বাক্য পুনর্গঠন এবং সমার্থক শব্দাবলি ও বিরাম চিহ্ন সংযোজন-বিয়োজনের প্রাধান্য পেয়েছে।

আলোচিত আইন

দশম জাতীয় সংসদে একাধিক আইন পাস হয়েছে, যেখানে বিতর্কিত কয়েকটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে আদালত এই সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪ প্রথমে কণ্ঠভোটে ও পরে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে (৩২৭-০ ভোটে) পাস হয়, যা বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় নিরঙ্কুশ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল পাস হওয়ার দৃষ্টান্ত।

ব্যাংক কোম্পানি আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে বেসরকারি ব্যাংকে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি অপরাধ করলেও আদালতে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার না করার বিধান রাখা হয়েছে সরকারি চাকরি আইন ২০১৮তে। বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬তে নতুন বিধান যুক্ত করা হয়, যেখানে বলা হয় কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

সম্পর্কে 'বিদ্বেষমূলক বা অশালীন' মন্তব্য করলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর নিবন্ধন বাতিল করার বিধান। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মহলের উদ্বেগ-আপত্তি উপেক্ষা করে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া 'কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের (তাকমিল) সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান প্রদান বিল, ২০১৮' জাতীয় সংসদে পাস করার মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

উপরোল্লিখিত বিতর্কিত আইনগুলো নিয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে নানা ধরনের সমালোচনা হয়।[১০] উল্লেখ্য, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল (২০১৬), ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল (২০১৮), সড়ক পরিবহন বিল (২০১৮), বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী বিলের (২০১৪) ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হলেও এ-সংক্রান্ত পাসকৃত আইনগুলোতে তার প্রতিফলনের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

বাজেট আলোচনা

দশম সংসদে পাঁচটি বাজেট অধিবেশনের আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ৩৩৭ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট, যা সংসদের মোট সময়ের প্রায় ২৪ শতাংশ। মোট সদস্যের ৮৯ শতাংশ বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বক্তব্য দেন। সরকারি দলের সদস্যরা ৭৭ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৮ শতাংশ ও অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ৫ শতাংশ সময় বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বাজেটের বাড়তি আবগারি শুল্ক, বাড়তি ভ্যাট ও সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো এবং সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম বিষয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের পাশাপাশি সরকারি দলের সদস্যরাও কড়া সমালোচনা করেছেন।

বাজেটবিষয়ক সমালোচনার ক্ষেত্রে সরকারি দলের সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায়ের পর্যবেক্ষণেও বলা হয়, 'সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। সংসদে দলীয় অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা তাদের নেই। এমনকি যদি দলীয় সিদ্ধান্ত ভুলও হয়, তাহলেও নয়। তারা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে সংসদ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক দলের নীতিনির্ধারকদের কাছে জিম্মি।' প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেট আলোচনায় খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, যা প্রাসঙ্গিক বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন। তবে, সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট-সম্পর্কিত মূল আলোচনার বাইরে দলীয় প্রশংসা, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সমালোচনা এবং কটূক্তি ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য আগের মতো বিদ্যমান ছিল।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদের মোট ৪১০ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সার্বিকভাবে সাংসদদের গড় উপস্থিতি প্রতি কার্যদিবসে ২২২ জন যা মোট সদস্যের ৬৩ শতাংশ। সরকারি দলের সাংসদদের মধ্যে ৩১ শতাংশ অধিবেশনের মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩১ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের ৩৭ শতাংশ সদস্য এবং ১৭ শতাংশ মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিরোধী সদস্যদের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রীদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ২৫ শতাংশের কম কার্যদিবসে। সংসদ নেতা মোট কার্যদিবসের ৩৩৮ দিন (প্রায় ৮২ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ২৪২ দিন (প্রায় ৫৯ শতাংশ) উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ের উপস্থিতি নবম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি সংসদ নেতার তুলনায় এখনো উল্লেখযোগ্য হারে কম।

অন্যদিকে জাতীয় সংসদের চতুর্দশ থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত সরকারদলীয় একজন সদস্য এবং প্রধান বিরোধীদলীয় একজন সদস্য সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের বিচার চলমান ছিল। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই দুই সাংসদ সংসদে যোগদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদে স্পিকারের কাছে আবেদন জানালে সংসদ সচিবালয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে আবেদনপত্রগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

ওয়াকআউট ও সংসদ বর্জন : দশম সংসদে প্রধান বিরোধীদলীয় বা অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা সংসদ বর্জন করেননি; তবে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা (স্বতন্ত্র) মোট ১৩ বার ওয়াকআউট করেন। অনির্ধারিত আলোচনাপর্বে পর্যাপ্ত কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে; অবরোধের সময় মানুষকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়াকে অভিযুক্ত করে তাকে হুকুমের আসামি না করার প্রতিবাদে; গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে; বিলসংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য দেওয়ার সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদে; 'সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (রেমুনারেশন অ্যান্ড প্রিভিলেজেস) (সংশোধন) বিল ২০১৬' উত্থাপনের বিরোধিতা করে; 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন বিল ২০১৬'-এর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সংসদে তা পাস করার প্রতিবাদে, ব্যাংক কোম্পানি বিলের ওপর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে, প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদে, সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে, বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় বিরোধী দল কর্তৃক প্রেরিত নামের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ প্রদানে বিলম্ব হওয়ার প্রতিবাদে ও বাংলাদেশ বিমানের চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে এসব ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে।

কোরাম-সংকট : দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে মোট ১৯৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়, যা ২৩টি অধিবেশনের প্রকৃত মোট সময়ের ১২ শতাংশ। ২৩টি অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম-সংকটের কারণে অপচয় হয়। সংসদ কার্যক্রম শুরু

হওয়ার নির্ধারিত সময় থেকে কার্যক্রম শুরুর সময় পর্যন্ত এবং নামাজের বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন শুরু পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম-সংকট গণনা করা হয়। প্রথম থেকে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত কোরাম-সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য[১১] ১৬৩ কোটি ৫৭ লাখ ৫৫ হাজার ৩৬৩ টাকা।

জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহি কার্যক্রম

প্রশ্নোত্তর পর্ব : প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব মোট ৫৭টি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয়, এ পর্বে মোট সময়ের ৩ শতাংশ ব্যয় হয়। সরকারি দলের সদস্যরা ৬৩ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ১৮ শতাংশ, অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা ১৯ শতাংশ সময় এ পর্বে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচন (৭৩ শতাংশ)-সংক্রান্ত। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার পরিবর্তে তার বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন নিয়ে সংসদ সদস্যদের আলোচনা।

অন্যদিকে, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ২১১টি কার্যদিবসে মোট ২৫৬ জন সদস্য অধিবেশনের প্রায় ১৬ শতাংশ সময় অংশ নেন। উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৯২টি) মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রকল্প (স্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম), পরিকল্পনা প্রস্তাব ও অবকাঠামো স্থাপন নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বেশি (৩৮ শতাংশ)। এ ছাড়া সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে বিদ্যমান সম্পদ, আয়-ব্যয় ও বরাদ্দ অর্থের হিসাব, বিদ্যমান নিয়মনীতি ও পদক্ষেপ, বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ প্রস্তাব করে সদস্যরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১) : এই পর্বে ১০৫টি নোটিশ উত্থাপিত হয়, আলোচিত হয় ৭০টি, স্থগিত করা হয় ৩২টি। আলোচিত ৭০টি নোটিশের মধ্যে ৬৭টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, যা উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সাংসদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয়, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধিবেশনে একটি করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত তিনটি প্রস্তাব ছিল– মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাটি জরুরি ভিত্তিতে আনার উদ্যোগ গ্রহণ, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা' এবং 'গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়ন করা'। এসব প্রস্তাব সংসদে সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার চাহিদা ও জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার মধ্যে নতুন স্থাপনা ও সেবা প্রবর্তনের প্রস্তাব সবচেয়ে বেশি (৫২ শতাংশ) ছিল। এ ছাড়া নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার কর্মসূচিসংক্রান্ত প্রস্তাবও রয়েছে।

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিশ (বিধি ৭১; বিধি ৭১-ক) : বিধি ৭১ অনুযায়ী জমাকৃত ৪ হাজার ৭৫১টি নোটিশের মধ্যে ২৮৯টি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিশ সংসদে

আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ (৩৫টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। যেসব নোটিশ গ্রহণ করা হয়নি– তার মধ্যে মোট ১ হাজার ৪৩৯টি নোটিশের ওপর মোট ১৬৬ জন সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নোটিশের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (২২৯টি)। উল্লেখ্য, এই বিধিতে নোটিশ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

অনির্ধারিত আলোচনা : এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ সময় ব্যয়িত হয়, মোট ১৩৩ জন সদস্য বক্তব্য দেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের ধরন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, জাতীয় সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি (৩৩ শতাংশ) আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ধরনের মধ্যে মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলা (জননিরাপত্তা) ও বিচারিক সেবা, সমালোচনা ও নিন্দা, সংসদীয় আচরণ ও সাংবিধানিক নীতি, সরকার ও সরকারপ্রধানের জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা : এই আলোচনাপর্বে মোট সময়ের প্রায় ২২ শতাংশ ব্যয়িত হয় যেখানে সরকারি দল ৮৩ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দল ১২ শতাংশ, অন্যান্য বিরোধী সদস্য ৫ শতাংশ সময় আলোচনায় অংশ নেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ এবং সদস্যদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রস্তাব এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া বক্তব্যে প্রাধান্য পেয়েছে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোট সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার (কটূক্তি, আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতা। এ ছাড়া সুশীল সমাজ ও আন্তজার্তিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিভিন্ন অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ের বক্তব্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ আলোচনা : সাধারণ আলোচনায় মোট ১৩১ জন সদস্য অংশ নেন। এই পর্বে মোট সময়ের প্রায় ৪ শতাংশ ব্যয়িত হয়। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি ছাড়া সম্পাদিত সব আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সাংবিধানিক বিধান থাকলেও এই সংসদে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সার্বিকভাবে মোট ৩৪২ জন সাংসদ এই পর্বগুলোর কোনো না কোনো পর্বে অংশ নেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশ নেন ৬ জন সদস্য এবং কমপক্ষে ১টি পর্বে অংশ নেন ১৮ জন সদস্য।

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম : দশম সংসদের ২৩টি অধিবেশনে ৪৮টি কমিটি মোট ১ হাজার ৫৬৬টি সভা করে। এর মধ্যে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ১০৮টি সভা করে।

উল্লেখ্য, বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি সভা করেছে মাত্র দুটি কমিটি। কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয়েছে। আটটি কমিটিতে সদস্যদের (সভাপতিসহ) কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, যা কার্যপ্রণালি বিধি ১৮৮-এর ২ উপবিধির লঙ্ঘন। প্রকাশিত ও প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৪৫ শতাংশ; কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়। বিভিন্ন কমিটির প্রদত্ত সুপারিশ পর্যবেক্ষণ করে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ-সম্পর্কিত সুপারিশ পাওয়া যায় (বিস্তারিত মূল প্রতিবেদনে)। কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিম্নে দেওয়া হলো -

- দুর্নীতিতে জড়িত থাকা সত্ত্বেও বেসিক ব্যাংকের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের দুদক আইনে দোষী সাব্যস্ত না করায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং এদের শাস্তি যাতে নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ।[১২]
- সরকারি হাসপাতালগুলোতে ওষুধ ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে বা অচল গাড়ির নামে জ্বালানি বিল তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডারসংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।[১৩]
- ১৫ লাখ শ্রমিক প্রেরণের ব্যাপারে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ।[১৪]
- খুলনা ১৫০ মেগা পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়েছে কি না, তা তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গঠনের সুপারিশ।[১৫]
- নাইকো দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ।[১৬]
- সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের দুর্নীতি, অনিয়ম চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ।[১৭]
- খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুদামের খাদ্য কারচুপির বিষয়ে তদন্ত করে দায়ী কর্মকর্তাদের বরখাস্তের সুপারিশ।[১৮]
- বই ছাপানোসংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।[১৯]
- স্থানীয় সরকারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে একটি সিস্টেম ও নীতিমালা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রণয়নের সুপারিশ।[২০]
- দক্ষিণাঞ্চলে নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে দুর্নীতি। শেল্টারগুলোর কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরবর্তী বৈঠকে প্রতিবেদন প্রদানের সুপারিশ।[২১]
- অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের (টিআর) বরাদ্দের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান।[২২]
- দেশের ব্যাংকব্যবস্থা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ লুটপাটের ঘটনা কীভাবে ঠেকানো যায় তার উপায় খুঁজে বের করতে কার্যকর গবেষণা করার সুপারিশ প্রদান।[২৩]

- মোবাইলে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।[২৪]

স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। প্রতিবেদন তৈরির সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকায় একেকটি কমিটির প্রতিবেদন কাঠামো একেক রকম, ফলে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। এ ছাড়া পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে এটি কার্যকর নয়।

সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের ভূমিকা : প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং দশম সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে তাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্যে সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারদলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক জোটকে নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার, সরকারে তাদের দ্বৈত অবস্থান উল্লেখযোগ্য। আইন প্রণয়ণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্বে জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা করা, প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় ওয়াকআউটের মতো সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের প্রস্তাবগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে দেখা যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় না দেওয়ায় প্রধান বিরোধী একজন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নই। আমাদের কথা বলতে দিতে হবে। অন্যথায় আগেই বলে দেবেন– কোনো কিছুই বলব না। কথা বলতেই সংসদে আসি। কথা বলা যদি বন্ধ করতে বলেন, তাহলে সংসদে এসে হাজিরা দিয়ে চলে যাব। মন্ত্রীরা যখন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়ান, তখন তারা তো দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ পান।'

জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত : সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সাংসদদের অংশগ্রহণ

এই ২৩টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে ৫৩ শতাংশ নারী সাংসদ উপস্থিত ছিলেন, যেখানে পুরুষ সদস্যদের উপস্থিতি ছিল ২৬ শতাংশ। সরকারি দলের সংরক্ষিত নারী আসনের একজন সদস্য সংসদ কার্যক্রমের সর্বোচ্চ ১০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ১৪ জন (৯ জন সংরক্ষিত আসন), মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৫০ জন (সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জনসহ) নারী সদস্য অংশ নেন। ১১ জন নারী সদস্য বিলের ওপর আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব দেন। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে ২১ জন নারী সদস্য ৬টি নোটিশের ওপর এবং ৭১ (ক) বিধিতে ৩৯ জন নারী সদস্য ৩৫টি নোটিশের ওপর আলোচনা করেন। এ ছাড়া, ৬৭ জন নারী সদস্য মূল বাজেট আলোচনায় এবং ৬৭ জন নারী সদস্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তব্য দেন। আইন প্রণয়ন ও

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে কম। নারী সদস্যদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হলেও সংসদীয় আলোচনায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে সংসদের কোনো না কোনো কার্যক্রমে সব নারী সদস্য অংশ নিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিলে এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

বিভিন্ন আলোচনাপর্বে নারী উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচিত বিষয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা, বাজেট আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, অনির্ধারিত আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, সাধারণ আলোচনাপর্বে নারী-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা হয়। বিভিন্ন পর্বে আলোচিত বিষয় ছিল নারীর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, ঋণ বা অনুদান বিতরণ, অবকাঠামো স্থাপন, নির্যাতন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, নারীদের সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপদ অভিবাসন ইত্যাদি।

সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা : সদস্যদের আচরণ ও ভাষার ব্যবহার এবং সংসদীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা

অধিবেশনের বিভিন্ন আলোচনাপর্বে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন কটূক্তি, সংসদের বাইরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার, যা বিধি ২৭০-এর ৬ উপবিধির ব্যত্যয়। সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে সদস্যদের নির্দেশনা প্রদান করলেও তাদের এ ধরনের অসংসদীয় ভাষা (কটূক্তি, অশ্লীল শব্দ) ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি ছিল। কটূক্তি ও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার বন্ধে সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ না করার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা বিধি ৩০৭-এর ব্যত্যয়। এ ছাড়া কার্যপ্রণালি বিধি (২৬৭-এর উপবিধি ২, ৪, ৮) অনুযায়ী অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষেত্রেও স্পিকারের কার্যকর ভূমিকার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, অধিবেশন চলাকালে সদস্যদের একাংশের সংসদ কক্ষের ভেতরে বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে তার নিকটবর্তী আসনের সদস্য কর্তৃক নিজ আসনে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলার মতো ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়েছে।

সংসদীয় উন্মুক্ততা : সংসদীয় কার্যক্রম ও কমিটির তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতা

সংসদীয় কার্যক্রম টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত রয়েছে যা ইতিবাচক। কিন্তু সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকারিতার ঘাটতি এবং জন-অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা এখনো সীমিত। এই সংসদের মোট ৫০টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪৫টি কমিটির ১০৫টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১১টি কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি প্রায় ৫৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, দুটি কমিটি কোনো সভা করেনি এবং কোনো প্রতিবেদনও

প্রকাশ করেনি। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলেও তা ওয়েবসাইটে বা জনগণের জন্য সহজলভ্য নয়। এই সংসদে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্যসহ সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে সদস্যদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

দশম সংসদের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও কথিত বিরোধী দলের আত্মপরিচয় সংকটসহ দ্বৈত ভূমিকা বিবেচনায় সদস্যদের উপস্থিতি, ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ইত্যাদি নির্দেশকগুলোর ভিত্তিতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলনাযোগ্য নয়। তবে কিছু তুলনাযোগ্য নির্দেশকের ভিত্তিতে অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১ : অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (২০০১-২০০৫)	নবম সংসদ (২০০৯-২০১৩)	দশম সংসদ (২০১৪-২০১৮)
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত সময়	৯ শতাংশ	৮ শতাংশ	১২ শতাংশ
প্রতিটি বিল পাসের গড় সময়	২০ মিনিট	১২ মিনিট	৩১ মিনিট
কার্যদিবস-প্রতি গড় কোরাম-সংকট	৩৭ মিনিট	৩২ মিনিট	২৮ মিনিট
সংসদীয় কমিটি	• সংসদ গঠনের প্রায় দেড় বছর পর কমিটি গঠন • বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নন	• প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন • দুটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের, একটি কমিটিতে অন্যান্য বিরোধী সদস্য	• প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন • একটি কমিটির সভাপতি প্রধান বিরোধী দলের সদস্য
সংসদীয় কমিটির বৈঠক	• তিনটি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• তিনটি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান	• দুটি কমিটির বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠান
কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতি	৬৫ শতাংশ	৬৩ শতাংশ	৫৫ শতাংশ
কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার	৫৮ শতাংশ	৪৩ শতাংশ	৪৫ শতাংশ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদ নির্বাচনে প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকায় নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি, ফলে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব হয় এবং সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পায়। কথিত প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা এবং সরকারি দলের নেতা ও জ্যেষ্ঠ সদস্যদের পক্ষ থেকেও তাদের এই সহাবস্থানকে বিভিন্ন সময়ে অনুমোদন দেওয়ায় প্রধান বিরোধী দলকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকেই। সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারদলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রধান বিরোধীদলীয় সদস্যদের সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দল ও জোট নিয়ে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করলেও কথিত প্রধান বিরোধী দলের এই আত্মপরিচয় সংকট ও দ্বৈত অবস্থানের কারণে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে তারা প্রত্যাশিত শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। অন্যদিকে সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদ কার্যকর করাসংক্রান্ত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন দেখা যায়নি দশম সংসদে।

সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতির (জনমত যাচাই-বাছাই, সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনমত গ্রহণ) কার্যকারিতার ঘাটতির ফলে জন-অংশগ্রহণের সুযোগের চর্চা নিশ্চিত করা যায়নি। অন্যদিকে বাজেট আলোচনায় সরকারি দলের সদস্যদের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে স্বাধীন মত প্রকাশের সীমিত চর্চা দেখা গেলেও সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এ ছাড়া অষ্টম ও নবম সংসদের মতো বিরোধী দলীয় সদস্যরা সংসদ বর্জন না করলেও এর মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রমে তারা যে ইতিবাচকভাবে অবস্থান করছেন তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। সর্বোপরি, সংসদীয় কার্যক্রমের কয়েকটি নির্দেশকে (কোরাম-সংকট হ্রাস, প্রতিটি বিল পাসে ব্যয়িত গড় সময় বৃদ্ধি, প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন, উভয় দল থেকে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য অনিয়ম তুলে ধরে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান ইত্যাদি) পরিসংখ্যানগত ইতিবাচক দিক দেখা গেলেও আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের তুলনামূলক কম অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটির প্রত্যাশিত কার্যকারিতা ও সংসদীয় উন্মুক্ততার ঘাটতি এবং কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকার ঘাটতির ফলে এই সংসদ প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবির সুপারিশ

১. সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে–

- সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অনাস্থার ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে

সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

- 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের সংসদের ভেতরে এবং বাইরের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে।
- সংসদীয় কার্যক্রম এমন হবে যেখানে সরকারি দলের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কার্যকর বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত হবে।

সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

২. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে; সদস্যদের জন্য অধিবেশনে এক্সপাঞ্জকৃত শব্দের তালিকাসহ কার্যপ্রণালি বিধির সহজবোধ্য সংস্করণ হিসেবে 'নির্দেশিকা পুস্তক' তৈরি করা যেতে পারে।

৩. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারকে বিধি অনুযায়ী রুলিং প্রদান ও অসংসদীয় ভাষা এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তি সদস্যদের আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে; জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

৫. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত বিলগুলো সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকেও কার্যকর করতে হবে।

কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি

৬. কোনো কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে ওই কমিটি থেকে তাদের সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

৭. বিধি অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

৮. সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত কমিটিসহ জাতীয় বাজেটে তুলনামূলকভাবে বেশি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত শীর্ষ ১০টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির মধ্যে অর্ধেক কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৯. কমিটির সভায় গৃহীত প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতভাবে কমিটির পরবর্তী সভায় (বিধি অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে) জানানোর বিধান করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

১০. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি, বিধি অনুযায়ী কমিটি প্রতি মাসে একটি সভা করতে ব্যর্থ হলে তার ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন এবং কমিটির প্রতিবেদনসহ সংসদীয় কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে, বার্ষিক সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

১১. সংসদ সদস্যদের সম্পদের প্রতিবছরের হালনাগাদ তথ্যসহ সংসদের বাইরে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ*, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭।

২ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭২।

৩ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ১৯৭৩।

৪ সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), *বাংলাদেশ : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪*, ডিসেম্বর ২০১৭।

৫ মোট ৪১০ কার্যদিবসের মধ্যে ৩০ কার্যদিবস সরাসরি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে গবেষণা দল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছে।

৬ সংসদ টেলিভিশনে প্রচারিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

৭ https://www.prsindia.org (১৭ এপ্রিল ২০১৯)।

৮ *প্রাগুক্ত।*

৯ বিস্তারিত দেখুন দৈনিক *সমকাল*, 'সংসদে মন নেই এমপিদের', ২৮ জানুয়ারি ২০১৮।

১০ বিস্তারিত দেখুন দৈনিক প্রথম আলো, 'দশম জাতীয় সংসদ : কার্যকর সংসদে ছিল জবাবদিহির অভাব', ৩১ অক্টোবর ২০১৭; এবং *বিডিনিউজ২৪.কম*, 'অধিবেশন শেষ করল মিলমিশের দশম সংসদ', ৩০ অক্টোবর ২০১৮।

১১ সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটির ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য দশম সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোতে জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বার্ষিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

১২ দৈনিক *যুগান্তর*, ২৭ আগস্ট ২০১৫।

১৩ দৈনিক *যুগান্তর*, ২৪ আগস্ট ২০১৫।

১৪ প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি– প্রথম রিপোর্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৪।

১৫ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট– দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮।

১৬ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট– দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫০।

১৭ অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি– প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৮।

[১৮] খাদ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি– প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৬।

[১৯] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি– দ্বিতীয় রিপোর্ট, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৮২।

[২০] অনুমিত হিসাব-সম্পর্কিত কমিটি– প্রথম রিপোর্ট, ২০১৭,পৃষ্ঠা ৭৩।

[২১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি– (প্রথম বৈঠক)- প্রথম রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৪৮।

[২২] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১১তম বৈঠক)– প্রথম রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৯২।

[২৩] পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (৩৪তম বৈঠক), দ্বিতীয় রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৮৪।

[২৪] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (৩৩তম বৈঠক), তৃতীয় রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৫।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা *

শাহজাদা এম আকরাম, জুলিয়েট রোজেটি, তাসলিমা আক্তার
কুমার বিশ্বজিৎ দাস ও নাজমুল হুদা মিনা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। এসব অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল বা জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল বা জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক।[১]

২০০৭ ও ২০০৯ সালে টিআইবির গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের আইনবহির্ভূত উপায়ের আশ্রয় নেওয়া এবং নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি বিভিন্ন পর্যায়ে লঙ্ঘনের প্রবণতা রয়েছে।[২] সম্প্রতি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সম্পন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন, যেখানে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু জাতীয় সংসদের একটি প্রধান কাজ সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থার ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া পর্যালোচনাসংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ তা পর্যালোচনা করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

* ২০১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত প্রাথমিক প্রতিবেদনের ওপর ৩১ মার্চের পরে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হালনাগাদকৃত সারসংক্ষেপ।

- একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল বা জোট ও প্রার্থী, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন অংশীজন নির্বাচনী প্রক্রিয়া কতটুকু আইনানুগভাবে অনুসরণ করেছেন তা পর্যালোচনা করা;
- নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রাক্কলন করা এবং
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

এই গবেষণার আওতার মধ্যে রয়েছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল বা জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং নির্বাচনের পরবর্তী এক মাস পর্যন্ত তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আধেয় বিশ্লেষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বাছাই করা আসনের বাছাই প্রার্থীদের কার্যক্রমের ওপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়ন : প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০০ আসন থেকে ৫০টি আসন নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি আসনে প্রধান দুটি দল বা জোটের প্রার্থী বাছাই করে প্রার্থী ও তাদের কার্যক্রমের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কোনো আসনে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তৃতীয় কোনো শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে তাকেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে গবেষণায় মোট ১০৭ জন প্রার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব আসন থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক ও ভোটারদের সাক্ষাৎকার[৩] গ্রহণ করা হয়েছে ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণায় পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ৩১ মার্চের পরে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গবেষণাভুক্ত নির্বাচনী আসনের তথ্য

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসন ৯টি বিভাগের ৪৫টি জেলায় বিস্তৃত। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ১১টি আসন (২২ শতাংশ) রয়েছে, এর পরই রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে ৯টি (১৮ শতাংশ)। সবচেয়ে কম আসন রয়েছে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে (৪টি করে)।

চিত্র ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসন যেসব জেলায় রয়েছে

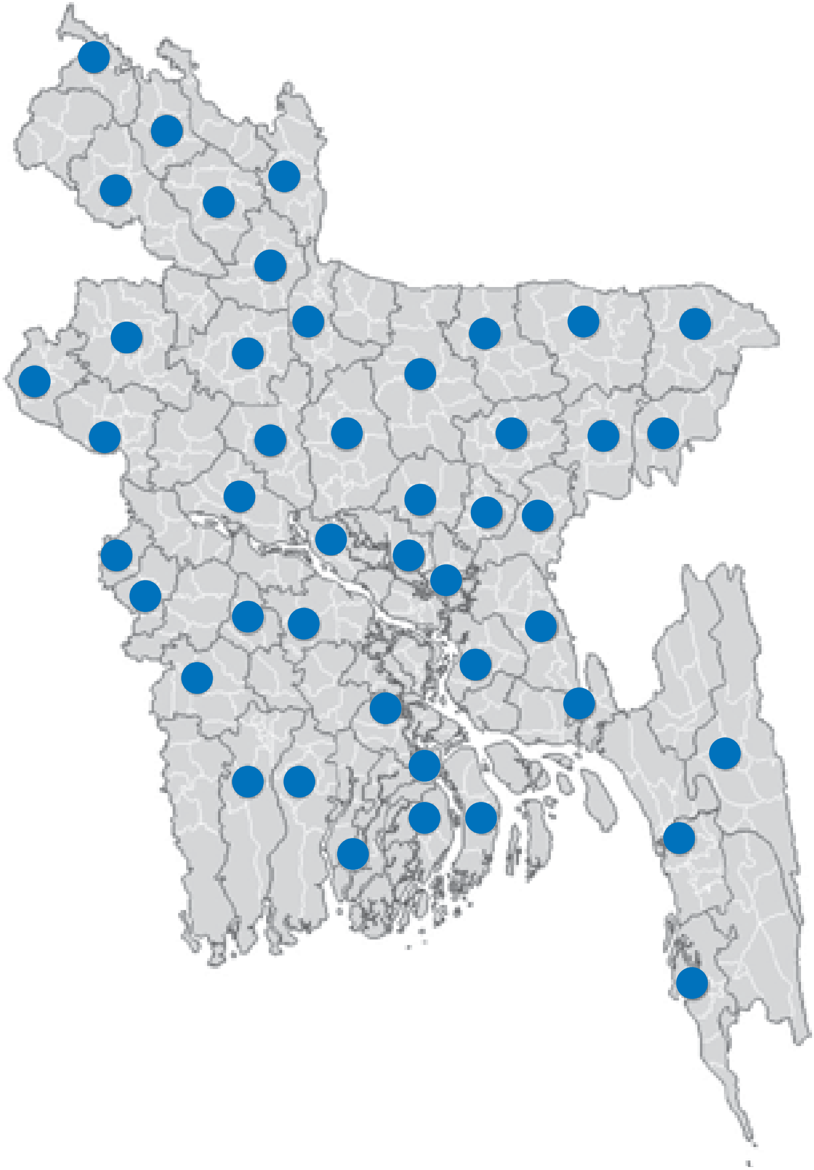

উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে মোট ভোটার ১ কোটি ৬৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭৪ জন এবং এর মধ্যে নারী ভোটার ৮৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩১৮ জন (৪৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ)। এসব আসনে চূড়ান্ত মনোনয়নপ্রাপ্ত মোট প্রার্থী ২৯৭ জন; আসনপ্রতি গড়ে ৫ দশমিক ৯৪ জন।

সারণি ১ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ও সারা দেশের প্রার্থীদের তথ্য

	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থী	২৯৯ আসনে মোট প্রার্থী
মোট প্রার্থী	১০৭ জন (নারী ৫, পুরুষ ১০২)	১,৮৬১ জন (নারী ৬৯, পুরুষ ১,৭৯২)
দলীয় পরিচিতি	আওয়ামী লীগ ৪১, বিএনপি ৪৩, জাতীয় পার্টি ৮, গণফোরাম ৫, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য ৭	আওয়ামী লীগ ২৬১, বিএনপি ২৭২, জাতীয় পার্টি ১৭৫, গণফোরাম ২৭, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৯৮, স্বতন্ত্র ১২৮, অন্যান্য ৭০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬ শতাংশ, স্নাতক ৩৮ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, অন্যান্য ৬ দশমিক ৭ শতাংশ	স্নাতকোত্তর ৩৩ দশমিক ৪ শতাংশ, স্নাতক ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক ১১ দশমিক ৪ শতাংশ, মাধ্যমিক ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, অন্যান্য ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ*
পেশা	ব্যবসায়ী ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ, আইনজীবী ১৩ শতাংশ, শিক্ষক ৬ দশমিক ৫ শতাংশ, চিকিৎসক ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, অন্যান্য ২১ দশমিক ৬ শতাংশ	ব্যবসায়ী ৬২ শতাংশ, আইনজীবী ১০ শতাংশ, কৃষিজীবী ৫ শতাংশ, শিক্ষক ২ শতাংশ, অন্যান্য ২২ শতাংশ*
গড় মাসিক আয়	৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৯১ টাকা	তথ্য পাওয়া যায়নি

* ২৮৬টি আসনে কেবল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের প্রার্থীদের ওপর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী। তথ্যসূত্র : *ডেইলি স্টার*, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে নারী ৫ জন ও পুরুষ ১০২ জন। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১, বিএনপির ৪৩, জাতীয় পার্টির ৮, গণফোরামের ৫, স্বতন্ত্র ৩ ও অন্যান্য ৭ জন। এসব প্রার্থীর মধ্যে স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব ৪৬ শতাংশ, স্নাতক ৩৮ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক ৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রার্থীদের ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যবসায়ী, ১৩ শতাংশ আইনজীবী, ৬ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষক, ৫ দশমিক ৬ শতাংশ চিকিৎসক এবং ২১ দশমিক ৬ শতাংশ অন্যান্য পেশার। প্রার্থীদের গড় মাসিক আয় ৬ লাখ ২৬ হাজার ৫৯১ টাকা।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায়– প্রাক-নির্বাচনী সময়, নির্বাচনকালীন সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী সময়।[৪] প্রতিটি ধাপেই নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে, যার একটি বড় অংশ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে এই প্রক্রিয়ায় সরকারসহ অন্যান্য

অংশীজনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী অংশে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ২ : নির্বাচনী প্রক্রিয়া

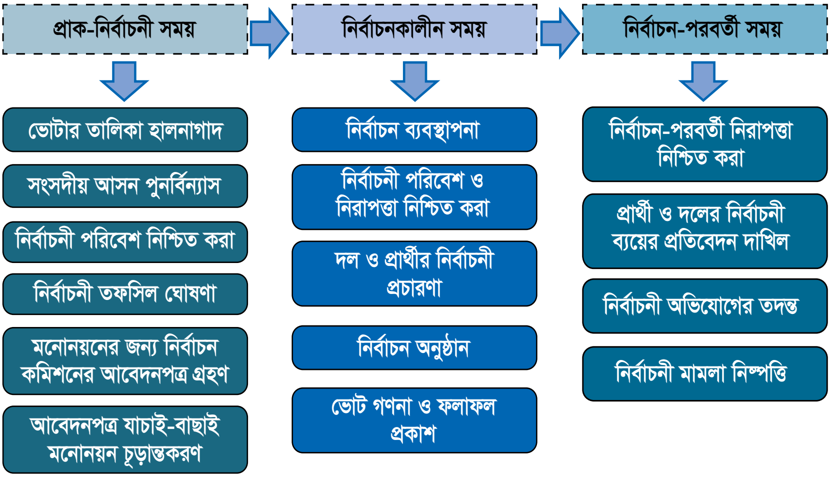

প্রাক-নির্বাচনী সময়

ভোটার তালিকা হালনাগাদ

২০১৭ সালের জুলাই থেকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু করে নির্বাচন কমিশন। এ প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সালে ৩৩ দশমিক ৩২ লাখ নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং ১৭ দশমিক ৪৮ লাখ মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে অপসারণ করা হয়।[৫] সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে মোট ভোটার ১০ কোটি ৪২ লাখ ৩৮ হাজার ৬৭৭ জন, যার মধ্যে নারী ভোটার ৪৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ এবং পুরুষ ভোটার ৫০ দশমিক ৪৩ শতাংশ।[৬] ভোটার তালিকা হালনাগাদের প্রক্রিয়া যথাযথ থাকলেও প্রতিটি বাড়িতে না যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।[৭]

সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ৩৮টি আসনের সীমানা পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।[৮] এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪টি আসনের জনসংখ্যা জেলার গড় জনসংখ্যার চেয়ে ২৫ শতাংশ কম বা বেশি দেখা যায় এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৬২টি আসন ভারসাম্যহীন লক্ষ করা যায়। পরে ৫৫টি আসনের সীমানা নিয়ে ৬৫১টি আপিল উত্থাপন করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য ও ভোটারদের পক্ষ থেকে; এর মধ্যে ৪০৭টি আপিল নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও ২৪৪টি পক্ষে ছিল।[৯] আপত্তির ওপর শুনানি শেষে চূড়ান্তভাবে ২৪টি আসনের সীমানা পরিবর্তন করা হয় এবং ২০১৮ সালের মে মাসে গেজেট প্রকাশ করা হয়।[১০]

নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা হয় ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রায় ৪৫০ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রধান আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন, সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন, নিরপেক্ষ সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।[১১] নিরপেক্ষ সরকার, সেনা মোতায়েন, সীমানা পরিবর্তন, ইভিএম ব্যবহার নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মতামত ছিল পরস্পরবিরোধী।[১২] এসব প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার আওতার মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব পূরণের অঙ্গীকার করে। তবে সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার সরকারের ওপর বলা হলেও সরকারের কাছে প্রেরণ করার উদ্যোগ নেয়নি নির্বাচন কমিশন।

২০১৮ সালে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশন আবেদন আহ্বান করে।[১৩] ৭৬টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলেও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন কোনোটিকেই নিবন্ধন দেয়নি।[১৪]

অধিকাংশ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইভিএম কেনার উদ্যোগ নেয় নির্বাচন কমিশন। সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প পাস হওয়ার আগেই ২০১৮ সালের জুন মাসে ২ হাজার ৫৩৫টি ইভিএম কেনা হয়।[১৫] পরে অক্টোবর মাসে ইভিএম ব্যবহারে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়া যায় এবং ইভিএম ব্যবহার সংক্রান্ত ধারা সংযোজন করে অধ্যাদেশ জারি করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইনের সংশোধন করা হয়।[১৬]

সব দলের অংশগ্রহণ করার সাপেক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' করার ওপর বিভিন্ন অংশীজনের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া হলেও 'রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রয়োজন নেই' এবং 'নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে নির্বাচন কমিশন অভিমত প্রকাশ করে।[১৭] ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয় ২০১৮ সালের প্রায় শুরু থেকেই। অন্যদিকে ২০১৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে সরকারবিরোধী দলের, বিশেষ করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তার করার ধারা শুরু হয়। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৪ হাজার ১৩৫টি মামলায় ৩ লাখ ৬০ হাজার ৩১৪ জন ব্যক্তিকে আসামি করা হয়, যাদের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় ৪ হাজার ৬৫০ জনকে।[১৮] মূলত বিএনপির নেতা-কর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের এজেন্ট এবং কমিটি ধরে ধরে মামলার আসামি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয় বিএনপির পক্ষ থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটনা না ঘটলেও এসব মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়, যেগুলো 'গায়েবি মামলা' বলে পরিচিত। দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বা ঘটনার সময়

অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছে।[১৯] এ ছাড়া সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয়। তবে এ ধরনের কার্যক্রমের পরও 'চমৎকার নির্বাচনী পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে' বলে সরকারের পক্ষ থেকেও অভিমত প্রকাশ করা হয়।[২০]

২০১৮ সালের অক্টোবরে ৭ দফা দাবি নিয়ে মূলধারার কয়েকটি দলের সমন্বয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হয়। এসব দলের মধ্যে বিএনপি, গণফোরাম, জেএসডি, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্য অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ অন্যান্য দল ও জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন দাবির মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল, আলোচনা করে নিরপেক্ষ সরকার গঠন; নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করা; বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নির্বাচনের ১০ দিন আগে থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠন পর্যন্ত বিচারিক ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া; নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে তাদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ না করা, গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা এবং তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান সব রাজনৈতিক মামলা স্থগিত রাখা ও নতুন কোনো মামলা না দেওয়া উল্লেখযোগ্য।[২১]

নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সরকারের সাথে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সংলাপ হয়, যেখানে সরকার ভেঙে দিয়ে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানানো হয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে।[২২] কোনো দাবি মেনে না নিলেও প্রধানমন্ত্রী নতুন কোনো মামলা না দেওয়া ও গ্রেপ্তার না করা এবং সভা-সমাবেশ করতে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। নির্বাচনের আগে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথেও ক্ষমতাসীন দলের সংলাপ হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। তবে চূড়ান্তভাবে প্রধান সরকারবিরোধী দলগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

নির্বাচন কমিশন ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর প্রথম তফসিল ঘোষণা করে।[২৩] এই তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৯ নভেম্বর ও নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮। তবে এই তফসিল অনুযায়ী প্রচারণার সময় ২৩ দিন রাখা হয় যা বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী।[২৪] জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কারণে সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করা হয় ১২ নভেম্বর।[২৫] সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ ডিসেম্বর এবং নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর।

তফসিল ঘোষণার পর সবগুলো নিবন্ধিত দল তাদের দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে। এই মনোনয়ন ফরম বিতরণ ঘিরে মিছিল, মনোনয়ন প্রত্যাশীদের শোডাউনের ফলে যানজট সৃষ্টি হয়

এবং একটি আসনে একটি দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যু হয়। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের শোডাউনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দলগুলোর প্রতি নির্বাচন কমিশন নমনীয় মনোভাব দেখালেও বিএনপির বিরুদ্ধে 'আচরণ বিধি লঙ্ঘন' বলে অভিযোগ করে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[২৬] তফসিল ঘোষণার পরও বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার অব্যাহত ছিল। নির্বাচন কমিশনকে বিএনপির পক্ষ থেকে ২ হাজার ৪৭টি মামলার তালিকা দেওয়া হয়।[২৭] তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অনুরোধ করা হলেও মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তার বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে তফসিল ঘোষণার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ক্ষমতাসীন জোট বা দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রার্থীদের প্রচারণা চলমান ছিল। কোনো কোনো আসনে বিরোধী দলের প্রার্থীদেরও প্রচারণা লক্ষ করা যায়। তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ৫২ জন প্রার্থী গড়ে ২ লাখ ৬৯ হাজার ৮৭ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৮২ লাখ ৫৭ হাজার টাকা এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২ হাজার ৯৮৫ টাকা ব্যয় করেন।

মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ

বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। নির্ধারিত সময়ে মোট আবেদনকারী প্রার্থী ছিলেন ৩ হাজার ৬৫ জন। এর মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ক্ষমতাসীন দলের হয়ে মনোনয়ন পান; এ বিষয়ে সিইসি তার অবস্থান পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হন।[২৮]

যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন ২ হাজার ২৭৯ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে এবং ৭৮৬ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করে; যার মধ্যে আওয়ামী লীগের ৩ ও বিএনপির ১৪১ জন।[২৯] এর আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন বাতিল হয়েছে বলে দেখা যায়। মনোনয়ন বাতিলের জন্য মূল কারণ ছিল ঋণখেলাপি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা। তবে বাতিলের জন্য একই মানদণ্ডে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। পরে নির্বাচন কমিশনে শুনানির পর ২৩৪ জনের মধ্যে ২০২ জনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করা হয়।[৩০] অন্যদিকে উচ্চ আদালতের রায়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পরও সরকারবিরোধী দলের ২৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়।[৩১] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে তিনজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হয়।

একটি আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ার কারণে ২৯৯টি আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৬১, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ৩৯টি ও জোট ৫টি। দেখা যায় কোনো দলেই তৃণমূলের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়ার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়নি; বরং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সব প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়।

দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের চারজন নির্বাচনে সম্ভাব্য ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস সম্পর্কে হলফনামায় তথ্য দেননি। তিনজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত সম্ভাব্য ব্যয় দেখিয়েছেন (সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত)। আরও দেখা যায় তফসিল ঘোষণার পর

থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৫ জন প্রার্থীর গড়ে ২ লাখ ১০ হাজার ৭৬০ টাকা ব্যয় (সর্বোচ্চ ১৪ লাখ ৬৮ হাজার টাকা, সর্বনিম্ন ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা); ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত ছিল পোস্টার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, জনসংযোগ ইত্যাদি।

নির্বাচনকালীন সময়

নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মোট বাজেট ছিল ৭০২ কোটি টাকা। নির্বাচন কমিশন ৯ নভেম্বর ৬৬ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়, যাদের ৬৪ জন ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং ২ জন বিভাগীয় প্রশাসক।[৩২] অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ৫৮২ জন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ৪০ হাজার ১৮৩ জন, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ২ লাখ ৭ হাজার ৩১২ জন এবং পোলিং কর্মকর্তা ৪ লাখ ১৪ হাজার ৬২৪ জন।[৩৩]

নির্বাচনে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য মোট ৬ লাখ ৮ হাজার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়। এদের মধ্যে পুলিশ ১ লাখ ২১ হাজার, আনসার ৪ লাখ ৪৬ হাজার, গ্রাম পুলিশ ৪১ হাজার, র‍্যাব ৬০০ প্লাটুন, বিজিবি ৯৮৩ প্লাটুন, সেনাবাহিনী ৪১৪ প্লাটুন, ৪৮ প্লাটুন নেভি ও কোস্টগার্ড ৩০ প্লাটুন। প্রতিটি কেন্দ্রে এক থেকে দুজন পুলিশ ও ১২ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত ছিলেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েন করা হয়।[৩৪]

নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম ঠেকানোর জন্য প্রতিটি আসনে যুগ্ম জেলা জজ ও সহকারী জজের সমন্বয়ে ১২২টি নির্বাচন তদন্ত দল গঠন করা হয় ২৫ নভেম্বর। তদারকি ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১ হাজার ৩৮২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ৬৪০ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৩৫]

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় ৮১টি পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে অনুমতি দেওয়া হয়। নির্বাচনে স্থানীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন ২৫ হাজার ৯০০ জন, বিদেশি পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, বৈদেশিক মিশন কর্মকর্তা ৬৪ জন এবং বৈদেশিক মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি পর্যবেক্ষক ৬১ জন।[৩৬] তবে পর্যবেক্ষণ সংস্থার অনুমোদনে একই মানদণ্ড অনুসরণ না করার অভিযোগ ছিল নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেশ কয়েকটি দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে অনুমোদন দেওয়া না হলেও কয়েকটি পর্যবেক্ষক সংস্থা ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন পায়। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতির ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

তবে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা সত্ত্বেও ১০ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৬ জেলার ১৪৯টি আসনে প্রায় ২৫০টি সংঘাতের ঘটনায় দুজনের মৃত্যু ঘটে এবং ১ হাজার ১৬০ জন আহত হন। এসব ঘটনায় সাতজন প্রার্থীসহ ৭৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তফসিল ঘোষণার পর থেকে সরকারবিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারও অব্যাহত ছিল– ৮ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১১ হাজার ৫৮৬ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৩৭]

নির্বাচনী প্রচারণা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো আসনে প্রচারণার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলকে এককভাবে সক্রিয় দেখা যায়। কোনো কোনো আসনে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে সরাসরি প্রচারণার জন্য সুবিধা আদায়, প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মচারী কর্তৃক প্রার্থীর প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সরকারি সম্পদ ব্যবহার করে প্রচারণা করা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৪টি আসনে (ছয়টি আসনের তথ্য পাওয়া যায়নি) সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকেই দলীয় নেতা-কর্মীদের নামে মামলা, পুলিশ বা প্রশাসন কর্তৃক হুমকি বা হয়রানি, প্রার্থী বা নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার অব্যাহত ছিল। এসব আসনে ১২ হাজার ৬৮৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, যাদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভয়ভীতি দেখানো, গ্রেপ্তার হওয়া ও মামলা থাকার কারণে বিরোধী দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা প্রচারণা চালাতে ব্যর্থ হন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮ শতাংশ আসনে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে মারামারি, সরকারবিরোধী দলের প্রার্থীর সমর্থক ও নেতা-কর্মীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা, নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করা, পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৭২ শতাংশ আসনে বিরোধী দলের প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো (১০০ ভাগ) আসনেই প্রার্থীদের কোনো না কোনো আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরনের মধ্যে ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডপ্রতি একাধিক ক্যাম্প স্থাপন, মোটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন, নির্ধারিত সময়ের (দুপুর দুইটা-রাত আটটা) বাইরে প্রচারণা চালানো, দেয়ালে ও যানবাহনে পোস্টার ও লিফলেট লাগানো, পোস্টারে মুদ্রণসংখ্যা, প্রেস বা প্রিন্টার্সের নাম, ফোন নম্বর না দেওয়া, আলোকসজ্জা, প্রার্থীর ছবি ও প্রতীকসহ টি-শার্ট বা ব্যান্ডানা বা ক্যাপ পরিধান, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থীর প্রচারণায় প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া (মিছিল বা জনসভা করতে না দেওয়া, পোস্টার টাঙাতে না দেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলা, মাইকিং করতে না দেওয়া বা মাইক ভেঙে ফেলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮ শতাংশ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে প্রশাসন কর্তৃক প্রার্থী বা সমর্থক বা কর্মীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। বাকি আসনগুলোতে প্রশাসন বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কয়েকটি আসনের কোনো কোনো প্রার্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন বলে জানা যায়।

সারণি ২ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে উল্লেখযোগ্য আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
জনসভা বা শোভাযাত্রা (যানবাহনসহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শোডাউন ইত্যাদি)	৯৫.১	৮৭.৫	৩০.৬	৪০	৫৭.১	৫৮.৮৮
দেয়াল, খুঁটি, যানবাহন ইত্যাদিতে পোস্টার লাগানো	৮০.৫	৭৫	৪৪.৪	৪০	৫৭.১	৫৭.০১
নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারকে পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন, উপঢৌকন, বকশিশ ইত্যাদি প্রদান	৭০.৭	৭৫	৪৪.৪	২০	৪২.৯	৫১.৪০
পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা	৬৩.৪	৫০	৪৭.২	২০	৪২.৯	৪৭.৬৬
প্রতি ইউনিয়নে ও পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন	৮২.৯	৫০	১৯.৪	২০	২৮.৬	৪৪.৮৬
ভোটের তিন সপ্তাহ আগে প্রচারণা	৬৫.৯	২৫	২৭.৮	৪০	৫৭.১	৪২.০৬
মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখবিহীন পোস্টার	৬৩.৪	২৫	৩০.৬	২০	২৮.৬	৩৯.২৫
‘বেলা দুইটা থেকে রাত আটটা’র বাইরে মাইক্রোফোন ব্যবহার	৬৩.৪	৬২.৫	২২.২	০	২৮.৬	৩৮.৩২
মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল কিংবা শোডাউন	৬১	২৫	২৭.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
প্রতিপক্ষের পথসভা, ঘরোয়া সভা বা অন্যান্য প্রচারাভিযানে বাধা	৭৮	৫০	২.৮	২০	২৮.৬	৩৭.৩৮
প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য বা প্রার্থীর ছবি বা চিহ্নসংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার	৬১	৩৭.৫	১৩.৯	০	২৮.৬	৩২.৭১

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

আচরণবিধি লঙ্ঘনের ধরন	আওয়ামী লীগ (%)	জাতীয় পার্টি (%)	বিএনপি (%)	গণফোরাম (%)	অন্যান্য (%)	মোট প্রার্থী (%)
৪০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা	৫৬.১	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	৩১.৭৮
গেট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ	৬৫.৯	১২.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৯.৯১
যেকোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো	৪৩.৯	৩৭.৫	১৬.৭	০	৫৭.১	২৮.৯৭
পথসভা বা মঞ্চ তৈরি করে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি	৪৮.৮	৬২.৫	৫.৬	০	২৮.৬	২৭.১০
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতায় তিন মিটারের বেশি নির্বাচনী প্রতীক	৫৮.৫	৩৭.৫	০	০	২৮.৬	২৭.১০
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট ইত্যাদির ওপর অন্য প্রার্থীর পোস্টার বা লিফলেট লাগানো এবং কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন	৪১.৫	৫০	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৭.১০
ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয়	৫৩.৭	৩৭.৫	৮.৩	০	১৪.৩	২৭.১০
ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, তিক্ত বা উসকানিমূলক বক্তব্য, লিঙ্গ বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এ ধরনের বক্তব্য দান	৩৯	৩৭.৫	১৩.৯	২০	২৮.৬	২৫.২৩
অনভিপ্রেত গোলযোগ বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা শান্তি ভঙ্গ	৪৮.৮	২৫	৫.৬	২০	২৮.৬	২৫.২৩
প্রার্থীর পক্ষে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও কোনো সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচনী প্রচারণা বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	৫৩.৭	২৫	৮.৩	০	০	২৫.২৩

মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে মোট ১০৪ জন প্রার্থী গড়ে ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় করেছেন বলে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা এবং আরেকটি আসনে একজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭ দশমিক ৯ শতাংশ প্রার্থী।

সার্বিকভাবে তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় ৭৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত ব্যয়সীমার (আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা) তিনগুণের বেশি (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)। তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে নির্বাচন পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ প্রার্থী। সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা (গড়ে পাঁচ গুণের বেশি) এবং সবচেয়ে কম ব্যয় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে পোস্টার, নির্বাচনী ক্যাম্প, জনসভা ও কর্মীদের জন্য ব্যয়।

সারণি ৩ : তফসিল ঘোষণার আগে থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় ব্যয় (প্রাক্কলিত)

রাজনৈতিক দল	প্রার্থীর সংখ্যা	তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার পর থেকে মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন পর্যন্ত গড় ব্যয় (টাকা)	তফসিল ঘোষণার আগ থেকে শুরু করে নির্বাচন পর্যন্ত প্রচারণার জন্য প্রার্থীদের মোট গড় ব্যয় (টাকা)
আওয়ামী লীগ	৪১	৭,৫২,৮০১	৪,০০,৮৩২	১,২৩,৭৭,১৩০	১,৩৩,৬৫,৫১৫
বিএনপি	৪৩	৩,৫৮,৪১০	৯৬,৯৮৯	২৮,০৪,৯৯০	২৭,৮৫,১২২
জাতীয় পার্টি	৮	৫৫,৯৭৫	৫৮,৩২৫	৬২,৬০,১৯৮	৬৩,৪৬,৫১১
গণফোরাম	৫	-	৫৬,০০০	৪০,৭৯,৫৮০	৪১,৩৫,৫৮০
স্বতন্ত্র	৩	৭,৮৭০	১,৭৭,৬৬৬	১৪,২৩,৯০৫	১৬,০৪,১৯৫
অন্যান্য*	৭	১,৭৭,৩৬০	১,২৩,০১৪	১,২১,৫৮,১৭১	১,২৪,০৭,৮৭১
মোট	**১০৭**	**৫,৫৩,৬৯৮**	**২,১৪,৭৭৫**	**৭৪,৯৫,৩৮৮**	**৭৭,৬৫,০৮৫**

* অন্যান্য দলের মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি (জেপি), এলডিপি, জেএসডি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনাসংক্রান্ত টিআইবির গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমার প্রায়

তিন গুণ ব্যয় করেছিলেন– নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ব্যয়সীমা যেখানে ছিল আসনপ্রতি সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা, প্রার্থীরা ব্যয় করেছিলেন গড়ে ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা।[৩৮]

নির্বাচন অনুষ্ঠান

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনের দিন সারা দেশের ২৪ জেলায় নির্বাচনী সহিংসতায় ১৮ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং ২০০ জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে আটজন আওয়ামী লীগ ও চারজন বিএনপির কর্মী ছিল বলে দাবি করা হয়। মোট ২২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৩৯]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৯৪ শতাংশ আসনে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনিয়মের ধরনের মধ্যে নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা, আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া, বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট দেওয়া, ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স, ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৪ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে নির্বাচনের দিন সংঘটিত অনিয়ম

অনিয়মের ধরন	আসন (%)
প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা	৯১
জাল ভোট দেওয়া	৮৯
নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা	৭২
বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট	৬৫
পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া*	৬৩
ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া	৫৭
ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা	৫৭
ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া	৪৮
আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো	৪৬
ব্যালট বাক্স আগে থেকে ভরে রাখা	৪৪
প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর নেতা-কর্মীদের মারধর করা	২৪

* এর মধ্যে ২৯টি আসনে পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ১০টি আসনে কোনো এজেন্ট ছিল না।

সারা দেশে বেশির ভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বেশির ভাগ কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না অথবা সকালে তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে ৭৬ প্রার্থী নির্বাচন চলাকালে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তবে ঐক্যফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৪০]

নির্বাচন-পরবর্তী সময়

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পার্টি ৬, বিএনপি ১, গণফোরাম ২, অন্যান্য দল একটি আসনে জয়ী হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ২৫৭, জাতীয় পার্টি ২২, বিএনপি ৫, গণফোরাম ২, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য দল ৯ আসনে জয়ী হয়।[৪১] তবে দেখা যায় ১৮৬টি আসনে ভোট দেওয়া হয়েছে ৮০ শতাংশের বেশি–এর মধ্যে ১৩টি আসনে ভোট ৯০ শতাংশের ওপরে; অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে ৩টি আসনে।

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট, যাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, খেলাফত মজলিস, বাসদ, গণসংহতি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য।[৪২] নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট স্মারকলিপি প্রদান করে ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি।

বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি 'পর্যবেক্ষক'রা নির্বাচন 'অংশগ্রহণমূলক' হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ[৪৩] করলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে নির্বাচনে অনিয়মের সমালোচনা করা হয়েছে।[৪৪]

তবে এসব অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী 'কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো।' অন্যদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক' ছিল। পরবর্তী সময়ে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন থেকে বক্তব্য দেওয়া হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা ভোটে কোনো অনিয়ম হয়নি বলে দাবি করেন এবং ভোট নিয়ে 'তৃপ্ত-সন্তুষ্ট', এবং তারা 'লজ্জিত নন' বলে জানান। আগের রাতে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, 'অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য।'[৪৫] 'ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার?' বলেও তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন।[৪৬]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে জয়ী প্রার্থীরা গড়ে ১ কোটি ২৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭৭ টাকা ব্যয় করেছেন বলে প্রাক্কলিত হয়েছে। এর মধ্যে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা এবং আরেকজন প্রার্থী সর্বনিম্ন ২ লাখ ৮৬ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় করেছেন।

নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল

আইন অনুসারে নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেলেও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর কোনো সত্যায়িত অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে এসে পৌঁছায়নি বলে জানা যায়। প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব চেয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে চিঠিও পাঠায়নি নির্বাচন কমিশন।[৪৭]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কতজন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছেন সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া না গেলেও তাদের মধ্যে ২১টি আসনের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৫ জনের মধ্যে ৪০ জন প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিয়েছে বলে জানা যায়। এই ৪০ জনের ব্যয়ের রিটার্ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় কোনো প্রার্থীই তাদের রিটার্নে ২৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় দেখাননি, যদিও গবেষণার প্রাক্কলনে দেখা যায় প্রচারণার জন্য অনুমোদিত সময়ে নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয় করেছেন ৫৭ দশমিক ৯ শতাংশ প্রার্থী। ব্যয়ের রিটার্ন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের গড় ব্যয় ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৪৮৪ টাকা, যা ওই সব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে অনেক নিচে, যদিও এই গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয় গড়ে ৭৯ লাখ ৭২ হাজার ৮৭৬ টাকা, যা ওই সব আসনে গড় সর্বোচ্চ ব্যয়সীমার চেয়ে তিন গুণেরও বেশি। এই ৪০ জনের মধ্যে একজন সর্বনিম্ন ব্যয় দেখিয়েছেন ৭১ হাজার ৩০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ব্যয় একজন দেখিয়েছেন ২৫ লাখ টাকা (সারণি ৫)। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃত নির্বাচনী ব্যয় গোপন করেছেন।

সারণি ৫ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের* রিটার্নে প্রদর্শিত নির্বাচনী ব্যয় (টাকা)

	রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়	তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রাক্কলিত নির্বাচনী ব্যয়
গড় ব্যয়	১৫,১৫,৪৮৪	৭৯,৭২,৮৭৬
সর্বনিম্ন ব্যয়	৭১,৩০০	৬৫,০০০
সর্বোচ্চ ব্যয়	২৫,০০,০০০	৪,৫৫,৬৯,৫০০

* ৪০ জনের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয় এবং এই ৪০ জনের নির্বাচনী ব্যয়ের প্রাক্কলন।

চিত্র ৩ : প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদর্শিত ব্যয়ের সাথে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা

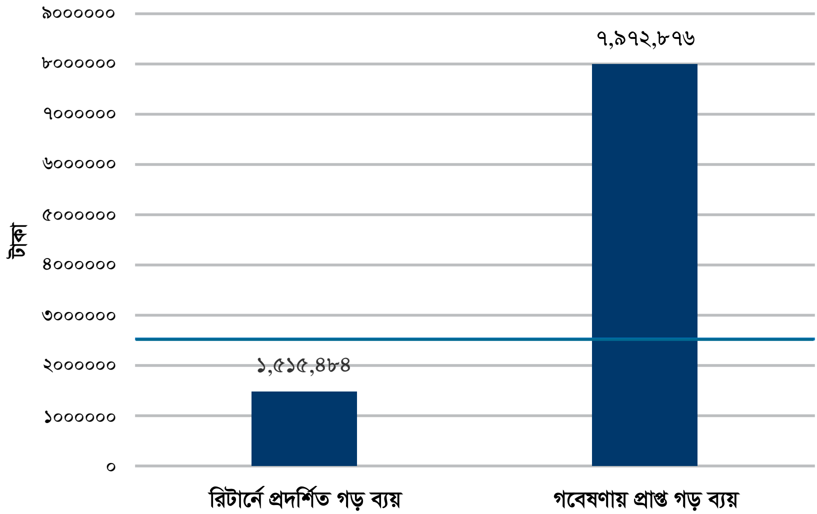

* নীল রেখাটি নির্বাচন কমিশন আসনপ্রতি নির্ধারিত সর্বোচ্চ ব্যয় নির্দেশ করছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা

ক্ষমতাসীন সরকার

ক্ষমতাসীন দল বা জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা, নির্বাচন সামনে রেখে ক্ষমতাসীন সরকার বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়ার ঘোষণা, নির্বাচনের প্রায় এক বছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দল বিভিন্ন মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা এবং প্রশাসন ও পুলিশের দলীয়করণ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে চাকরিপ্রার্থী, তরুণ ও শিক্ষার্থীদের খুশি করতে কোটা বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ ও কোটা আন্দোলনে জড়িত শিক্ষার্থীদের জামিন দেওয়া, সড়ক পরিবহন আইন পাসের উদ্যোগ নেওয়া ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে জড়িত শিক্ষার্থীদের জামিন দেওয়া, পোশাকশ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা, শ্রম আইন সংশোধন, সারা দেশে প্রায় ৪০০ স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা, হাজারখানেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া, কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের সনদকে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি মাস্টার্সের সমমান দেওয়া, তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের উৎসে কর ও করপোরেট কর কমানো, ওষুধসহ নয়টি খাতে নগদ সহায়তা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৪৮] এসব কার্যক্রম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকাই পালন করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও জোটকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে বলে দেখা যায়।

নির্বাচন কমিশন

একাদশ সংসদ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন কৃতিত্বের দাবিদার। প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় নির্বাচন কমিশন, যার মধ্যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য নির্বাচনী আচরণবিধি সংশোধন, মনোনয়নপত্র বাতিলের পর শুনানিতে প্রার্থিতা ফেরত, ভোটার তালিকা ছাপানো, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স সরবরাহ, দল ও প্রার্থীর জন্য প্রতীক বরাদ্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এই নির্বাচন আয়োজন করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন যেসব বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাতিল, সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থতা, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি, নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, তথ্য প্রবাহের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার সর্বোচ্চ ব্যয়সীমা নিয়ন্ত্রণ করায় ব্যর্থতা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন-সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত না করা এবং নীতিমালা ও আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক দল ও জোট

প্রার্থিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি থেকে মনোনীত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার প্রক্রিয়া কোনো দলের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। আর মনোনয়নে তৃণমূলের অংশগ্রহণ না রাখার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।[৪৯] এ ছাড়া দলীয়ভাবে কোনো কোনো নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করা হয় এবং প্রধান দুই জোটের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তোলে অন্যান্য দল।

প্রার্থী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে। প্রার্থীরা যেসব ক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেন তার মধ্যে হলফনামায় তথ্য না দেওয়া, নির্ধারিত ব্যয়সীমার বেশি ব্যয়, প্রচারণায় আচরণবিধি লঙ্ঘন এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করা উল্লেখযোগ্য।

নাগরিক সমাজ

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও মতামত প্রদান অব্যাহত ছিল।[৫০] এসব আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও জোট এবং বিরোধী দল ও জোটের কার্যক্রম ও করণীয়, নির্বাচনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের অনিয়ম ও আইনের ব্যত্যয়, নির্বাচনকালীন

সরকারের কাঠামো, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও করণীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে নির্বাচনের বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত বক্তব্য পাওয়া যায় এবং খুব কমসংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়।[৫১]

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় সবচেয়ে কমসংখ্যক আন্তর্জাতিক ও দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা নির্বাচনের দিন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে। বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলগুলোর পক্ষ থেকে নির্বাচনের দিনই সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্বাচন হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় এবং সহিংসতার ঘটনাগুলোকে দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ তাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত হয়েছে।[৫২] তবে কোনো পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ায় সংবাদমাধ্যম, বিশেষ করে প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে দলীয় ও প্রার্থীর প্রচারণাসংক্রান্ত গতানুগতিক সংবাদ প্রচারের ধারার বাইরে গিয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ এবং এর ওপর বিশ্লেষণ, মন্তব্য প্রতিবেদন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং আসনগুলোর ওপর মৌলিক তথ্য প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ করে সচিত্র তথ্য প্রকাশ করা হয়। এর সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন, ক্ষমতাসীন সরকার, বিরোধীদলীয় জোট ও দলের বিভিন্ন বিতর্কিত কার্যক্রম ও ভূমিকা নিয়ে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করা হয় এবং সম্পাদকীয় ও মন্তব্য কলামে প্রতিবেদন ও কলাম প্রকাশিত হয়। প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলোতে নির্বাচনের দিনের অনিয়ম বিভিন্ন আসন ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা হয় এবং বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়।[৫৩]

ইতিবাচক ভূমিকার পাশাপাশি নির্বাচন-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু বিতর্কিত ভূমিকা লক্ষ করা যায়, যেমন বিভিন্ন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রচারিত সংবাদ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন টক শোর তথ্যে বস্তুনিষ্ঠতার ঘাটতি ইত্যাদি। নির্বাচনের আগে এবং পরে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের ওপর সংবাদ প্রচারে কয়েকটি বেসরকারি চ্যানেল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করে। প্রতিটি বেসরকারি চ্যানেলই প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকার ওপর প্রতিবেদন ও সংবাদ এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করে। নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র থেকে সরাসরি খবর সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নির্বাচনী খবরের বস্তুনিষ্ঠতা অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়নি। সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল না। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের দমনে সরকারের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করেছে। সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারেনি এবং একই সাথে সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারেনি। এর ফলে নির্বাচন কমিশন যেমন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারেনি, আবার অন্যদিকে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পেয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার ঘাটতি তৈরি করেছে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদমাধ্যমের জন্য বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার কারণে কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা হয় এবং মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ক্ষমতাসীন দল বা জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। সংসদ না ভেঙে নির্বাচন করার ফলে সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা ক্ষমতাসীন দল ও জোটের জন্য সহজ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচনমুখী অনেক প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রায় এক বছর আগে থেকেই ক্ষমতাসীন দলের প্রচারণা লক্ষ করা যায়, যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের সাথে প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে গেছে। এমনকি সংলাপে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়ার পরও নির্বাচনের সময় পর্যন্ত ধরপাকড় ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারবিরোধী দলের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়া, প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, সহিংসতার কারণে বিরোধী দল প্রচারণায় অনেকখানি অপারগ ছিল।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লঙ্ঘনের সাথে সাথে প্রচারণার জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আসনপ্রতি নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছেন প্রার্থীরা এবং এর ফলে সম্ভাব্য আইনপ্রণেতাদের মধ্যে আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা দৃশ্যমান হয়েছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ফলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' বলা গেলেও তা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' হতে পারেনি।

সুপারিশ

১. সৎ, যোগ্য, সাহসী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

৩. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগসহ নির্বাচনী আচরণ বিধির বহুমুখী লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ও তার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে তাদের ব্যর্থতা নিরূপণ করে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ভোটার তালিকা হালনাগাদ, মনোনয়নের জন্য আবেদনপত্র উত্তোলন ও জমা, প্রার্থীর আর্থিক তথ্য যাচাই, নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি) ডিজিটালাইজ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও প্রার্থীর মনোনয়ন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] ডেইলি স্টার, 'ইসি অ্যালোন নট রেসপনসিবল ফর হোল্ডিং ফেয়ার ইলেকশন', ২৫ অক্টোবর ২০১৭।

[২] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অর্থ ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে। প্রার্থিতা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রার্থীরা গড়ে ১৫ লাখ ২০ হাজার টাকার বেশি ব্যয় করেন (টিআইবি, ২০০৭)। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের গড় ব্যয় ছিল ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা, যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার ৩১ লাখ ৫ হাজার ৮৫৯ টাকা অতিরিক্ত (টিআইবি, ২০১০)।

[৩] উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি আসনে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ অন্যান্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক, ভোটারসহ মোট ১৫ হাজার ৬৯৭ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[৪] ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সফল নির্বাচনের জন্য যা প্রয়োজন', দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৩ অক্টোবর ২০১৮; ব্রিগেডিয়ার (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন, 'সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও নির্বাচনী নিরাপত্তা', দৈনিক *প্রথম*

আলো, ২৪ আগস্ট ২০১৭।

৫ *দি ডেইলি স্টার*, '২.৩ ক্রোর নিউ ভোটারস অ্যাডেড : ইসি ডিসক্লোজেস ড্রাফট ভোটার লিস্ট; টোটাল ভোটারস ১০.৪০ ক্রোর ৩ জানুয়ারি ২০১৮।

৬ *দি ডেইলি স্টার*, 'নম্বর অব ভোটারস নাও ১০.৪১ ক্রোর', ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

৭ *বাংলা ট্রিবিউন*, 'নো ডোর-টু-ডোর ভোটারস লিস্ট আপডেটিং দিস ইয়ার', ১০ জুলাই ২০১৮; মো. আবদুল আলীম, 'ফর আ ক্রেডিবল ইলেকটোরাল রোল', *দি ডেইলি স্টার*, ১ আগস্ট ২০১৫।

৮ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-১৪৪, ১৪ মার্চ ২০১৮।

৯ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-২২৪, ৯ এপ্রিল ২০১৮।

১০ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, গেজেট নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.২২.০১০.১৭-২৫৩, ৩০ এপ্রিল ২০১৮।

১১ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ইসি'র সঙ্গে ৪০ দলের সংলাপ : বেশির ভাগ দল সেনা মোতায়েন চায়', ২০ অক্টোবর ২০১৭।

১২ *প্রাগুক্ত*।

১৩ *দি ডেইলি স্টার*, 'ইসি সিকস অ্যাপ্লিকেশনস ফ্রম নিউ পার্টিজ ফর রেজিস্ট্রেশন', ৩১ অক্টোবর ২০১৭।

১৪ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'শর্ত শিথিল করা হোক : রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন', ২৬ জুলাই ২০১৮।

১৫ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'কেনা হয়েছে ২৫০০ ইভিএম, আরও কেনা হবে', ৭ জুন ২০১৮; *দি ডেইলি স্টার*, 'হেস্টি ইভিএম প্ল্যান ফর নেক্সট জেএস পোলস', ২৭ আগস্ট ২০১৮।

১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি পিপল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০১৮*, ৩১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.ecs.gov.bd/bec/public/files/1/Law/RPO(Amendment)%20Ordinance,2018.pdf (১৪ জানুয়ারি ২০১৯)।

১৭ *দি ডেইলি স্টার*, ' নো স্কোপ ফর পার্টিস টু হোল্ড টকস উইধ ইসি : সে'স ইসি সেক্রেটারি', ১৭ আগস্ট ২০১৮; *দি ডেইলি স্টার*, 'সিইসি ফাইন্ডস পোলস অ্যাটমস্ফিয়ার স্যাটিসফ্যাকটরি : কমেন্ট কামস এ ডে আফটার রিফট মারড অ্যান ইসি মিটিং', ১৭ অক্টোবর ২০১৮। সিইসি বলেন, শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নিয়ে ইসির উদ্বেগেরও কিছু নেই। নির্বাচনী পরিবেশ আছে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা হয়েছে, সীমানা নির্ধারণ হয়েছে, ভোটকেন্দ্র নির্ধারণের কাজ চলছে। সূত্র : দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ভোটে অনিয়ম হবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই : সিইসি', ৭ আগস্ট ২০১৮।

১৮ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'হঠাৎ কেন এত গায়েবি মামলা', ৭ অক্টোবর ২০১৮।

১৯ *প্রাগুক্ত*।

২০ *দি ডেইলি স্টার*, 'অ্যাটমস্ফিয়ার কনজেনিয়াল ফর ইলেকশনস : সে'স পিএম', ১ অক্টোবর ২০১৮। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভয়েস অব আমেরিকার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে আরও বলেন যে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যোগ্য।

২১ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ড. কামালের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যাত্রা', ১৩ অক্টোবর ২০১৮।

২২ *দি ডেইলি স্টার*, '১৪-পার্টি-ঐক্যফ্রন্ট টকস : নট মাচ রিজলভড', ২ নভেম্বর ২০১৮; মিজানুর রহমান, 'সংলাপ হয়েছে, এটাই অগ্রগতি', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৪ নভেম্বর ২০১৮।

২৩ *দি ডেইলি স্টার*, 'শিডিউল ফর নেক্সট ইলেকশন অন নভেম্বর ৮', ৫ নভেম্বর ২০১৮।

২৪ দৈনিক *প্রথম আলো*, 'তফসিলেই আইন লঙ্ঘন করেছে ইসি?', ১০ নভেম্বর ২০১৮।

২৫ *দি ডেইলি স্টার*, 'পোলস নাউ অন ডিসেম্বর ৩০', ১৩ নভেম্বর ২০১৮।

২৬ গোলাম মোর্তোজা, 'আচরণবিধি, সংঘর্ষ ও ইসির ইভিএম ব্যস্ততা', *ডেইলি স্টার বাংলা*, ১৪ নভেম্বর ২০১৮।

২৭ *ডেইলি স্টার*, 'বিএনপি সাবমিটস টু পিএমও লিস্ট অব ১,০৪৬ কেসেস : ক্লেইমস ৪৬,৭৪৮ অব ইটস অ্যাকটিভিস্টস অ্যাকিউজড, ১০,২৯৮ অ্যারেস্টেড', ৮ নভেম্বর ২০১৮।

২৮ *ঢাকা ট্রিবিউন*, 'সিইসি'স নেফিউ গেটস এএল টিকিট', ২৫ নভেম্বর ২০১৮; 'দি নিউট্রালিটি অব দি সিইসি

ইজ কোয়েশ্চন্ড ইন দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব দি নেফিউ অব দি সিইসি', ২৬ নভেম্বর ২০১৮; https://afaae.com/bangladesh/the-neutrality-of-the-ec-is-questioned-in-the-appointment-of-the-nephew-of-the-cec/ (১৪ জানুয়ারি ২০১৯)।

[২৯] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'বৈধ মনোনয়নপত্র ২২৭৯, বাতিল ৭৮৬', ২ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৩০] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০..৪৬.৪২.০০৫.১৮-২১ (৮ ডিসেম্বর ২০১৮)। http://www.ecs.gov.bd/files/pJlfMAWmGWTUmxryVG43ZJab1usZtYlw67uOPFp3.pdf (১২ জানুয়ারি ২০১৯)।

[৩১] *ডেইলি স্টার*, 'খালেদা লুজেস অল থ্রি আপিলস অ্যাট ইসি', ৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৩২] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৬৩৭, তারিখ ৮ নভেম্বর ২০১৮। http://www.ecs.gov.bd/files/1BYSf0MyGXw2q7ELUns6Zuep3Z4VpVwX9LwYtx31.pdf (১২ জানুয়ারি ২০১৯)।

[৩৩] শাখাওয়াত লিটন, 'পার্টিসিপেটরি পোলস, ফর শিওর', *ডেইলি স্টার*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৩৪] *প্রাগুক্ত*।

[৩৫] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০০.০০০০.০৪৫.৩৬.০০১.১৮-৯২, তারিখ ২৮ নভেম্বর ২০১৮।

[৩৬] শাখাওয়াত লিটন, 'পার্টিসিপেটরি পোলস, ফর শিওর', *ডেইলি স্টার*, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৩৭] *ডেইলি স্টার*, 'ক্যামপেইনিং এন্ডস : অ্যান্ড দ্য ইসি'স রোল স্টিল রিমেইনস ক্রুশিয়াল', ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৩৮] টিআইবি, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা*, ২০০৯।

[৩৯] *ডেইলি স্টার*, '১৮ ডেড, ২০০ হার্ট', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪০] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ফলাফল প্রত্যাখ্যান, পুনর্নির্বাচনের দাবি ঐক্যফ্রন্টের', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪১] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'নিরঙ্কুশ জয়ে নতুন রেকর্ড গড়ছে আ.লীগ', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪২] দৈনিক *যুগান্তর*, 'নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪৩] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত, নেপাল, ওআইসি ও সার্ক', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮। ভারতের তিন সদস্যের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের অন্যতম সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা আরিজ আফতাবের মতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন সুশৃঙ্খল ও পরিশীলিতভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ তাদের চোখে পড়েছে। সাত সদস্যের ওআইসি প্রতিনিধিদলের নেতা হামিদ এ ওপেলোইয়েরুর মতে নির্বাচনে প্রাণহানির ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নির্বাচনী কর্মকর্তারা সময়মতো ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করেছেন, ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার মতো দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক এসব মান পূরণ করার মানে হচ্ছে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এ ছাড়া ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখার সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পোলিং এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে দেখেছেন বলে জানান তিনি। এ ছাড়া নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে সন্তুষ্টির কথা জানান কানাডার নাগরিক তানিয়া ফস্টার। সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনিসহ বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিক কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন।

[৪৪] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'বিশ্ব গণমাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; দৈনিক *প্রথম আলো*, 'চার আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের নির্বাচন', ১ জানুয়ারি ২০১৯; দৈনিক *প্রথম আলো*, 'বাংলাদেশে 'প্রহসনের নির্বাচন', ১৬ জানুয়ারি ২০১৯।

[৪৫] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'আমরা তৃপ্ত-সন্তুষ্ট, লজ্জিত নই : সিইসি', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪৬] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ধানের শীষের এজেন্ট না এলে কী করার : সিইসি', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৪৭] হারুন আল রশীদ, 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : প্রার্থীদের ব্যয়ের হিসাব পৌঁছায়নি ইসিতে!', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৯ মার্চ ২০১৯।

[৪৮] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ভোটের আগে সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা', ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৪৯] *সম্পাদক.কম*, 'হাজার কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য : তারেক চ্যাম্পিয়ন, এরশাদ দ্বিতীয়', ২১ নভেম্বর ২০১৮।

[৫০] দেখুন দৈনিক *প্রথম আলো*, 'ইসি ইচ্ছে করেই 'ঘুমিয়ে আছে', ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৫১] দেখুন মিজানুর রহমান, '৬ মাস নির্বাচনী পাহারাদার হোন', দৈনিক *প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১৯; মনজুর আহমেদ, 'এ কেস অব ওভারকিল : ক্যান ইট স্টিল বি রিডিমড?', *দি ডেইলি স্টার*, ২ জানুয়ারি ২০১৯; আনু মুহাম্মদ, 'জাতীয় নির্বাচন : জেতার জন্য এত কিছুর দরকার ছিল কি?', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৮ জানুয়ারি ২০১৯; এম সাখাওয়াত হোসেন, 'ইসিকে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; কামাল আহমেদ, 'একটি সফল নির্বাচন ও কিছু প্রশ্ন', দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৪ জানুয়ারি ২০১৯।

[৫২] দৈনিক *প্রথম আলো*, 'সন্তুষ্টির কথা জানাল ভারত, নেপাল, ওআইসি ও সার্ক', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

[৫৩] উদাহরণ হিসেবে দেখুন সোহরাব হাসান, 'দেখা ভোট, শোনা ভোট, না দেখা ভোট', দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'ইরেগুলারিটিজ ওয়াশ আউট অপটিমিজম', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; *ডেইলি স্টার*, 'অ্যাজ উই স', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; দৈনিক *মানবজমিন*, 'সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার বললেন আমার করার কিছু নেই', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; দৈনিক *যুগান্তর*, 'সহিংসতায় নিহত ২১, প্রার্থীসহ আহত ৭শ' : বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ, ১১ জনকে আটক, বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, গুলি, বোমা বিস্ফোরণ', ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার : নীতি এবং চর্চা *

মহুয়া রউফ

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য যেকোনো সরকারের একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন। এ কাঠামো রচিত হয় সমাজের প্রকৃতি, কর্মসূচি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে। জনপ্রশাসনের প্রধান কাজ সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বিশেষ করে জনপ্রশাসন সরকারের সব কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ করে। পল এপলবাই ১৯৪৭ সালে জনপ্রশাসনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন, 'জনপ্রশাসন হচ্ছে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সরকারি নেতৃত্ব যা সরাসরি সরকারের সব নির্বাহী কর্মের জন্য দায়ী।' তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনকে এমন নেতৃত্ব ও নির্বাহী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হয় যা নাগরিকের সম্মান, গুরুত্ব এবং ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদান রাখে।[১] বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুই স্তরবিশিষ্ট– উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর।[২] উচ্চস্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয় যা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দ্বারা গঠিত এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যস্ত। উচ্চস্তরকে নীতিনির্ধারণী কেন্দ্রও বলা যায়। অন্যদিকে নিম্নস্তর হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যা সাধারণ প্রশাসন এবং মাঠপর্যায়ে সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাজন ও তাদের অধস্তন দপ্তর বা সংস্থার পদ সৃজন ও বিলোপ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, নিয়োগ-পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন, সংশোধনসহ কর্মকর্তাদের আচরণ ও শৃঙ্খলা-সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।[৩]

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা সরকার, রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি খাতসহ সমাজের সব স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় খাতসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়। এ কৌশলে সার্বিকভাবে ১০টি রাষ্ট্রীয় ও ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়, যার মধ্যে জনপ্রশাসন অন্যতম। মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' গঠিত হয়েছে। তবে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' প্রণীত হওয়ার পর ছয় বছর অতিবাহিত হলেও জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় এটি কীভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার কোনো সার্বিক পর্যালোচনা এখনো হয়নি।

---

* ২০১৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট আইনের চর্চা পর্যালোচনা করা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল বাস্তবায়ন যেসব আইন ও নীতিকাঠামো দ্বারা পরিচালিত সেগুলোর পর্যালোচনা এবং সেসব আইন ও নীতি জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে প্রয়োগের চর্চা এ গবেষণার প্রধান উপজীব্য। সরকারের সব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, দপ্তর, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা যাদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি, শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, মূল্যায়ন, প্রণোদনা ইত্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তারা এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা, যেখানে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, দুদক কর্মকর্তা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মরত (ক্যাডার, নন-ক্যাডার) ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নসহ গবেষণাটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের জুন থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশল অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে ৫টি স্বল্পমেয়াদি এবং ৬টি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। স্বল্পমেয়াদি বলতে এক বছর, মধ্যমেয়াদি বলতে তিন বছর ও দীর্ঘমেয়াদি বলতে পাঁচ বছর চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১১টি কৌশল হচ্ছে–

স্বল্পমেয়াদি কৌশল

১. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদবিবরণী জমাদান

২. জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

৪. বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন

৫. শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল

৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন

৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন

৮. প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

৯. জ্যেষ্ঠতা, কৃত, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন

১০. ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন ও তার প্রসার

১১. যৌক্তিক বেতনকাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসনের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকারের কী কী আইনি প্রস্তুতি রয়েছে এবং তা কীভাবে চর্চা হচ্ছে তা নিচে পর্যালোচনা করা হলো।

১. প্রতিবছর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদবিবরণী প্রদান

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : ‘সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯’তে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদবিবরণী প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এ বিধিতে বলা হয়েছে চাকরিতে প্রবেশের সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানা বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বিমা, পলিসি এবং ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের অলংকারসহ সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা দিতে হবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ডিসেম্বর মাসে সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া নগদ টাকায় সহজে পরিবর্তনীয় সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে হবে। আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যবসা বা আবাসিক ব্যবহারের অভিপ্রায়ে নিজে বা ডেভেলপারের দ্বারা কোনো ভবন বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করতে পারবে না।[৪]

চর্চা : ১৯৭৯ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রদানের কোনো কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৮ সালে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সে সময় জনপ্রশাসন সচিব বরাবর সম্পদের বিবরণী প্রদান করেছিলেন।[৫] ২০১০ সাল থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা চাকরিতে যোগদানের সময় নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব প্রদান করে আসছেন। সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় ১৭ হাজারেরও বেশি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারের পূর্বানুমোদন না নিয়ে কর্মকর্তাদের একাংশ বাড়ি নির্মাণ করছেন বা ফ্ল্যাট কিনছেন এবং এসব সম্পত্তি স্ত্রী ও সন্তানের নামে কেনার প্রবণতা বিদ্যমান।

চ্যালেঞ্জ : প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সম্পদের হিসাব প্রদান কার্যক্রমটি যে দীর্ঘদিন চলমান নেই তা তদারকির প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।[৬] ১৯৭৯ সালে প্রণীত এ আইন কতটা সময়োপযোগী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর ছয়টি পে-কমিশন হয়। সর্বশেষ পে-কমিশনে বেতন শতভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৭] বিধিমালায় ঘোষিত সম্পদের যে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না তা আলোচনার বিষয়।[৮] শুদ্ধাচার কৌশলে প্রতি বছর সম্পদের হিসাব প্রদানের উল্লেখ আছে কিন্তু এ বিষয়ে জণপ্রশাষন মন্ত্রনালয়ের কোনো উদ্যোগ নেই।

বেশির ভাগ কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার মতে তারা যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আয়কর দেওয়ার সময় সম্পদের বিবরণী দিয়ে থাকেন, তাদের জন্য প্রতিবছর অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে সম্পদের বিবরণী প্রদান করা প্রযোজ্য নয়। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবাই আয়কর দেওয়ার উপযুক্ত নন। তবে এনবিআরে দাখিল করা তথ্য জানার অধিকার অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের নেই।

২. জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' ও 'জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণীত হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হলো কোনো ব্যক্তি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কোনো কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করলে তাকে সুরক্ষা প্রদান করা। তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি, দেওয়ানি, বিভাগীয় মামলা দায়ের বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অসত্য তথ্য প্রকাশ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় গোপন রাখার বিধান রাখা হয়েছে।

চর্চা : এ আইনটি ব্যবহার করে কোনো অভিযোগ প্রদানের তথ্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

চ্যালেঞ্জ : সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে জ্ঞানের বা সচেতনতার অভাব রয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নে একটি সহায়ক পরিবেশের অভাব, আস্থার ঘাটতি, বিপদে পড়ার আশঙ্কা অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে। আইনের ধারা ৫(৬) অনুযায়ী মামলার শুনানিকালে আদালতের কাছে যদি প্রতীয়মান হয়, তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত ওই মামলার ন্যায়বিচার সম্ভব নয়, তবে আদালত তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করতে পারবেন, এই শর্তের ফলে অভিযুক্তদের আইনজীবীর পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করার দাবি আদালতে উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ আছে। ফলে সম্ভাব্য তথ্য প্রকাশকারীর জন্য এটি নেতিবাচক প্রণোদনা সৃষ্টি করছে বলে অনেকে মনে করেন।[৯]

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থা (গ্রিভ্যান্স রিড্রেস সিস্টেম - জিআরএস) প্রচলিত আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮)' প্রণীত হয়েছে।

চর্চা : জনপ্রশাসনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত। ২০০৭ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অভিন্ন জিআরএস প্রবর্তন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে। সরকারি সেবা নিতে গিয়ে নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা বা কোনো সরকারি দপ্তর অসন্তুষ্ট হলে এই অভিন্ন জিআরএস পদ্ধতিতে অভিযোগ করতে পারে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোতে এ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালে সব মন্ত্রণালয়ে অভিন্ন ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) তৈরি করা হয়। সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেটে কেন্দ্রীয়ভাবে জনসাধারণের

অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।[১০] জনপ্রশাসনের সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর শৃঙ্খলাভঙ্গ বা আচরণজনিত অভিযোগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়। সব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা, অবৈধ কার্যকলাপ, বিধিবহির্ভূত সম্মানী ভাতা উত্তোলন, সরকারি বাসার ভাড়া পরিশোধ না করা ইত্যাদি কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ২ হাজার ৩১৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৩০৯টি অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত শৃঙ্খলাজনিত কারণে ৪১৫টি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮ জনকে অব্যাহতি, ১১৭ জনকে লঘুদণ্ড ও ৬৩ জনকে গুরুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং ৪৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল।[১১] সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক) সরাসরি অভিযোগ করা যায়। দুদক এ বিষয়ে হটলাইন চালু করেছে। গত কয়েক বছরে (২০১৪-১৭) দুদক পরিচালিত ফাঁদে ঘুষের টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪৬ জন সরকারি কর্মকর্তা। ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অনিয়ম, দুর্নীতিসংক্রান্ত অভিযোগে দুদক কর্তৃক গ্রেপ্তারকৃত সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬৮, ৮৪ ও ২৭।[১২]

চ্যালেঞ্জ : বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থা বিভাগীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর তা নিরসনে সময়ক্ষেপণ হয়।

৪. আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতি, প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তন

বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : নতুন কৃতিভিত্তিক কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতির (Performance Based Evaluation System-PBES) খসড়া প্রণীত হয়েছে।

চর্চা : পিবিইএস প্রক্রিয়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাইলটিং কেবল সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের জন্য এখনো আগের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (অ্যানুয়াল কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট–এসিআর) প্রচলিত রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ : আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতি প্রবর্তন শুদ্ধাচার কৌশলের স্বল্পমেয়াদি কৌশল যা সম্পন্নের সময়সীমা ছিল এক বছর। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)' প্রণীত হয়েছে। 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' প্রণীত হয়েছে।[১৩] 'জাতীয় পে-কমিশন ২০১৫' ঘোষণা করা হয়েছে।

চর্চা : ২০১৬ সালের ২৩ জুলাই প্রথমবারের মতো ৩০ জন কর্মকর্তা জনপ্রশাসন পদক লাভ করেন। পরে ২০১৭ সালে ২৬ জন ও ২০১৮ সালে ৩৯ জন কর্মকর্তা ও তিনটি প্রতিষ্ঠানের জনপ্রশাসন পদক লাভ করে। মাঠপর্যায় থেকে সচিবকে পর্যন্ত ২০১৭-২০১৮ সালে প্রথমবারের

মতো শুদ্ধাচার পদক প্রদান করা হয়। সরকারি খাতের চাকরিকে আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালে সর্বশেষ পে-কমিশনে বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। ২০১৬ সাল (বাংলা ১৪২৩) থেকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। উপসচিবদের গাড়ি কেনা বাবদ ঋণসুবিধা প্রদান ও উপসচিবদের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘোষণা করা হয়েছে।[১৪] পেনশনের হার সর্বশেষ মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগের স্থলে ৯০ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। কম সুদে গৃহঋণ পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তারা। সরকারি কর্মচারীর অবসরের সময়সীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ : বিভিন্ন দপ্তরের উপপ্রধানরাও সরকারের নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমানভাবে জড়িত থাকলেও গাড়ি সুবিধা না পাওয়ায় অন্যান্য ক্যাডারের উপপ্রধান পদে কর্মরতদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। বিভিন্ন প্রণোদনায় শুদ্ধাচার বৃদ্ধির পথে বাস্তব কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বেতন বৃদ্ধির ফলে দুর্নীতি কমেছে তারও কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহারণ নেই।

৫. প্রতিবছর শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : ‘বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১’ প্রণীত হয়েছে ও বিধিমালায় নিয়োগ-প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। ‘সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮’-এ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ উল্লেখ রয়েছে [ধারা ৪৯(১)]।

চর্চা : বর্তমানে জনপ্রশাসনে পদ শূন্য রয়েছে ২৩ শতাংশ। এসব পদে নিয়োগের বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের। সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমপর্যায় পদে ২৭ শতাংশ, সহকারী সচিব ও সমপর্যায় পদে ২৯ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। অন্যদিকে জনপ্রশাসনে ঊর্ধ্বতন পদে (উপসচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব) অপরিকল্পিতভাবে বেশি নিয়োগ করার ফলে উপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে ১০০ শতাংশের বেশি কর্মকর্তা কর্মরত। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে শুধু যোগ্যতাই নয় ক্ষমতাসীনদের ‘নিজের লোক’ হওয়া অলিখিত প্রধান যোগ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৫]

চ্যালেঞ্জ : বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল মিলিয়ে আড়াই বছর সময় লাগছে।[১৬] আইনে না থাকা সত্ত্বেও সরকারি কর্মকর্তা নির্বাচনে একাধিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক (পুলিশি তদন্ত, গোয়েন্দা তদন্ত, ডিজিএফআই) তদন্ত হচ্ছে। প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক আনুগত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তল্লাশি হচ্ছে।[১৭] প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভাগীয় প্রধান হয়ে টেকনিক্যাল ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়ার কারণে টেকনিক্যাল কর্মকর্তারা তাদের কর্মক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছেন না, ফলে দ্বন্দ্ব ও হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে।[১৮] নিয়মিত যোগ্য কর্মকর্তা থাকার পরও চুক্তিতে নিয়োগ সরকারের আর্থিক খরচ বাড়ায়। সচিব পদে চুক্তিতে নিয়োগে দক্ষ ও যোগ্য অতিরিক্ত সচিবদের পদোন্নতির সুযোগ সংকুচিত হয়। ক্ষোভ, অসন্তোষ, হতাশা ও কর্মদক্ষতার

ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনিক কাজের ধাপগুলো ক্রমশ বাড়ানোর (আট স্তর) ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপণ বেড়েছে।

সাধারণ ক্যাডার ও টেকনিক্যাল (ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, কূটনীতিক) ক্যাডারে একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ[১৯] হলেও শুধু প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পদে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি হয় প্রায়শই, অন্য ক্যাডাররা এ ধরনের পদোন্নতি পান না। গাড়ি কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণে আর্থিক সহায়তা কেবলমাত্র প্রশাসন ক্যাডারের জন্য। পদমর্যাদায়ও বৈষম্য রয়েছে।[২০] পুলিশপ্রধান (আইজি) ও স্বরাষ্ট্রসচিব সমান পদমর্যাদার হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের অধীন হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। শুধু সচিবালয়ে নয়, মাঠপর্যায়েও একই অবস্থা। বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের পদগুলোতে একই ব্যাচের শিক্ষকরা একই সময়ে পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ ও সময়সাপেক্ষ।[২১]

৬. সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' প্রণীত হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে ফৌজদারি মামলায় সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করতে হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে [ধারা ৪১(১)]। এ ছাড়া চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যেকোনো সময় সরকার সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করতে পারবে [ধারা ৪৫]।[২২]

চর্চা : সম্প্রতি প্রণীত হওয়ার কারণে এখনো চর্চা পর্যালোচনার সময় আসেনি।

চ্যালেঞ্জ : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান[২৩] বৈষম্যমূলক ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থি। এতে দুদকের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে এবং দুর্নীতির দায়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৭. 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-এ 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে।

চর্চা : 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'র একটি খসড়া প্রণীত হয়েছে ২০১৮ সালে।

চ্যালেঞ্জ : ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়নের উল্লেখ থাকলেও ইতিমধ্যে শুধু 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা'র খসড়া প্রণীত হয়েছে মাত্র।

৮. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩' প্রণীত হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা প্রমাণিত হলে তা পদোন্নতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হবে। শিক্ষানবিশকালের (দুই বছর) মধ্যে 'বনিয়াদি প্রশিক্ষণ' ও 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' সম্পন্ন

করতে হবে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর এক বছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করতে হবে বলে উল্লেখ আছে।[২৪]

চর্চা : বর্তমানে মোট ৩২৫টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।[২৫] বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (পিএটিসি) তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সদর দপ্তরে চারটি আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দুই ধরনের কোর্স প্রচলিত–প্রধান ও সংক্ষিপ্ত কোর্স। প্রধান চারটি প্রশিক্ষণ হচ্ছে– বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, প্রশাসন ও উন্নয়নবিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সিনিয়র স্টাফ প্রশিক্ষণনীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।[২৬] শুদ্ধাচারবিষয়ক দুটি কোর্স রয়েছে– দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কোর্স ও গভর্ন্যান্স ইনোভেশন কোর্স।

চ্যালেঞ্জ : প্রশিক্ষণ নীতিমালায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষানবিশকাল দুই বছরের মধ্যে কয়েকটি ক্যাডারের 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় না। যেমন পুলিশ, কৃষি, মৎস্য ও পানিসম্পদ, প্রশাসন (সার্ভে ও সেটেলম্যান্ট প্রশিক্ষণ[২৭])। নীতিমালায় বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর এক বছর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয় না। প্রশিক্ষণে দুর্বল কর্মদক্ষতা নেতিবাচক দিক হিসেবে পদোন্নতিতে প্রভাব ফেলবে বলে নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে পদোন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই।

৯. জ্যেষ্ঠতা, কৃতী, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮'-এ সরকারি কর্মচারীকে সততা, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদান করার উল্লেখ আছে [ধারা ৮(১)]।[২৮] 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭'-এ পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা হিসেবে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, চাকরিতে স্থায়ী ও চাকরি সন্তোষজনক হওয়াকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পদোন্নতি সম্পর্কিত 'উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২' রয়েছে।[২৯]

চর্চা : জ্যেষ্ঠতা, কৃতী, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও সিনিয়র স্কেল পদে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম থাকলেও উপসচিব থেকে সচিব পর্যন্ত পদোন্নতি পরীক্ষা নেই। পদোন্নতি বিধিমালায় উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রশাসনে পদোন্নতিতে 'গোয়েন্দা রিপোর্ট' যুক্ত করা হয়েছে। পদোন্নতি বিধিমালার নির্ধারিত নম্বর ছাড়াও যুগ্ম সচিব থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ে 'সার্বিক বিবেচনায় উপযুক্ত' বিবেচিত হতে হবে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের কাছে। এ বিধানটির অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার লঙ্ঘন হয়েছে একাধিকবার।

চ্যালেঞ্জ : নিয়মবহির্ভূত পদোন্নতি ক্রমশ জনপ্রশাসনে পিরামিড আকৃতির ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে।[৩০] একই পদে একাধিক কর্মকর্তা থাকায় কাজের ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে

তিন-চারজন অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কর্মকর্তারা পদোন্নতি পেতে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারও এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রশাসনকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসে, তারা নিজেদের লোককে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদোন্নতি দেয় এবং তা করতে গিয়ে প্রায়ই জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, মেধা, এমনকি সততার অবমূল্যায়ন করা হয়।[৩১] পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোরকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ক্ষমতাসীন দলের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী নয় এমন কর্মকর্তাদের ওএসডি করার প্রবণতা বিদ্যমান। ওএসডিকে বেতন-ভাতা, আবাসন সময়ান্তে পেনশনও দিতে হয় বলে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া এ কারণে কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না, অভিজ্ঞতার সুফল রাষ্ট্র পাচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে।

১০. সরকারি সেবায় ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন ও তার প্রসার

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' নীতিমালা।

চর্চা : সব অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলার সরকারি অফিস থেকে সরকারি সেবাগুলো ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত ই-সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম (নেস) তৈরি করা হয়েছে। সব ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়সহ সব সরকারি দপ্তরের জন্য প্রায় ২৫ হাজার পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে জমির বিভিন্ন রেকর্ডের নকল/পর্চা/খতিয়ান/সার্টিফাইড কপি প্রদান করা হয়।[৩২]

চ্যালেঞ্জ : এখনো মন্ত্রণালয়গুলোতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদান হয়। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে। এখনো সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের ই-গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানের ও দক্ষতার ঘাটতি।

১১. যৌক্তিক বেতনকাঠামো নির্ধারণ

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি : সরকার সর্বশেষ অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ ঘোষণা করেছে। সাবেক অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতিবছর মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে বেতন সমন্বয় করা হচ্ছে ২০১৮ থেকে।[৩৩]

চর্চা : অষ্টম পে-স্কেল অনুযায়ী কর্মকর্তারা মূল বেতন পাচ্ছেন ১ জুলাই ২০১৫ থেকে। ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ভাতা কার্যকর হচ্ছে।[৩৪]

চ্যালেঞ্জ : জাতীয় বাজেটের ১৪ দশমিক ২৬ শতাংশ জনপ্রশাসনের বেতন-ভাতায় ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতি হ্রাসের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে ৫টি কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক (যেমন প্রণোদনা ও পারিতোষিক, প্রশিক্ষণ, যৌক্তিক বেতনকাঠামো, সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন, সরকারি সেবায় ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন), অন্যদিকে ৩টি কৌশলের চর্চা এখনো শুরু হয়নি (বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়নপদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন)। রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না (যেমন প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি) এবং প্রশাসনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রশাসনের রাজনৈতিকীকরণের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ঘটার ফলে পেশাগত উৎকর্ষে ঘাটতির ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় (নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগের আগে একাধিক আইনশৃঙ্খলা সংস্থা কর্তৃক তদন্ত) সময়ক্ষেপণের কারণে জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতিবছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে।

সুপারিশ

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯

১. 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'কে শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে হালনাগাদ করতে হবে। আয়কর প্রদানের বাইরে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজিটালকাঠামো তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮

২. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'তে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বাতিল করতে হবে এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ধারা, যেমন ৬(১) ও ৪৫ সংশোধন করতে হবে।

৩. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'তে 'সরকারি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে আইনের সংশোধন করতে হবে।

নিয়োগ

৪. জনপ্রশাসনের ওপরের পদগুলোতে শূন্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ না দিয়ে নিচের দিকের শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রশাসনের পিরামিডকাঠামো ঠিক থাকে।

পদোন্নতি

৫. পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব ক্যাডারের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সব ক্যাডারের জন্য পদভেদে অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে আন্তক্যাডার বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. প্রশাসন ক্যাডার থেকে টেকনিক্যাল বিভাগের উচ্চপদে পদায়ন না করে টেকনিক্যাল ক্যাডার থেকে পদোন্নতি দিতে হবে।

৭. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত স্কোর ও দক্ষতার মূল্যায়নপূর্বক পদোন্নতি নিশ্চিতের বিধান রাখতে হবে।

কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা

৮. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও কর্মবিভাগের উপযোগী করে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (Career Plan)' চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১

৯. 'তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ https://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration (২৪ এপ্রিল ২০১৯)

২ Salhauddin Aminuzazaman & Sumaiya Khair, *National Integrity System Asesment Bangladesh*, TIB, 14 May, 2014.

৩ *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১২

৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সরকারি চাকরি আইন*, ২০১৮।

৫ সাক্ষাৎকার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব, ২১ আগস্ট ২০১৮

৬ *সাম্প্রতিক দেশকাল*, 'সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি সংশোধন চূড়ান্ত', ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ২০১৬; সহযোগী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) রাজস্ব কর্মকর্তা, উপদেস্টা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সহকারি পরিচালক।

৭ *ঢাকা টাইমস*, 'সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়ছে ১৪৭ ভাগ', ৭ ডিসেম্বর ২০১৪

৮ সাক্ষাৎকার, উপপরিচালক, ১২ জুলাই ২০১৮

৯ বদিউল আলম মজুমদার, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে 'হুইসেলব্লোয়ার' আইন', *প্রথম আলো*, ২৪ আগস্ট ২০১২।

১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিপত্র নং-০৪.২২২.০১৪.০১.০৬.০২৬.২০১০-৩২৬; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ সূত্র-প্রশাসন-২ অধিশাখার ইউ.ও.নোট নং-০৫.০০.০০০১.১১.০৯.০২১.১৭-৩৯ তারিখ : ১১/০১/২০১৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

১২ বার্ষিক প্রতিবেদন, দুর্নীতি দমন কমিশন

১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফখরুল ইসলাম, 'গাড়ি কিনতে সুদ ছাড়াই ৩০ লাখ টাকা ঋণ', *প্রথম আলো*, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ২০১৭

১৫ Ministry of Public Administration, *Statistics of Civil Officers and Staffs, 2017*, People's Republic of Bangladesh

১৬ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

১৭ আলী ইমাম মজুমদার, 'নিয়োগে কেন এত কালক্ষেপণ?', *প্রথম আলো*, ১৮ জুলাই ২০১৮

১৮ *যুগান্তর*, 'আন্তক্যাডার বৈষম্য নিরসনে উদ্যোগ নেই', ৩০ জুন ২০১৮।

[১৯] *প্রথম আলো*, 'আমাদের সামনে অনেক ঝুঁকি : আকবর আলি খান', ১ জানুয়ারি ২০১৮

[২০] সাক্ষাৎকার, উপপরিচালক, ১২ জুলাই ২০১৮

[২১] *কালের কণ্ঠ*, 'মধ্যম আয়ের দেশের পথেই ওঠেনি প্রশাসন', ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[২২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮।*

[২৩] মোর্শেদ নোমান, 'নিজেদের জন্য দুদকের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা কমাতে চান আমলারা', *প্রথম আলো*, ২৮ মে ২০১৮

[২৪] জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পলিসি, ২০০৩, বিপিএটিসি

[২৫] http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0% (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)।

[২৬] http://www.bcsadminacademy.gov.bd/site/page/aa60d4c7 (১২ অক্টোবর ২০১৮)

[২৭] আলী ইমাম মজুমদার, 'লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে পদায়ন কাঙ্ক্ষিত নয়', *প্রথম আলো*, ১১ মে ২০১৬

[২৮] সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[২৯] বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন" পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[৩০] আলী ইমাম মজুমদার, 'প্রশাসনে পদোন্নতিঃ রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এমনটা করা হয়েছিল', *প্রথম আলো*, ১৮ মে ২০১৬

[৩১] তপন বিশ্বাস, 'বদলায় না আমলাতন্ত্র-সংস্কারের সব উদ্যোগই থমকে যায়', *জনকণ্ঠ*, ৩১ জানুয়ারি ২০১৬

[৩২] আব্দুল্লাহ্ আল নূহু, 'প্রকল্প এটুআইঃ ছোট যাত্রা, বড় অর্জন', *ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ২০১৪

[৩৩] মো. আবদুল লতিফ মণ্ডল, 'অষ্টম পে-স্কেলঃ একটি পর্যালোচনা', *বণিক বার্তা*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫

[৩৪] *অর্থসূচক*, 'নতুন পে-স্কেলের ইনক্রিমেন্ট চালু হবে ২০১৮ সালে', ১২ মার্চ ২০১৭

Review Report on Goal 16
Peace, Justice and Strong Institutions *

Shahzada M. Akram, Juliet Rossette, Marufia Noor **

Introduction

The *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, also known as the Sustainable Development Goals (SDGs), is a set of 17 aspirational "global goals"[1] and 169 targets adopted in 2015 by all the 193 UN member states. The 2030 Agenda is a plan of action emphasising on the core principles of peace, people, planet, prosperity and partnership, which seeks to strengthen universal peace, prosperity and freedom. The goals cover the three dimensions of sustainable development: economic growth, social inclusion and environmental protection, while the key principle of the Goals is to 'leave no one behind'.

The global community has adopted SDGs to complete the Millennium Development Goal's (MDG) unfinished development agenda and meet sustainability challenges. Each UN member state should work towards a sustainable world for future generations.[2] The fundamental difference of SDGs with MDGs is a paradigm shift for quality compared to quantity alone. The pledges of the SDGs can only be achieved through higher levels of participatory governance and corruption control. The pledges on governance, accountability and anti-corruption, captured under Goal 16, are not only stand-alone targets but are meant to be mainstreamed in each of the 17 SDGs.[3]

---

* The main paper was prepared for the *National Consultation on The Progress of SDGs in Bangladesh in the Context of HLPF 2019*, held in Dhaka on 27 April 2019. This is an abridged version.

** The authors also acknowledge contributions from Nahid Sharmin, Md. Mostofa Kamal and Md. Sahidul Islam of *TIB,* Md. Rafiqul Islam of *Brotee,* Selina Ahmed Ena of *ASF,* Maheen Sultan of *Naripokkho,* Afrin Chowdhury of *JAAGO foundation,* Md. Mozahidul Islam, Selina Akhter Keya and Israt Jahan Biju of *HEKS/EPER,* Md. Korban Ali of *ActionAid Bangladesh,* Shara Arzooman Chowdhury of *Bandhu Social Welfare Society,* Taqbir Huda of *BLAST,* Md. Zahidul Kabir and Shabira Nupur of *World Vision Bangladesh,* and Md. Abdur Rahaman Khan of *The British Council.*

As part of its follow-up and review mechanisms, the *2030 Agenda for Sustainable Development* encourages member states to conduct regular national reviews of progress made towards the achievement of these goals through an inclusive, voluntary and country-led process. In addition, each year certain state parties volunteer to report on national progress to the High-Level Political Forum (HLPF). In 2019 the HLPF took place in July in the USA, and covered Goals 4, 8, 10, 13, 16 and 17. However, Bangladesh did not take part in the process in 2019.

According to the UN, many regions of the world suffer critically from armed conflict or other forms of violence that occur within societies and at the domestic level. Advancements in promoting the rule of law and access to justice are uneven. However, progress is being made in regulations to promote public access to information, albeit slowly, and in strengthening institutions upholding human rights at the national level.[4] Peaceful, just and inclusive societies are necessary to achieve the SDGs. People everywhere need to be free of fear from all forms of violence and feel safe, as they go about their lives whatever their ethnicity, faith or sexual orientation. In order to advance the SDGs, we need effective and inclusive public institutions that can deliver quality education and healthcare, fair economic policies and inclusive environmental protection.[5] It has been argued that, SDG 16 is both an end in itself, and a crucial part of delivering sustainable development in all countries. It has in fact been seen by many commentators as being the transformational goal and key to ensuring that the SDGs can be accomplished.[6]

Only a handful of efforts have been observed to assess the progress of Bangladesh in terms of achieving Goal 16. In the last government report on the annual progress of SDGs the status of different Targets and Indicators under Goal 16 have been presented. It can be observed that among the 23 indicators of the 12 Targets under this Goal, official government data is available only on eight indicators of six Targets.[7] According to another report, there are readily available (green) data for four, partially available (yellow) data for five, and data not available (red) for 14 indicators.[8] According to the SDG Index and Dashboards Report 2017, the progress of achieving Goal 16 is under the red category, scoring 54 out of 100. The overall score of Bangladesh is 56.2 and ranks 120th out of 157 countries.[9]

In 2017 Transparency International Bangladesh (TIB) conducted a research with the aim to do an independent appraisal of Bangladesh's preparedness,

progress and challenges toward achieving SDG 16.[10] The study concluded that corruption is rampant in the country despite having a robust legal and institutional framework for reducing corruption. There are huge gaps in implementation and practices of laws and policies although Bangladesh has achieved a good state of preparedness in terms of having a legal framework and clear institutional arrangement of the NIS institutions. Despite having a legal and institutional structure compared to many other countries, in reality the right to information regime is yet to be fully effective. Violations of basic human rights and fundamental freedoms by different state organs are still going on with the support of some legal loopholes.

Objective of the paper

On the occasion of the forthcoming *National Consultation on The Progress of SDGs in Bangladesh in the Context of HLPF 2019* conference, six status reports were prepared by the designated Partner organisations of the *Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh* on the six pre-identified SDGs – *Goal 4: Quality Education, Goal 8: Decent Work and Economic growth, Goal 10: Reduced Inequalities, Goal 13: Climate Action, Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions, and, Goal 17: Partnerships for the Goals.* These status reports feed into the preparation of the overview report titled the Citizen's Review on the Progress of SDGs in Bangladesh and were shared at the National Consultation in April 2019.

As part of this process, six Goal Groups (GG) were formed comprising partner organisations of the Citizen's Platform. The GG working on Goal 16, "Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels", comprises 12 partner organisations –TIB, *Brotee*, *Nagorik Uddyog*, Acid Survivors Foundation (ASF), Action Aid Bangladesh, Bandhu Social Welfare Society, Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), HEKS/EPER, *Naripokkho*, The British Council, and World Vision Bangladesh.

Scope and Methodology

The report intends to cover the following areas:

a. Assessing the progress of Goal 16 in Bangladesh including relevant policy, institutions, data and budget;

b. Capturing the lessons learnt – best practices and challenges, particularly

identified by the Partner Organisations' programs and initiatives in the concerned areas; and

c. Assessing the way forward for more effective delivery identifying the concrete steps the government should take and the Partners need to pursue.

Literature review of national and international index, survey and research reports has been done for preparing this report. Secondary data have been used from reliable sources (e.g. Household Income-Expenditure Survey of Bangladesh Bureau of Statistics), different sectoral reports of Bangladesh government, and publications of Civil Society Organisations (CSOs). Feedbacks on the structure and content of the report have been sought from four consultative meetings – with the international development partners, government functionaries, the media, and the private sector.

Priorities of Bangladesh for Goal 16: Initiatives and Achievements

The Government of Bangladesh has taken a number of steps for SDG implementation at the national level. The Government has adopted "Whole of Society" approach to ensure wider participation of NGOs, development partners, private sector, media and CSOs in the process of formulation of the Action Plan and implementation of the SDGs. To spearhead the process, the 'SDGs Implementation and Monitoring Committee' was formed at the Prime Minister's Office to facilitate and implementation of SDGs Action Plan.[11] The General Economics Division (GED) of Planning Commission[12] under the Ministry of Planning is the SDG Focal Point in charge of the implementation of the national SDG implementation process.

For the implementation of SDGs in Bangladesh up to 2030 a number of measures has been taken, that include a mapping of the ministries[13], a data gap analysis[14], developing a National Monitoring & Evaluation Framework[15], developing an Action Plan to achieve SDGs[16], and developing a Needs Assessment and Financing Strategy.[17] However, before the adoption of the SDGs, Bangladesh already had developed a 'National Sustainable Development Strategy' in 2013 to be implemented during 2010-2021 which included a strategy to improve governance. The objectives included all the issues covered in the SDG 16 including strengthening institutional capacity, reforming key institutions, controlling corruption, enhancing efficiency of planning and budgeting, financial sector monitoring, promoting e-governance, ensuring access to information, and reviving value and ethics in the society.[18]

Progress achieved so far

Target 16.1 on 'significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere'

It has been reported that in 2015, the rate of homicide victims per 100,000 population dropped to 1.8 with 1.4 for male and 0.4 for female (Indicator 16.1.1 on number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by sex and age). Over the past couple of years this indicator registered an annual average decline at 4.26%.[19] On the other hand, the homicide rate for Bangladesh was 2.5 cases per 100,000 population in 2015. Though Bangladesh homicide rate fluctuated substantially in recent years, it tended to increase through 2001–2015 period ending at 2.5 cases per 100,000 population in 2015.[20] According to Bangladesh Police statistics, in 2018, the total number of homicide cases in Bangladesh was 3,830.[21]

However, with regard to the proportion of population subjected to physical, psychological or sexual violence in the previous 12 months (Indicator 16.1.3), the occurrence of violence is ongoing. It is reported that 57.7% of the ever-married women experience any form of violence by their husband. Proportion of women subject to any form of violence in the previous 12 months is 38%.[22] The proportion of them experiencing physical or sexual violence is 54.2% and 26.9% in the previous 12 months.[23] According to another survey, 22% of respondents experienced violence or sexual harassment in the workplace or on their way to and from work.[24] The number of rape victims in a year hovered around similar figures over the last three years. At least 671 rape cases were reported by media in 2016, and about 818 incidents in 2017,[25] and the total number of rape victims in 2018 was 732.[26]

According to the Global Peace Index (GPI) Bangladesh scores 2.084 and is ranked 93rd among 163 countries in 2018 (see Table 1).[27] Moreover, according to SafeAround Bangladesh ranks 88 among 160 countries with the score 49 out of 100.[28] However, no government data is available on conflict related deaths per 100,000 population (Indicator 16.1.2), and the proportion of population that feel safe walking alone around the area they leave (Indicator 16.1.4).

Table 1: Bangladesh in the Global Peace Index (2016 – 2018)

Year	Rank (out of 163 countries)	Score (Out of %)
2018	93	2.084
2017	84	2.035
2016	83	2.045

Target 16.2 on 'end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children'

Although it has been reported that the government has made significant progress in adopting rules of 'Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012' in January 2017 and drafting an implementation roadmap for the 2015-17 national action plan, the abuse, exploitation, trafficking and violation against children are going on. A number of 1,675 children were killed and became subject to cruel tortures in 2017.[29] The proportion of young women and men aged 18-29 years who experienced sexual violence by age 18 (per cent) (Indicator 16.2.3) was 3.45 for females.[30] A baseline survey in 31 districts conducted by World Vision Bangladesh in 2018 shows that 50.8% children aged 0-4 years and 51% children aged 5-17 years experienced physical punishment and/or psychological aggression by their caregivers in the past month.[31] However, as of December 2017, number of victims of human trafficking has decreased to 0.58 from the baseline 0.85 in 2015 for every 100,000 population. This indicator recorded an average 17.4 percent rate of decline annually during the 2015-2017 period.[32]

The *Jatiyo Sangsad* adopted the Child Marriage Restraint Act 2017 on 27 February 2017, with a special provision allowing a boy or a girl to get married before reaching the statutory age limit in some exceptional cases has been feared to increase the rate of child marriage.

Target 16.3 on 'promote rule of law at national and international levels and ensure equal access to justice for all'

Achieving this Target is still a far cry. Bangladesh rose one position for overall rule of law performance (from 103) to 102 out of 113 countries in the 2017-2018 edition of the 2016 WJP Rule of Law Index. Its score places it at 4 out of 6 countries in the South Asia region, 24 out of 30 among lower middle income countries, and 102 out of 113 countries and jurisdictions worldwide.[33]

According to a study, access to justice in Bangladesh is still difficult, especially

for the poor and the marginalized. Costs and corruption in all parts of the system and interference by the political forces and powerful social elites make it difficult for the poor and vulnerable groups to access justice, while

delays with investigation by the police and frequent court adjournments increase the cost both in terms of lawyers fees but also in terms of lost work and productive hours and travel and related costs. As a result, the majority of Bangladeshis continue to rely on the informal system when faced with a conflict or dispute, and even when the victim of a crime. In this regard, the traditional forms of *salish* remain the most commonly used and provide a cheap, fast and relatively simple means of justice for most in the country.[34]

In 2015, 72.7% of the women who experienced violence from their partner never reported their experience to others. Only 2.1% victims reported to local leaders and 1.1% sought help from police. Since 2015 impressive progress has been achieved in this area. Although an annual target of providing legal aid to 37,000 beneficiaries by 2020 was set, in 2017 legal aid has been provided to 80,000 beneficiaries. Up to 2017, 16,000 cases have been settled through Alternative Dispute Resolution (ADR) on an average per year against the 7 FYP annual target of settling 25,000 under ADR by 2020.[35] Moreover, available data suggests that currently the proportion of un-sentenced detainees is quite high (79% in 2015) in Bangladesh, about double the target rate for 2030.[36]

Target 16.4 on 'by 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime'

With regard to this Target, not much has been attained. To prevent money laundering and illicit financial flows, the country has developed adequate legal[37] and institutional framework[38] and capacity consistent with international standards and good practices.[39]

However, despite the legal and institutional preparedness, a significant amount of money has been laundered in recent years and illicit financial flows have been increasing. According to the Global Financial Integrity (GFI) some $5.9 billion was siphoned out of Bangladesh in 2015 through trade mis-invoicing. The GFI found Bangladesh as one of the top 30 of countries, and ranked second in South Asia by dollar value of illicit outflows in 2015.[40] Moreover, the Swiss National Bank shows that money parked by Bangladeshis in

Swiss banks is worth around Tk 4,064 crore or 481.32 million as of 2017.[41] In November 2017, International Consortium of Investigative Journalist Published "Paradise Papers", which gave evidence that some businessman and business houses have sent money offshore accounts illegally.[42] Another form of illicit flow outside Bangladesh is through different programs such as the Malaysia Second Home. A total of 3,746 Bangladeshis has availed the investment opportunity in Malaysia that accounted for 10.50 per cent of the total beneficiaries until August 2017. Bangladeshis' participation in this project is found third largest after China (9,902) and Japan (4,372).[43]

Against this backdrop, there have been a few initiatives from Bangladesh to return the money. On 1 February 2019, Bangladesh Bank sued Rizal Bank in US court to recover US$ 66 million of stolen funds. The Bangladesh Bank filed a case with the United States District Court for the Southern District of New York against the Philippines' Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) and others, including several top executives, for their involvement in a "massive and multi-year conspiracy" to steal its money.[44] On 10 January 2019, a court in the Philippines convicted a former branch manager (Maia Deguito) at RCBC of money laundering, in the first conviction over the Bangladesh Bank reserves heist in which $81 million was stolen nearly three years ago. The Makati Regional Trial Court sentenced Deguito to a jail term ranging from 32 to 56 years, with each count carrying four to seven years. She was also ordered to pay a total of about $109 million in fine.[45]

Target 16.5 on 'reducing corruption and bribery in all their forms'

For achieving Target 16.5, the Government of Bangladesh recognizes combating corruption as critical to progress towards realising the *Perspective Plan – Vision 2021*,[46] the *7th Five Year Plan (7FYP)*[47] and *SDGs*. Furthermore, the 7FYP asserts that ensuring good governance requires establishing strong administrations and institutions, and that without a strong anti-corruption strategy the ability to implement Vision 2021 and the underlying five-year development plans will be seriously compromised.

Bangladesh apparently have a robust legal[48] and institutional[49] framework to fight corruption. Bangladesh became a party to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2007, and since then it has continued to fulfil the commitments of this Convention through enacting and amending relevant laws and policies. Institutions including the National Board of Revenue

(NBR), the Election Commission (EC), Information Commission (IC), and stakeholders such as the civil society, media and international community provide supporting but important roles in combating and preventing corruption in Bangladesh through playing the roles of watchdogs.

The government has undertaken a number of initiatives for promoting integrity and good governance. The Executive has formulated guidelines for cabinet meeting (summary formulation and presentation, participation in meeting, and procedure of implementing decisions), published best practices in service sector, started Access to Information (a2i) project, established the Governance Innovation Unit, started video conferencing with Deputy Commissioners, and sending encouraging mail to the best performing DCs based on an annual assessment under National e-service System (NESS) and Union Information Service Centre (UISC), introduced Fortnightly Confidential Report (FCR) for the DCs to report to the Cabinet Division by using Information Exchange Management System (IEMS).[50] It also formulated the Integrity Award Policy 2017[51], started signing Annual Performance Agreement (APA) between the Cabinet Division and other ministries and departments, and formed an Expert Pool for annual performance management in ministries/ departments.[52]

Moreover, the government introduced the Public Administration Award in 2015.[53] In order to make government jobs more attractive and decrease corruption, the salary and allowances were doubled in the Pay Commission of 2015. The government introduced loan facilities (interest-free BDT 3 million) for the positions of Deputy Secretaries and above for buying cars and maintenance allowances (monthly BDT 50,000). Other incentives include Bengali New Year allowance, allowance for buying mobile phone, house loan with minimum interest (5%), increasing pension rate, redefining pensionable job duration (5 to 25 years), and extending retirement age (up to 59 years).[54]

However, despite the presence of a robust legal and institutional anti-corruption structure, widespread corruption exists in the country, which is reflected in different national and international indices and surveys. According to the nation-wide household survey conducted by TIB on a regular interval, it is observed that the proportion of households experiencing corruption and bribery while taking services from both public and private sectors and institutions continues to be high. The 2017 survey reveals that 66.5% households became

victims of corruption while receiving services from different public and private sectors or institutions, which is almost similar to that of the findings of the 2015 survey (67.8%). However, the extent of bribery paid by households (on an average of Tk. 5,930 for services) has decreased in 2017 compared to 2015 (49.8% in 2017 compared to 58.1% in 2015). The nationally estimated amount of bribe paid to different service sectors was found Tk 106,889 million which is 21.2% more than that of 2015, 3.4% of extended national budget of 2016-17 and 0.5% of GDP for the same year.[55] Using identical indicators, results of three surveys of 2012, 2015 and 2017 show corruption level remains the same in almost all sectors.

The perception on the existence and spread of corruption in different international surveys and indices also reflects a similar picture. In Transparency International's (TI) Corruption Perceptions Index (CPI) 2018, Bangladesh scored 26 points on a scale of 0 (highly corrupt) to 100 (very clean), ranking 149th from the top out of 180 countries. It may be noted that Bangladesh has continued to score below 30 since the development of this index, which indicates that Bangladesh is a corruption-prone country.[56]

Two other indicators, the World Bank's Control of Corruption and the World Economic Forum's assessment of Irregular Payments and Bribes, paint a similar picture. The World Bank scores Bangladesh 19.23 for 'Control of Corruption'.[57] Among 15 areas of the business environment, firms in Bangladesh are more likely to rate political instability to be the biggest obstacle to their daily operations, followed by electricity, access to finance, and corruption.[58] Moreover, 47.7% of the surveyed companies reported bribery incidence (percent of firms experiencing at least one bribe payment request). According to the Global Competitiveness Ranking, Bangladesh scores 28 for the indicator on 'incidence of corruption', and is ranked 120th out of 140 countries for 2018.[59]

Over the last few years, the ACC has undertaken a number of initiatives. The ACC adopted its Strategic Plan and shared with stakeholders for feedback in 2018. It revised its organogram proposing the establishment extending at all district levels and sent to the Cabinet Division for approval. The ACC formed its own armed force unit and established prison cell. It also sent a proposal of engaging district administration in anti-corruption activities to the Cabinet Division for approval. It also formed its Internal Discipline Unit. The Legal Department of ACC was strengthened – 20 lawyers were excluded from the

list of panel lawyers due to lack of their proactive role in pursuing corruption cases. Instead, five young and energetic lawyers have been included in the panel. The ACC also introduced a 'Hotline-106' for widening ready access to prospective complainants. Any complainant can lodge complaints by making toll-free calls from any phone.

Some progress have been attained in terms of curbing corruption thanks to a number of initiatives undertaken by the ACC over the last two years. As a result of such initiatives, Tk 3,590 million was recovered out of the money forged from Basic Bank in 2016. In 2015 the number of allegation received by ACC was 10,415. In 2016 and 2017 this number was 12,990 and 17,953 respectively. The average conviction rate in corruption cases has been increased – from 37% during 2013-2015 to 68% in 2017. ACC high officials were instructed to arrest all listed accused corrupt persons. As a result of such strong position, 182 persons accused of corruption were arrested in 2017. The ACC identified nine key sectors including education, health, Department of Roads and Highways, Dept. of Public Works, Chattogram Port Authority, Biman Bangladesh Airlines, Income Tax Dept., Dept. of Customs and VAT to explore and monitor corruption.[60]

However, despite having taken some recent initiatives, the ACC has not been able to show its ability and political will to take actions against the high level politicians and public officials. Policies related to transparency and accountability in public institutions are regularly flouted. The willingness of the government to pursue anti-corruption measures is often challenged and questioned. In general the efforts for tackling corruption has not been up to the expected level.

Target 16.6 on 'Developing effective, accountable and transparent institutions at all levels'

Bangladesh already have a good state of preparedness in terms of having legal frameworks and clear institutional arrangements for the NIS institutions. Laws are there to determine effective functioning, transparency, and accountability of these institutions. The Constitution of Bangladesh clearly spells out the formation, function and accountability mechanism of main organs of the state i.e., the parliament, judiciary, and executive. The Constitution also provides clear ideas about formation and function of some basic institutions, which includes the local government institutions

(LGIs), Election Commission (EC), and Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG). However, the Constitution does not cover directly about other institutions taken into consideration in the NIS. Other than the Constitution, there are a huge number of laws and policies having the determinations of the functions of the said institutions. The major laws, as well as their specificities in determining effective functioning, transparency, and accountability, are shown in Annex 1.[61]

All NIS institutions are endowed with well-defined institutional arrangement. A few institutions like the Parliament, the Executive, and Public Administration are siphoned with adequate human resources. Some institutions such as the Parliament, Executive, LGIs, OCAG, EC, public administration, law enforcing agencies (LEAs), and ACC occupy adequate infrastructure for effective functioning of their businesses.[62]

According to the first indicator set against the Target 16.6, the selected institutions are expected to have the capacity to make effective use of the resources allocated for their functioning. It is observed that a few institutions such as LEAs, the Executive, National Human Rights Commission, public administration and the Judiciary have a good capacity of expenditure of allocated budget (Table 2).

Table 2: Non-Development and Development Expenditure of 2016-17 (excluding loans & advances, domestic & foreign debt, food account operations and structural adjustment expenditure) (in Million BDT)[63]

Institution	Expenditure	Budget	%
Parliament	2,310	2,950	78.30
Executive	12,990	14,380	90.33
Judiciary	14,030	16,720	83.91
Local Government	1,53,880	213,220	72.17
Public Administration	16,940	20,200	83.86
Law Enforcing Agencies	1,81,710	199,640	91.02
Election Commission	6,320	12,900	49.0
Information Commission	2,461.40	3,500	70.33
Human Rights Commission	59.87	69.64	85.97

A number of initiatives were taken to increase the effectiveness and excellence of the courts.[64] The Bangladesh Judicial Rules 2017 was adopted for lower court judges.[65] The Government Employment Act 2018, and the Bangladesh Public Administration Training Centre Act 2018 have been enacted, while the Model Recruitment Policy 1987 has been updated. Furthermore, due to the student movement for reforming in the quota system in public service recruitment process government abolished the quota system for the appointment of 1st (9 Grade) and 2nd (10 to 13 Grade) class government officials on 4 October 2018.[66]

However, subtle gaps are there in the laws, which create a scope of dismantling independent status of them in a real sense.[67] Real independence of the NIS institutions is far reaching unless laws are formulated and enacted to cut off the dependency on the Executive. Many transparency and accountability initiatives are prevalent on paper. There are significant gaps in implementation especially in the areas of human rights violation, corruption and holding the powerful political elites accountable. Controlling attitude and practices are evident in the Executive to use and control LEAs, ACC, EC, media, civil society and business by means of shaping legal framework as well as by creating disabling climate. Independent institutions suffer from mistrust and inefficiency which is derived from faulty appointment procedures of the chiefs and members of institutions, which is mostly made on political consideration. There are shortages of human resources and budget as well as capacity constraints in many of the NIS institutions, which might hamper true progress of the institutions for being effective, transparent and accountable in a true sense.

For instance, a huge number of "fake cases" was lodged just before the National Election of 2018. Up to October 2018 a total of 3,60,314 individuals were accused and 4,650 were arrested in 4,135 cases all over the country.[68] During the 284 days of anti-drug campaign starting in 2018, a number of 312 were killed in the so-called "cross-fire" with different law enforcing agencies, and among the confronting drug dealers.[69] The 11th National Parliamentary Election and city corporation elections held in the last year were heavily criticized due to widespread anomalies and violations of electoral code of conduct by the candidates, political parties as well as the ruling government.[70]

A number of regressive legal reform has taken place in the last few years. The Government Employment Act 2018 was enacted with a provision of

receiving government permission before arresting a public servant, which is discriminatory and thus against the spirit of the Constitution.

Target 16.7 on 'Ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels'

Bangladesh has some achievements with regard to reducing gender gap. According to the Global Gender Gap Index 2018, Bangladesh score 0.721 and rank 48th out of 149 countries globally.[71] Bangladesh was ranked 64 scoring 0.704 among 145 countries in the Global Gender Gap Index 2015.[72]

The portion of females in public services (from first class up to fourth class) is gradually increasing – it is around 28% of the total work force (13,62,298), among which the portion of first class female officials is 20% (30,042 out of 1,54,681), and the highest (34%) is in the second class category (40,563 out of 1,17,878).[73] It may be noted that there are ten females at Secretary or equivalent positions, which is 13% of this level staff. In the administration, there are 78 female Additional Secretaries (15% of 533), 97 Joint Secretaries, 202 Deputy Secretaries, 360 Senior Assistant Secretaries and 435 Assistant Secretaries. At the field level there are one Divisional Commissioner, six Deputy Commissioners, 20 ADCs, 113 Upazila Nirbahi Officers, and 105 Assistant Commissioners (Land) who are females.[74] It may also be noted that in 2010 there were 2,27,114 female staff in government services.

Target 16.9 on 'By 2030, providing legal identity for all, including birth registration'

There have been a major progress with regard to achieving this Target. According to a survey, 37% of the children under 5 years of age have been registered, while in 2001 registration rate for this age group children was 10%,[75] thanks to the 'Birth and Death Registration Project' began in 2001 with UNICEF support under the Local Government Division. A new birth and death registration act was adopted in 2006. In 2009, Birth and Death Registration Information System (BRIS) was initiated to provide electronic registration. All these contributed to significant improvement in birth registration for all in the country.

Target 16.10 on 'Ensuring public access to information and protect fundamental freedoms'

In ensuring Target 16.10, Bangladesh fares well with regard to legal and institutional structure compared to many other countries. Some fundamental

freedoms such as equity, rights to life and livelihood, freedom of thoughts and conscience and freedom of speech, freedom of assembly, freedom of religion, freedom of movement, and rights to property have been ensured in the Constitution of Bangladesh. Besides, other rights (such as information rights) have been confirmed according to the relevant laws. Bangladesh has signed or ratified (partially / completely) some international declarations and charters regarding various rights.[76] Moreover, Bangladesh adopted the Right to Information Act, 2009 to protect people's access to information. Under this Act, a statutory independent body has been formed which is accountable to the head of the state. Besides, the 'Strategic Plan 2015-2021' and guidelines for the implementation of the Proactive Information Discloser, 2014 have been formulated.

The score and ratings of the country in the field of information rights are moderate. According to the Freedom in the World Rating, Bangladesh scores 47 in 2017 and 45 in 2018 out of 100, which means there exists "partially open" freedom of expression.[77] The World Press Freedom Index shows that Bangladesh scores 48.36 in 2017 and 48.62 in 2018 out of 100 with 146th position in both years among 180 countries; no change has been made here.[78] The Global Right to Information Rating shows that Bangladesh secures 107 points out of 150 with 24th position among 111 countries which remains unchanged in 2019.[79] The IC Report 2015 shows that 6,181 RTI applications were received in 2015, among which information were delivered to 5,954 applications (96.33% of the applicants). In 2016 6,369 RTI applications were received, among which information were delivered to 6,082 applications (95.49% of the applicants). In this year 183 appeal (91.04% of total appeal) were resolved by the concern authority out of 201.[80] APAs signed between Cabinet Division and other ministries have included the provisions of the Proactive Information Disclosure Guideline in 2014 where clear instructions were provided regarding the kinds of information one should provide in government websites.

However, in reality the right to information regime is yet to be fully effective. Violations of basic human rights and fundamental freedoms by different state organs are still going on with the support of some legal loopholes. In spite of having appropriate legal framework, there is a tendency to diminish fundamental freedom in Bangladesh. For example, LEAs are alleged for extrajudicial killings. A total of 195 people in 2016, were subject to extrajudicial killings

by LEAs. In 2016, LEAs were accused of abduction, kidnapping and murder of 97 people. In 2017, 162 people were killed by LEAs through crossfire, gunfight, and shootout. Besides, 53 people died under jail custody in 2017, among them 33 were prisoners and 20 were convicted prisoners.[81]

In a statement to the authorities in February 2018, the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances said that the number of enforced disappearances had risen considerably in recent years. Reports suggested that more than 80 people were forcibly disappeared during 2017.[82] During the period between January to October 2018, 437 persons were victims of extrajudicial killing.[83] Moreover, in 2017, there were at least 30 assaults on journalists.

In September 2018, the government passed the Digital Security Act, designed to monitor all electronic communications. This new law was supposed to address abusive provisions in the Information and Communication Technology Act. However, the new law still retains similar provisions and contains new sections to criminalize free expression. Meanwhile, hundreds continued to face charges for their social media commentary. Human rights groups remained under pressure, due to restrictions on accessing foreign funding. Journalists reported threats and intimidation to prevent any criticism of the government.[84]

There are allegations of misusing of some articles of the law against the publication of information and opinion. For example, the preventive part of Article 14 of the Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Act, 2016 limits the freedom of expression and independence of NGOs and CSOs. It is feared that Articles 8, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 43 and 58 of The Digital Security Act 2018 and Article 57 of the Information and Communication Technology Act 2017 are against the spirit of Article 39 of the Constitution of Bangladesh, and thus restrict free-thinking, freedom of speech and freedom of expression.[85] As a result control by the government over the media has increased; they are proactively practicing self-censorship. Facebook and Twitter have removed Bangladesh-based 30 pages and account for broadcasting fake and confusing news. Furthermore, Bangladesh Association of Banks (BAB) proposed a Bank Reporting Act in April 2018, which will prevent newspapers to publish reports about corruption and malpractices by the bank and financial institutions.[86] Moreover, the National Online Mass Media Policy 2017 and the Bangladesh Press Institute Act, the National Broadcasting Act, drafted as upcoming laws

are feared to increase government control and restriction on the freedom of expression.

Target 16A on 'Strengthening relevant national institutions for building capacity at all levels to prevent violence and combat terrorism and crime'

In accordance with the provision of National Human Rights Commission Act 2009, a statutory independent National Human Rights Commission was established, with an aim to contribute to the embodiment of human dignity and integrity as well as to the safeguard of the basic order of democracy so that inalienable fundamental human rights of all individuals are protected and the standards of human rights are improved in the country. The Commission is now implementing its Second Five Year Strategic Plan (2016-20) where it identified 17 Pressing Human Rights Issues with Priority Areas for 2016-2020. In 2016 the Commission responded to 692 cases of human rights violation of which 665 were submitted to the Commission by the defenders themselves and the rest 27 were *Suo Moto* action by the Commission. Larger number of violations consisted of violence (108), jobs (56), dowry (21), killing (20) and abduction (10). The number of complaints resolved in 2016 stood at 503.[87]

Target 16B on 'Promoting and enforcing non-discriminatory laws and policies'

There have been a little progress with regard to this Target. The NHRC along with a few CSOs has worked closely with the National Law Commission to prepare a draft of Anti-Discrimination Act. However, the proposed act is yet to get approval by the cabinet and the Parliament.

From the above discussion, it may be concluded that the government has undertaken a multi-pronged approach to achieve SDGs. Necessary exercises of mapping of relevant bodies and gaps in data have been conducted, along with preparing monitoring mechanisms and tracking tools. The needs assessment of funds and possible sources have also been exercised. It may also be observed that the government has adopted the approach of promoting integrity and good governance among the public administration. A number of initiatives have been undertaken in this regard. However, the government is yet to develop specific strategy and plan of action for achieving a number of Targets under Goal 16. Despite different initiatives, the government planning lacks adequate emphasis on SDG 16, as there is significant gaps in baseline data.

Engagement of Civil Society Organisations (CSOs) in program delivery and advocacy

A number of CSOs in Bangladesh are implementing different programs for achieving different Targets of Goal 16. Most of these CSOs have been implementing their programs much longer before the SDGs have been adopted, while a few have designed new programs and started to implement since the adoption of SDGs.

CSOs such as NU, ASF, Bandhu, and Ain-O-Salish Kendra (ASK) have been implementing programs on Target 16.1. These CSOs are working to reduce all forms of violence and related death. They collect and document information related to human rights violations. Some of the CSOs are working with the poor and marginalized communities (such as *Dalits*) to reduce domestic violence and other forms of violence and thereby building peace through using traditional conflict resolution system and human rights and legal education. The CSOs impart education on human rights that also help reduce violence in the community. Community human rights activism is developed to address the rights of the citizens and environmental promotion through community forums. They have shown many instances of taking collective actions to protect and improve of peoples' rights. Some of the CSOs are also facilitating to promote human rights defenders among the marginalized communities. Theatre is used as one of the methods for disseminating information and raising awareness on human rights.

CSOs including NU and ASK are working on achieving Target 16.2. The CSO platform that has been formed with child rights organisations work together for protecting and promoting child rights. These CSOs involve and work to promote and establish child rights, and directly work on many awareness raising programs such as educating parents, children, teacher about abusing, harassment, trafficking and torture. Awareness raising and training program at the community level includes the risk of trafficking and how to prevent trafficking from the community. They also follow and make others aware about strict policy to prevent abuse and exploitation at the internal and external level. They are playing an active role through advocacy and mobilisation for policy advocacy. Some CSOs also runs 'drop-in' centres in the city for working and street children. Drop-in centres provide them a safe place to share the problems they face and can learn how to protect them from the risk of violence and torture.

On Target 16.3, a number of CSOs including Bandhu, BLAST, ASK, BROTEE, ASF, NU, Wave Foundation and HEKS/EPER have been working for long, while a number of CSOs including TIB has been playing a supporting role. CSOs like BLAST, ASK, Brotee are playing a cardinal role in furthering SDG 16.3 by providing access to justice in Bangladesh, with an enhanced focus on inclusion of marginalised and socially excluded communities. Their main programs are raising awareness, providing free legal advice through properly qualified lawyers, para-legal and facilitators, facilitating alternative dispute resolution (ADR) through mediation, providing advice and representation for individuals whose disputes cannot be resolved through mediation, and making referrals for clients to governmental agencies and non-governmental organisations working on legal aid.

The CSOs organize courtyard meetings, training sessions, rights fairs and networking meetings for the purpose of increasing community awareness on rights. Some CSOs use social media to raise public awareness among lawyers, students, civil society groups and rights activists. These efforts not only provided knowledge on rights, remedies and services to relevant groups at the local and national levels, but also created opportunities for improving referrals and coordination between service providers in government and within the social sector. Some CSOs have been operating mobile legal clinics, especially in Dhaka urban slum areas, providing legal information and advice to individuals who live far away from any legal aid office.

TIB and NU have been implementing programs for achieving Target 16.5. TIB has a robust program for preventing corruption and raising awareness against corruption. Its activities include in-depth research on the state of effectiveness, transparency and accountability of different public and private sectors and institutions, civic engagement at local level for raising awareness among the common people against corruption at local level service delivery institutions, and policy advocacy for legal, institutional and policy reforms at the national level. The main objective of research is to shed light on the governance deficits and corruption of different sectors and institutions alongside the burden of corruption imposed on the people seeking public services and prescribes solutions. As a part of civic engagement TIB organizes different categories of local level volunteer groups.[88] Different activities at local levels include Satellite Advice and Information Desk[89], Mothers' Gathering, advocacy meetings, monitoring of programs and activities of

different service providing institutions education, health, local government, land etc. Using these tools, citizens raised questions and/or demands against corruption and irregularities along with ensuring good governance and better services. On the other hand, NU's community forum is proactive to identifying the most deserving families in order to have access to social safety net programs without briberies and nepotism.

CSOs including TIB, *Shushashoner Jonno Nagorik* (Sujan), BROTEE, NU, HEKS/EPER, AAB, World Vision, Democracywatch, *Shushashoner Jonno Procharabhijan* (Supro) implement programs for developing effective, accountable and transparent institutions at all levels (Target 16.6). One of the focus areas is the democratic process and institutions of Bangladesh, under which research on the Parliament, monitoring of elections and electoral process, role of democratic institutions such as political parties are regularly carried out that are targeted to developing effective, accountable and transparent democratic institutions. Local communities are engaged in the process of putting pressure on local institutions to be more transparent and accountable. This is done through different social accountability tools, setting up complaint redress mechanisms including installing complaint boxes, introducing complaint and RTI register which enhanced the accountability mechanism and improved quality of services in targeted institutions.

CSOs such as HEKS/EPER, The British Council, AAB, NU, TIB, Wave Foundation and Democracywatch are involved in ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels under Target 16.7. This is done through open budget, *ward shava* (ward meeting), face the public/ public hearing, and multi-stakeholder meetings. The local level community groups formed by different CSOs provide the community people the opportunity to participate in the decision-making process of the local level institutions, and help improving transparency and accountability of the respective institution.

CSOs such as NU are working with the government for promoting legal identity for all, including birth registration by 2030 (Target 16.9). The Birth and Death Registration Act, 2004 provides for registration of every child born in Bangladesh irrespective of race, colour, sex, language, religion, national or social origin, property or birth. CSOs working with *dalits*, linguistic minorities, plantation (tea) workers, marginalized groups, and poor and informal sector workers who are left out to register their birth through raising awareness

about birth registration and offer support to government efforts to improve access to registration services. They also work to get the civil documents such as passport, National ID, License, etc. for linguistic minorities (particularly Bihari community), who are often denied legal identity by the authority.

TIB, MJ, MRDI, Sujan, NU, Democracywatch, Right to Information Forum (RTI Forum) and other CSOs are implementing programs to achieve the Target 16.10. Information disclosure mechanism is an effective tool in this regard, which contributes to disclose information for the citizens proactively, and basis on demand. TIB has a significant contribution to assign designated officer in almost 100% of its working institutions and introduced displaying citizens' charter, information board, sign, different symbol etc. for the citizens as the part of RTI Act, 2009. Moreover, CSOs including ASK and *Odhikar* regularly collect information on the status of fundamental human rights and freedom of expression, and publish regular reports. Through these programs a repository of information has been developed, which is often cited and used by international organisations.

NU has been active in strengthening relevant national institutions for building capacity at all levels to prevent violence and combat terrorism and crime (Target 16A). It is working with National Human Rights Commission (NHRC) as member of different thematic committees of NHRC to prevent and promote human rights. Also working closely with IC, representative from CSOs work as core trainer of the Commission.

For promoting and enforcing non-discriminatory laws and policies (Target 16B), HEKS/EPER and NU have been advocating for enacting Anti-discriminatory act since 2012. They submitted the first draft to the law commission of the Anti-Discrimination Act 2014. Later on NHRC and some other CSOs worked closely to the National Law Commission to prepare a final draft of the law. Unfortunately the proposed act is still pending to get approve by the cabinet and parliament. CSOs are also working with designated authorities to have national development strategy, separate ministry and human rights commission to look after the affairs of *dalit* and *adibashi* people. In light with that end, a 13 points declaration has been adopted through a national convention.

The above discussion on different activities of CSOs pertaining to different Targets of Goal 16 demonstrates that CSOs are playing an important role along with the government in achieving Goal 16. Most of the CSOs are providing support to the poor and marginalized groups, covering a wide spread of

population, and thus contributing in promoting the ‘Leave No One Behind’ approach of the SDGs.

Impact of CSO activities on Achieving Goal 16

Institutional, policy and legal reforms

Through research and advocacy activities of the CSOs, a number of institutional, legal and policy reforms have been possible over the years. NIS institutions such as the ACC and the IC that are crucial for establishing good governance and combat corruption have been established as a result of intense advocacy by some CSOs. Important institutional reforms were made in the Election Commission and the Public Service Commission thanks to knowledge-based advocacy from the CSOs. The Parliament, the Judiciary and the OCAG took different reforms in terms of practice within these institutions.

A number of policies such as the Gold Policy 2018, a Uniform Policy of Recruitment and Promotion/ Upgradation of Teachers for All Public Universities, 2017, The National Drug Policy, 2016, laws such as the Anti-Corruption Commission Act 2004, The Right to Information Act 2009, Public-Interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011, four regulations and The Food Safety (Technical Committee) Rules, 2017 were adopted as a result of continuous CSO advocacy. In many instances they were directly involved in the formulation of the respective acts. Due to persistent efforts from ASF along with other human rights based organisations, Bangladesh government enacted two laws in 2002 – one that heightens criminal penalties and improves criminal procedures and another that controls the availability of acid. The Revision of The Labour Law, 2006 incorporated a number of issues pertaining to the RMG sector, while the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) were revised taking into considerations different suggestions from CSOs working in this area. The Accreditation Council Act, 2016 was drafted with a view to ensuring standards in higher education in both public and private universities in the country and still awaiting for approval of the Cabinet. An office order was issued in August 2016 with 19 instructions for ensuring transparency and accountability of the locally raised (LR) funds at the DC offices in all districts.

Change of institutional practices have been evident in different public institutions such as the ACC, OCAG, Bangladesh Telephone Communications

Limited (BTCL), National Curriculum and Textbook Board (NCTB), and Department of Immigration and Passport (DIP). The OCAG of Bangladesh directed the Local and Revenue Audit Directorate in February 2017 to include seven most corrupt sectors in its audit program on a priority basis in accordance with the findings of 'National Household Survey 2015' report released in June 2016. The Case Management Reforms Committee and Monitoring Committees of the Law and Justice Division, Ministry of Law were reconstituted and reinforced to identify and address the reasons for delay in disposal of cases in the Courts of all tiers. As part of bringing the courts under ICT network and recording the testimony of witnesses, audio recording system was piloted in Sylhet District Court.

In line with TIB recommendations the government took various measures to prevent question leakage in public examinations.[90] Law enforcers arrested 153 people in 52 cases filed over question leak since the start of SSC examinations in 2018. The Directorate of Primary Education (DPE) decided to transfer Office Assistants at the Upazila Education Offices who had been working for five years or above in a single station.

A number of initiatives have so far been undertaken by the Ministry of Health and Family Welfare to improve the effectiveness, transparency and accountability of healthcare providing public institutions.[91] The DIP circulated some office orders to stop undue practices in passport offices. The DIP also established two new offices in Dhaka city to reduce overload and pressure on passport services. Public hearing on passport services was extended to local level offices to ensure transparency and accountability in the service delivery. The DIP also took action against four officials for their involvement in corruption and irregularities.

The University Grants Commission (UGC) formed a committee to carry out an inquiry into the allegations suggested by a study conducted by TIB. The government appointed an observer for each of the private universities to curb absolute monopoly of the Trustee Board in the decision making processes. Higher official from both the Ministry of Education and UGC made unscheduled visit to private universities and thereby took measures on identified irregularities. The UGC issued show cause letter to the universities on account of circulating admission notices of unapproved subjects. The UGC introduced a unified reporting format (Private University Regulation Form) to ensure university's financial accountability. The UGC also adopted

a monitoring system to monitor the use of part-time teachers in private universities.

The NGO Affairs Bureau issued a letter to all NGOs in 2018, directing to take necessary measures in light of the recommendations proposed in a TIB study on 'NGOs of Bangladesh Funded by Foreign Donations: Governance Challenges and Way Forward'. The Ministry of Land circulated some directives to improve governance and reduce corruption through proactive disclosure of information in land offices. The Cabinet took a decision that permission will be required from concerned authority for the use of land for any development or industrial purposes.

The private sector also underwent a number of institutional reforms and change in practice. For instance, the readymade garments (RMG) sector has adopted a number of initiatives in response to different CSOs' continued research and advocacy. These include providing service contract papers to the workers as well as ID card containing emergency phone number, issuing an order to the factory owners to appoint female welfare officers to address gender issues, building capacity of all factory inspectors for curbing corruption in supply chain and formulating a code of ethics for the inspectors, and developing a Workers Welfare Fund for RMG workers in July 2016 with the contribution of 0.03% export value of the RMG manufacturers.

Information dissemination

Through research and advocacy campaign on different issues covered under Goal 16, the CSOs have been providing a great contribution on information dissemination. Different media are utilized for this purpose, which include street theatre, production and airing of television commercials, information fair, and competitions in different mediums.

For information dissemination and awareness building CSOs including TIB, ASK, is facilitating local theatre groups on developing story-based street theatre production and organising public shows highlighting the corruption and irregularities in the fundamental sectors like health, education, local government, RTI etc. in Dhaka and CCC areas. Information fairs are also organized at the local level where all the government service delivery institutions take part. The Satellite AI-Desks organized by TIB's local level volunteer groups play an important role in disseminating information on different public services including education, health, local government, and land related services.

Television commercials and documentaries helps enhancing knowledge as well as creating awareness against corruption. TVCs for RTI on land, anti-bribery in recruitment, graft liability upon women, ALAC animation were developed and successfully aired on the private television channels.

TIB arranges national level anti-corruption competitions such as debate competitions, cartoon competitions, photography competitions and moot court competitions. Investigative Journalism (IJ) Award and Fellowships and Training are also playing important roles in anti-corruption knowledge generation and awareness raising through their investigative reports on corruption issues.

Raising awareness

Awareness raising by different CSOs are done through social mobilisation, engagement and advocacy at community level on governance and anti-corruption. Multi-dimensional and multi-stakeholder prevention campaign has contributed to significant reduction of the number of violence against women over the years. Activities have been designed to contribute for changing gender stereotype at all level to prevent acid and other forms of gender-based violence.

Men and boys engagement through transformational changes created a good practice to address reduce gender based violence in Bangladesh. Through *kabigaan*, folk music, *baul* song, inter-community dialogue on peace and social cohesion, and theatre on election-time peace, CSOs try to reduce violence and promote peace building.

ASF's multi-dimensional and multi-stakeholder prevention campaign has contributed to significant reduction of the number of acid attacks over the years. Before the ASF prevention campaign started in 2002, there were over 500 recorded attacks. In 2010 the number decreased to around 153, which nevertheless remains a grave concern with one attack in every two and half days. In 2015 the number of acid attack was 59 and victimized 74, in 2017 it was 48, and in 2018 it was 22.

Due to programs implemented by *Brotee*, 84,169 (32% indigenous and 65% women) villagers now about different laws including family laws, legal services available to them, and human and land rights related issues. Women's capacity and confidence have increased against domestic violence as 441 cases are filed and proceeded by them. Around 1400 youth leaders (of which

30% are indigenous and 50% are girls) are playing a vital role as defenders of human rights and legal service provides to vulnerable communities.

As a result of CSOs' continuous campaign, corruption has taken a central place in the public discourse, as a result of which we can see the inclusion of anti-corruption commitments in electoral manifestos of the major political parties over the last two decades. Emphasis has been given on anti-corruption by the ruling parties. This has been manifested through the declaration of 'Zero Tolerance' by the present government. Moreover, good governance and anti-corruption have been given importance in different state policies and five-year plans.

Legal support

Many CSOs provide legal support for ensuring access to justice especially for the poor, women victims of acid/ domestic violence, marginalized, ethnic/ *adibashi* and *dalit* communities. Such legal support is provided in the forms of mediation, litigation, consultation and advice, and referral.

During January 2016 and 31 December 2018, BLAST settled 6,503 disputes through mediation, out of the 17,863 cases undertaken. Out of the settled disputes, 2,176 pertained to recovery of money, which resulted in the recovery of BDT 12,67,65,045 for women and men who sought remedies against various issues like claims for dower, maintenance, workplace compensation and others. During the same period, BLAST provided a full range of litigation services on civil, criminal and constitutional matters in 34,333 cases in various levels of court, out of which 14,407 were disposed and the rest remain pending. Out of the disposed cases, 5,563 pertained to recovery of money in family related disputes (e.g. maintenance, dower and family property cases) or workers arrears (e.g. salary, benefits and compensation etc.) which resulted in the recovery of a total of BDT 9,51,34,255 for clients who could not otherwise have afforded to pursue their cases in court.

The total number of phone calls and written complaints received by *Bandhu* during 2013 and 2018 are 3,171 and 287 respectively. Among these 13 cases of serious nature have been referred to National Human Rights Commission, and another 17 cases referred to various panel lawyers. As a part of its commitment to address the human rights and social justice of this community, *Bandhu* initiated Bandhu Panel Lawyer in 64 districts with an objective to provide the community members with an easy access to information and assistance on legal issues through them. Now, 205 lawyers are providing pro

bono legal support. In two districts, *Brotee* has provided legal support to 2,669 belonging to *adibashis*.

Through the ALAC program of TIB, 697 number of citizens received services of which 304 complaint resolved positively and 74 issues referred to the Government Organisations and likeminded NGOs for further specific support as of September 2018.

Capacity building

The capacity building of community people and youth has been possible due to different CSO interventions all over the country. Such capacity building interventions are centred on right to information, legal and human rights, labour rights, and different social accountability tools. Such initiatives are targeted to community people especially children, women, youth, and marginalized people. Capacity building of public officials are also provided through training and orientation. For instance, TIB provided training to a section of the ACC officials on research methodology, data collection and analysis, and investigation techniques on anti-corruption.

The British Council, through PRODIGY project has developed the knowledge and skills of more than 800 young people directly and more than 1,300 likeminded youth indirectly to engage the wider community through volunteer activities, including youth club activities, theatre performances, internships with local government, community radio programs and public dialogues, creating platforms and channels to ensure that the wider community has access to government information. Platforms for Dialogue, a European Union funded project in partnership with the Cabinet Division of Bangladesh, is implemented through the British Council in 21 districts across the country. P4D's objective is to promote a more enabling environment for the effective engagement and participation of the citizen and civil society in Government decision making and accountability mechanisms. Similarly Wave Foundation provided youths leadership capabilities through training and workshop, and some 600 youth leaders undertook 40 Social Action Projects following training.[92]

HEKS/EPER Bangladesh has successfully facilitated process to ensure access to get their rights and entitlements from public resources leading by community leaders. As of now around 10,000 (ten thousand) one fourth of the total targeted groups have got public services which includes health advices,

medicine, education support, safety net allowances, latrine and tube-well, employment, infrastructure development.[93]

TIB has different groups of volunteers. Among them the capacity of YES members are developed with regard to utilising RTI Act, running advice and information desks, collect data for research, and do advocacy campaigns using different methods.

Community participation

Many CSOs implement programs for which community participation has increased in monitoring and decision-making of public representatives, public service delivery organisations (health, education, land etc.) through formation of committees/ groups at the grassroots. For instance, under the Social Engagement for Budgetary Accountability (SEBA) program DW is trying to increase budgetary transparency of Union Parishads by ensuring free flow of information in line with Union Parishad Act, 2009, Union Parishad Operations Manual and RTIA, make the Union Parishad representatives more accountable to the people for planning, budgeting and using Union Parishad fund and ensure more inclusive planning and budgeting by Union Parishad through greater participation of cross section of people especially women, poor and marginalized groups. ActionAid's partner Udayankur Seba Sangstha (USS) has a similar activity.

To enhance democratic practices within service delivery organisations (UP, Hospital, Educational Institutions etc.) HEKS/EPER has started practice monitoring of governance performance through using social audit, community score card and open budgeting. In addition to that partners working for *dalit* and *adibashi* has also been working with local-regional and national administration to establish culture of accountability which eventually ensure access of marginalized people into public services.

The public hearing on climate finance issues organized by TIB has made face to face conversation between implementing authority and community leaders and peoples possible, where authority acknowledged the implementation gaps and committed to overcome. More than 80 projects implemented by GO and NGO have been tracked under the Tracking Climate Change Adaptation/ Mitigation Project aiming to assess the quality of fund utilisation at the ground. Tracking report is used to engage with local implementing authority for effective changes in disclosures of information, participation and grievance redress mechanism.

Key lessons learnt

Engaging authorities pays off

It can be observed from many CSOs' experience that most of the authorities are willing to work with the CSOs to achieve Goal 16. Collaborative programs have been evident with various, ministries, departments and institutions. For instance, various ministries and institutions invited TIB to give an in-depth hearing to relevant research findings and discuss way forward. Also engagement with authorities for conducting a study – from the concept formation level to sharing of findings for validation – substantially increased. Local level diagnostic studies followed by advocacy initiatives would influence local authorities to bring about practice level changes. Moreover, private sector players were found cooperative in providing necessary support to TIB research and study based advocacy. Partnerships with the ACC, IC, NHRC, National Legal Aid Services Organisation (NLASO) under Law and Justice Division, Acid Crime Case Monitoring Cell of Ministry of Home Affairs, Asian Centre for Development (ACD) are good examples of such cooperation. Establishing partnership with legal aid organisations and enhancing coordination between partner organisations has been effective to increase reach and impact of referral services for legal assistance. It is necessary to strengthen cooperation of duty bearers during the litigation process to ensure that survivors are well informed, aware of their rights, have willingness to seek legal support and have increased access to justice.

Political environment jeopardizes partnership activities

In few cases it is difficult to influence policy level changes in key institutions of the state e.g. the parliament, judiciary etc. Transition of authority often hampers the ongoing partnership relation. Frequent follow-up requires to make the partners (govt. authority) move forward. Sometimes dealing with government institutions and officials might be difficult to achieve the target/smooth implementation. Possible instability i.e. authority approval or unforeseen schedule clash or venue might remain. High demand and expenditures based proposals for collaborative debate programs often minimizes the scope of joint initiative.

A section of Government officials are reluctant to work with CSOs

A section of government officials is reluctant in working with CSOs. The contribution and attribution of CSOs particularly in achieving Goal 16 are

hardly mentioned or recognised in government's documents. It is more visible when it comes to the issue of corruption, irregularities and mal-governance in the part of public offices. Government's strategy in addressing corruption at present is not to identify the corrupt but rather to give motivation through encouraging good practices and improving service quality by the public officials. According to the government, the data generated by the BBS is dependable and there is no need to engage any NGO.

Dearth of official data

The data gap analysis reveals that there is no government data on corruption and bribery (Target 14.5), institutional effectiveness and accountability (Target 14.6), and fundamental freedom and access to information (Target 14.10) (GED, 2016). Partial information is available on some issues such as all forms of violence and related death rates everywhere (Target 16.1), abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children (Target 16.2), rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all (Target 16.3), money laundering and recovery of stolen assets (Target 16.4), legal identity for all, including birth registration (Target 16.9). The collection, retention and preservation of records are not standardized. This constitutes one of the main challenges to the implementation of the RTI Act. Some NGOs seemed even less prepared than government offices when the question of providing information came under the RTI Act 2009. Information is often disseminated without understanding the needs of the users, or the contexts in which they can access and use the information. Many information systems exist to provide information to the poor that are not demand driven, overlook local knowledge, misunderstand the role of intermediaries and do not monitor usage.

Government's reluctance in corruption data generated by CSOs

The elected governments have so far been suffering from a 'denial syndrome' when it comes to admitting the existence of corruption in different public sectors and institutions, revealed by non-government and international organisations through their surveys and research reports. In general their responses are more political than academic. Instead of taking measures against corrupt practices, a segment of the government always tends to deny such reports, terming the findings as 'false', 'ill-motivated', 'politically biased' and/ or 'part of a

conspiracy'. Moreover, many government officials are still used to a culture of secrecy. It is taking time for them to adapt to a culture of openness ushered in by the RTI Act 2009.

Way forward

The government should consider the following for effective delivery of different government and CSO programs.

Legal reforms recommended by CSOs with regard to limitations existing in different laws pertaining to ensuring human rights, protection of freedom of speech and expression, right to information, right to life and livelihood, and strengthening NIS institutions should be sincerely considered by the government. There should be regular exchange of ideas and opinions before any new law enactment or legal reform, so that it is ensured that the main spirit of the Constitution and international standards are not compromised. The laws containing clauses that are against the spirit of freedom of speech and expression, human rights, and equality before law must be revised, and new laws promoting good governance, transparency, accountability and anti-discrimination should be enacted.

The institutional and financial capacity of NIS institutions should be increased for better performance. Positive and negative incentives must be ensured for the transparency and accountability of public institutions.

The Government should ensure generating data currently not available for the Targets and Indicators under Goal 16. For instance, the BBS should conduct a nation-wide survey to determine the baseline on the state of corruption and bribery, people's satisfaction and trust on NIS institutions. For this the Government should sincerely consider engaging the CSOs in this exercise and utilize their expertise.

The CSOs should develop more partnerships with the government on different issues. These may include capacity building, data generation, service delivery, information dissemination etc. with the aim to achieve different Targets of Goal 16.

The participation of youth volunteers and social workers should be increased from both the government and CSOs. Their capacity should be strengthened to promote good governance, transparency and accountability of different institutions, to act as a driving force against corruption, human rights violation,

violence against women and children, and to promote peace and justice in the social sphere. Content on non-discrimination, gender equality, and sexual and reproductive health and rights, in particular rights to consent, and to choice should be incorporated into school and madrasa curricula and curricula for training of concerned teachers.

Special attention should be given to gender-based violence. The coordination among different public and CSO stakeholders should be increased. All the socialisation media needs to be more proactive role to prevent and respond GBV and ICT based tools could be used to report, respond and referral linkages and need more Gender responsive budgeting. The participation of youth volunteers and social workers in police stations should be ensured who can provide support to those victims of rights violations who are particularly vulnerable, such as persons with disabilities and women and girls who have faced sexual violence. An online complaint recording mechanism (e.g. a dedicated website) must be developed, especially for cases pertaining to violence against women (where social stigma deters complaints). This mechanism must treat the personal information of the complainant with due confidentiality. Relevant actors within law enforcement agencies and medical institutions should receive sensitisation training so that they respond to victims of rights violations with due care and diligence, which includes providing interpretation or accessible information for those with disabilities. Training exercises aimed at creating gender-sensitivity for judges and lawyers must be provided, particularly when they are dealing with victims of sexual violence.

Legal aid and service providers including state (NLASO) and non-state actors (BLAST and BRAC etc.) who are working across the country should work together to create a central database which identifies and measures the reach and operations of legal aid and services.

To ensure sustainable development of *dalits* and *adibashis* who are lagging behind for various reasons need institutional mechanisms. For that, the model of Chittagong Hill Tracts can be followed for creating a separate ministry and or human rights commission. Special allocation should be within the system of social safety net programme so that they can get it easily. Special initiatives should be taken in areas where *dalit* and *adibashi* people are living so that they get affirmative benefits of education.

Conclusion

From the discussion, it is evident that the CSOs are playing an important role along with the government to achieve different Targets of Goal 16. CSOs are playing such roles both as watchdogs and through implementing programs. In some cases they have been successful in keeping the government policy making on the right track, while on the other hand providing direct support through different activities. Most of the CSOs are providing support to the poor and marginalized groups, covering a wide spread of population, and thus contributing in promoting the 'Leave No One Behind' approach of the SDGs. This is time that the government should realize the need of CSOs in achieving the SDGs, particularly Goal 16, and recognize their contribution and attributions.

References and Bibliography

1 For the full list of SDGs, visit http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (accessed on 13 April 2019).

2 http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ (accessed on 13 April 2019).

3 Iftekharuzzaman, 'Towards SDGs: Promoting transparency', *The Daily Star*, 27 February 2017.

4 For details see, UN, 2018, *The Sustainable Development Goals Report 2018*, https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf, and UN Economic and Social Council, 2018, 'Progress towards the Sustainable Development Goals', https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18541SG_SDG_Progress_Report_2018_ECOSOC.pdf (accessed on 15 March 2019).

5 UN, *Peace, Justice, and Strong Institutions: Why They Matter*, https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/01/16-00055p_Why_it_Matters_Goal16_Peace_new_text_Oct26.pdf (accessed on 15 April 2019).

6 See Foundation for Democracy and Sustainable Development, 'UN Sustainable Development Goal (SDG) 16 – importance of participatory institutions & policymaking', http://www.fdsd.org/ideas/sustainable-development-goal-sdg-16-democratic-institutions/ (accessed on 15 April 2019).

7 GED, 2018, *Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018*. Bangladesh Planning Commission. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka, pp. 151-156. http://www.bd.undp.org/content/dam/bangladesh/docs/Publications/Pub-2019/SDGs-Bangladesh_Progress_Report%202018%20(1).pdf (accessed on 15 March 2019).

8 GED, 2018, *Monitoring and Evaluation Framework for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective*. Bangladesh Planning Commission. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka, pp. 109-116; http://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/dc350cdc_4c6d_4a81_b72a_3afe082187ac/Monitoring_and_Evaluation_Framework_of_SDGS_Book_Proof.pdf (accessed on 15 March 2019).

9 Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (2017). *SDG Index and Dashboards Report 2017: Global Responsibilities, International spillovers in achieving the goals*. New York, pp. 96-97; https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf (accessed on 15 March 2019).

10 For details, see TIB, 2017*, Sustainable Development Goal 16: Preparedness, Progress and Challenges of Bangladesh: A Study of Selected Targets*. Dhaka.

11 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14854bangladesh.pdf (accessed on 10 March 2019).

12 The General Economics Division of Planning Commission under Planning Ministry of Bangladesh, http://www.plancomm.gov.bd/ (accessed on 10 March 2019).

13 See GED, 2016, *Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20)*. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka. http://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/19da51a5_b571_4158_beae_efc3e798c1f7/A-Handbook-Mapping-of-Ministries_-targets_-SDG_-7-FYP_2016.pdf (accessed on 13 April 2019).

14 See GED, 2017, *Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective*, Bangladesh Planning Commission. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka. http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2017/01/Final_Data-Gap-Analysis-of-SDGs_Bangladesh-Perspective_23_02_2017.pdf (accessed on 13 May 2017).

15 SDG Tracker, a2i under Prime Minister's Office of Bangladesh, http://a2i.pmo.gov.bd/data-to-policy/sdg-tracker/ (accessed on 13 April 2019).

16 GED, 2016, *op cit*. The Government has developed this action plan for implementation of the SDGs in alignment with the 7th FYP.

17 For details see GED, 2017, *SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective.*

18 GED, 2013, *National Sustainable Development Strategy 2010-21*. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka. http://plancomm.portal.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/7ab46c78_0eaf_4538_8fbf_33ec533e3d07/National-Sustainable-Development-Strategy.pdf (accessed on 13 April 2019).

19 GED, 2018, *Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018*. Bangladesh Planning Commission. Ministry of Planning. Government of Bangladesh. Dhaka, p. 153. http://www.bd.undp.org/content/dam/bangladesh/docs/Publications/Pub-2019/SDGs-Bangladesh_Progress_Report%202018%20(1).pdf (accessed on 15 March 2019).

20 See https://knoema.com/atlas/Bangladesh/Homicide-rate (accessed on 23 May 2019).

21 See https://www.police.gov.bd/en/crime_statistic/year/2018 (accessed on 23 May 2019).

22 Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of Bangladesh (2016). *Report on Violence Against Women Survey 2015*. Dhaka. http://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/bangladesh%20vaw%20survey%202015.pdf?vs=2125 (accessed on 10 March 2019).

23 GED, 2018, *op cit*.

24 The survey was conducted in 2018 under the coalition *Shojag* (Awaken) consisting of five organisations, the Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), the Human Rights and Legal Aid Services (HRLS) Programme of BRAC, Christian Aid, Naripokkho (in the lead), and SNV Netherlands Development Organisation.

25 Amnesty International, 2017, *Amnesty International Report 2016/17*: *The State of the World's Human Rights*. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ENGLISH.PDF (accessed on 10 March 2019); Ain O Salish Kendra (ASK), 2018, *Human Rights Situation of Bangladesh in 2017*. Dhaka. http://www.askbd.org/ask/2018/04/24/hr-situation-

of-bangladesh-in-2017/ (accessed on 13 April 2019).

26 See https://www.askbd.org/ask/category/hr-monitoring/violence-against-women-statistics/ (accessed on 23 May 2019).

27 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index (accessed on 10 March 2019).

28 For details visit https://safearound.com/danger-rankings/country-danger-ranking/ (accessed on 10 March 2019).

29 ASK, 2018, *op cit*.

30 GED, 2018, *op cit*. p. 153.

31 World Vision Bangladesh. (2018). *Integrated WVB National Baseline Report*. Dhaka, https://www.wvi.org/sites/default/files/WVB%20Baseline%20Survey%20Report%20v1.pdf (accessed on 16 April 2019).

32 GED, 2018, *op cit*.

33 World Justice Project, WJP Rule of Law Index; https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2017-2018_Bangladesh_eng.pdf (accessed on 10 March 2019).

34 UKAid, UNDP, Government of Bangladesh, 2015, *Access to Justice in Bangladesh Situation Analysis Summary Report 2015*. Dhaka. http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/library/democratic_governance/access-to-justice-in-bangladesh-situation-analysis.html (accessed on 10 March 2019).

35 GED, 2018, *op cit*. p. 154.

36 *Ibid*.

37 The laws and rules include the 'Money Laundering Prevention Act, 2012' (amended in 2015), the 'Money Laundering Prevention Rules, 2013', and 'Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Circulars/Guidelines' for different entities.

38 The institutional framework includes the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), the Anti-corruption Commission (ACC), the Bangladesh Police (Special Branch and Criminal Investigation Department), National Board of Revenue (Tax and Customs), the Attorney General's Office. Moreover, the National Coordination Committee (NCC) for preventing money laundering and combating financing of terrorism (16 members with the Finance Minister as Convener), a Working Committee comprising 23 relevant agencies, and a National Taskforce on Stolen Asset Recovery have also been formed.

39 TIB, 2017, *Sustainable Development Goal 16: Preparedness, Progress and Challenges of Bangladesh: A Study of Selected Targets*. Dhaka.

40 Global Financial Integrity (GFI), 2019, *Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015*. pp. VII-VIII and 29. https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2019/01/GFI-2019-IFF-Update-Report-1.29.18.pdf (accessed on 26 February 2019).

41 *The Daily Star,* 28 June 2018 https://www.thedailystar.net/business/bangladeshis-swiss-banks-deposits-drop-taka-4064-crore-1596886 (accessed on 26 February 2019).

42 See https://en.wikipedia.org/wiki/Paradise_Papers (accessed on 15 March 2019).

43 *The New Nation,* 26 February 2019 http://m.thedailynewnation.com/news/167572/3746-bd-natls-invested-in-malaysias-second-home-scheme (accessed on 26 February 2019).

44 *The Daily Star,* 2 February 2019, https://www.thedailystar.net/business/news/bb-files-case-ny-court-over-cyber-heist-1696027 (accessed on 26 February 2019).

45 *The Daily Star,* 11 January 2019 https://www.thedailystar.net/business/banking/news/philippine-court-jails-ex-bank-manager-over-bb-cyber-heist-1685536 (accessed on 26 February 2019).

46 In the Vision 2021 it has been asserted that "the Government is determined to confront and

root out the scourge of corruption from the body politic of Bangladesh … (and) intends to strengthen transparency and accountability of all government institutions as integral part of a programme of social change to curb corruption." See Planning Commission of Bangladesh, *Perspective Plan 2010-21*, http://www.plancomm.gov.bd/perspective-plan/ (accessed on 13 February 2019).

47 "Promoting good governance and curbing corruption" is listed high among 12 development goals identified by the 7FYP, which also commits to strengthen the democratic governance process to ensure participation of all citizens and sound functioning of all democratic institutions. See Planning Commission of Bangladesh, *7th Five Year Plan: FY 2016 – FY 2020*, http://www.plancomm.gov.bd/wp-content/uploads/2015/10/7th_FYP_18_02_2016.pdf (accessed on 13 February 2019).

48 Major laws and rules applicable for combating corruption include the 'Penal Code, 1860', the 'Code of Criminal Procedure Act, 1898', 'The Anti-Corruption Act, 1947', 'The Foreign Exchange Regulation Act, 1947', 'The Anti-corruption Commission Act, 2004' and 'The Anti-corruption Commission Rules, 2007', 'The Government Servant (Conduct) Rules, 1979', 'The Public-Interest Information Disclosure Act (Provide Protection), 2011', and the 'Crime Related Mutual Legal Assistance Ordinance, 2012'. Moreover, GOB has five policies that support transparency and accountability. These include RTI policy, National Integrity Strategy, Citizen's Charters and Grievance Redress System.

49 The major anti-corruption institutions in Bangladesh comprise the ACC, the Office of the Comptroller and Auditor General (OCAG), BFIU of Bangladesh Bank as the anti-money laundering department, the Judiciary, law enforcing agencies, and the Parliamentary Standing Committees.

50 For details see http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/publications/5ab9615e_241a_4c7b_869b_048ce6212195/BestpracticesCopy.pdf (14 March 2019).

51 For details see http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notification_circular/dcd10ed2_ed24_438b_9998_4ba8ee486b62/Award_GO.pdf (14 March 2019). This award was first given during 2017-2018 for officials from both the field and central levels.

52 For details see http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.portal.gov.bd/notification_circular/86f0b16f_bd42_4f28_af42_dec5a6dede98/Expert%20Pool0001.pdf (14 March 2019).

53 On 23 July 2016, 30 officials were awarded for the first time, while 26 officials in 2017, and 39 officials and three institutions were awarded in 2018.

54 TIB, 2019, *Tracking the Eleventh National Parliament Election Process*. Dhaka.

55 TIB, 2018, *Corruption in Service Sectors: National Household Survey 2017*. Dhaka. https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2018/report/nhs/NHS_2017_Ex_Sum_EN.pdf (accessed on 11 March 2019).

56 Bangladesh was earlier placed at the bottom of the list for five successive years from 2001-2005. The score of Bangladesh has been somewhat static around 24-27 over the period 2011-18. For details, see Iftekharuzzaman, 'Bangladesh descends in corruption ranking: Zero tolerance – what next?', *The Daily Star*, 30 January 2019. https://www.thedailystar.net/opinion/governance/news/bangladesh-descends-corruption-ranking-1694551 (accessed on 11 March 2019).

57 It is a Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank). See World Bank, *The Worldwide Governance Indicators, 2018 Update*, info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx?fileName=wgidataset.xlsx (accessed on 11 March 2019).

58 Bank Group, 2013, *Enterprise Surveys Bangladesh*. New York. https://www.enterprisesurveys.

org/data/exploreeconomies/2013/bangladesh (accessed on 11 March 2019).

59 World Economic Forum, 2018, *The Global Competitiveness Report 2018*. New York. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/#series=TRANSPARENCYCPI (accessed on 11 March 2019).

60 ACC, 2018, *Annual Report 2017*. Dhaka.

61 For details see TIB, 2017, *op. cit.*, pp 28-29.

62 For details see *ibid*.

63 Compiled and analysed from data collected from websites of the Ministry of Finance, National Human Rights Commission, https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/e9e8a8c8_8a8b_4536_a18b_fc5ca696650a/St_2_en.pdf, https://mof.gov.bd/site/page/f9aab5cd-f644-47bb-bb94-a70cb64c15ce, http://nhrc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/nhrc.portal.gov.bd/page/cb8edec9_5aee_4b04_bf2a_229d9cd226a0/Bangla%20Annual%20Report%20Ok%202017.pdf, http://infocom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/infocom.portal.gov.bd/annual_reports/fe587ac3_3cd6_43f1_ad66_e6859e5db502/Annual%20Report%202017.pdf (accessed on 13 March 2019).

64 See for details, TIB, 2017, *Subordinate Court System of Bangladesh: Governance Challenges and Ways Forward*. Dhaka. https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2017/lower_judiciary/Executive_Summery_English_Judiciary_30112017.pdf (accessed on 12 March 2019).

65 *Dhaka Tribune*, 'Judges' service rules gazette published, lower courts still in president's hands', 12 December 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/law-rights/2017/12/11/gazette-lower-court-judges-service-rules/ (accessed on 12 March 2019).

66 *UNB*, 'Govt. issues gazette abolishing quota in 1st and 2nd class govt. jobs', 4 October 2018, http://www.unb.com.bd/category/bangladesh/govt-issues-gazette-abolishing-quota-in-1st-and-2nd-class-govt-jobs/3549 (accessed on 12 March 2019).

67 For details see TIB, 2017, *op. cit.*, pp 28-29.

68 For details see TIB, 2019, *op cit*.

69 *Daily Prothom Alo*, 10 March 2019.

70 *The Daily Star*, 'National polls under international spotlight', 31 December 2018, https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/bangladesh-election-2018-under-global-spotlight-1681045 (accessed on 12 March 2019). Moreover, Rajshahi, Sylhet, Gazipur, and Barisal city corporation elections were held in 2018. Showdown outside the polling stations, ballot stuffing, casting fake votes was common scenario of city corporation elections.

71 World Economic Forum, 2018, *The Global Gender Gap Report 2018*. p. 21. New York. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf (accessed on 12 March 2019).

72 *Daily Prothom Alo*, 19 November 2015.

73 Ministry of Public Administration, Statistics of Civil and Staff, 2017.

74 *Daily Prothom Alo*, 10 March 2017.

75 BBS and UNICEF, 2014, *Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013, Progotir Pathey: Final Report,* Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF Bangladesh, Dhaka, cited in GED, 2019, *Bangladesh SDGs Progress Report 2018*, Planning Commission of Bangladesh.

76 Among them, UDHR (Human Rights), ICCPR (Civil and Political Rights), CRC (Child Rights), CEDAW (Elimination of Discrimination Against Women), UNCRMW (Rights of Migrant Workers), ILO Conventions (Labour Rights) are notable.

77 Freedom House, 2019, *Freedom in the World 2019*. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/bangladesh (accessed on 13 April 2019).

78 Reporters without Borders, 2019, *World Press Freedom Index 2018*. https://rsf.org/en/

bangladesh (accessed on 17 March 2019).

79 Centre for Law and Democracy, 2018, *Global Right to Information Rating 2017*. https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Bangladesh (accessed on 17 March 2019).

80 Information Commission, 2017, *Annual Report 2016*. Dhaka. http://infocom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/infocom.portal.gov.bd/annual_reports/824de0b6_5588_4754_a1c7_bea9f53eb81f/IC%20Annual%20Report%202016%20(1).pdf (accessed on 17 March 2019).

81 ASK, 2018, *National Human Rights Commission, Bangladesh Existing Challenges and Expectations of Civil Society*. Dhaka.

82 Amnesty International, 2018, *op cit*.

83 ASK, 2018, *op cit*.

84 Human Rights Watch, 2019, *World Report 2019, Bangladesh events 2018*. New York. https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/bangladesh#f6277a (accessed on 13 March 2019).

85 Amnesty International, 2018, *Amnesty International Report 2017/18, The State of the World's Human Rights*. https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF (accessed on 10 March 2019).

86 *The Daily Star,* 'Banking Sector: TIB worried at proposal for reporting law', 3 April 2018.

87 GED, 2018, *op cit*. pp. 155.

88 Known as the Committee of Concerned Citizens (CCC), Youth Engagement and Support (YES), *Shwachhatar Jonno Nagorik* (Swajan) and YES Friends.

89 Satellite AI-Desk is a useful tool to provide relevant information and advice to citizens including women, poor and marginalized at their doorsteps, which contributes to raise voice against corruption and irregularities. In the ongoing project phase of TIB, approximate 74,000 people including poor and marginalized received service related and other required information and advice from AI-Desk.

90 The government stopped the activities of the coaching centers ahead of the SSC examinations on 1 February 2018 and closed these coaching until the exams end. The examinees were instructed to enter their respective exam halls at least 30 minutes before the exams begin. Students and teachers were not allowed to carry smartphones inside the exam centers. It was also instructed to arrest anyone carrying a mobile phone within 200 meters of the centers during the exam.

91 These include introduction of an online mechanism for submitting complaints and feedback about health services, display of service-related information at the hospitals through hanging of citizen's charter, notice board, information board etc., introduction of biometric machines for ensuring the presence of doctors and 'Hello Doctor' program to monitor doctors' presence in hospitals through surprise phone calls twice a month by Ministry officials, written instructions in health institutions to stop harassment of brokers, introduction of online licensing application and renewal processes for private healthcare institutions, and formation of different inspection committees for different levels down to Upazila level.

92 Wave Foundation, *Annual Report 2016-17*, https://wavefoundationbd.org/wp-content/uploads/2018/10/annual-repport-15-16_wave.pdf (accessed on 11 March 2019).

93 HEKS/EPER project database.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেবা ও অধিকার

ঢাকা ওয়াসা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. শাহ্নূর রহমান ও মো. শহিদুল ইসলাম

ভূমিকা

বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা একটি মৌল মানবাধিকার।[১] পানি মানুষের বেঁচে থাকা, গৃহস্থালি থেকে শুরু করে কলকারখানায় উৎপাদন ও টেকসই পরিবেশের জন্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করে। সুপেয়, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানির অধিকারকে সর্বাধিকার হিসেবে বিবেচনার নির্দেশনা রয়েছে।[২] জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬[৩] ও বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।[৪] মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি পানি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে জড়িত। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সর্বস্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পানি খাতে শুদ্ধাচারের তিনটি মূল স্তম্ভ। এসব স্তম্ভ কতগুলো মূলনীতি, যেমন সততা, সমতা ও টেকসই কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল।[৫]

ঢাকা মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ জনসেবার দায়িত্ব নিয়ে ১৯৬৩ সালে দি ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্সের (XIX) অধীনে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) যাত্রা শুরু করে। ১৯৯০ সালে নারায়ণগঞ্জ শহরের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের দায়িত্বও ঢাকা ওয়াসাকে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে ‘পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬’ অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসাকে একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরী ও নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রায় ৩৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় চার ধরনের (আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক ও বস্তি এলাকা) সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৬] পানির উৎস হিসেবে ঢাকা ওয়াসা ৭৮ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ ও ২২ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ উৎসের ওপর নির্ভরশীল।

ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার[৭] কারণে অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি নিরাপদ পানি সরবরাহ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানি ও পয়ঃসেবার চাহিদা মেটাতে নানাবিধ সমস্যা ও

* ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা[৮], সংবাদমাধ্যম ও গণশুনানিতে[৯] ঢাকা মহানগরীর বিশুদ্ধ পানির সংকট, পয়ঃনিষ্কাশনে অব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতাসহ ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে এসেছে। টিআইবির অগ্রাধিকার খাতগুলোর মধ্যে পানি খাত অন্যতম। টিআইবি বিভিন্ন সময়ে পানি খাত সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা (২০০৭), ঢাকা ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওপর পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচারবিষয়ক বেইজলাইন (২০১৪), খুলনার ময়ূর নদী ও সংযোগ খাল রক্ষা (২০১৫), টেক্সটাইল শিল্প খাতে বর্জ্যপানি শোধনাগারের ব্যবহার ও কার্যকারিতা (২০১৭) অন্যতম। পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচারবিষয়ক বেইজলাইন (২০১৪) গবেষণায় পানি খাতে সুশাসনের অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে ঢাকা ওয়াসার সুশাসন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার চাহিদা তৈরি হয়। এই ধারাবাহিকতায় টিআইবি 'ঢাকা ওয়াসা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। এ গবেষণাটি ঢাকা ওয়াসাকে অধিকতর সেবাধর্মী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা ওয়াসার সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- ঢাকা ওয়াসাসংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন পর্যালোচনা করা;
- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসেবা নিশ্চিত করতে ঢাকা ওয়াসার প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং
- ঢাকা ওয়াসার সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির মাত্রা নিরূপণ করা।

গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

ঢাকা ওয়াসার আওতাভুক্ত ১১টি মডস (Maintenance, Operation, Distribution and Service-MODS) জোনের মধ্যে ১০টি মডস জোনের (নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত) আওতাধীন আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ('লো ইনকাম কমিউনিটি' বা এলআইসি) বা বস্তি এলাকার পানি ও পয়ঃসংযোগ এ গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ও ড্রেনেজব্যবস্থা, শহরের অভ্যন্তরীণ জলাবদ্ধতা নিরসনের প্রক্রিয়া এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রধান অংশীজন হিসেবে ঢাকা সিটি করপোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণাটি এপ্রিল ২০১৮ হতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। সেবাগ্রহীতাদের ওপর জরিপ কার্যক্রমটি ১ থেকে ১৪ আগস্ট ২০১৮ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্যের বিবেচ্য সময়সীমা ছিল ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র (গুণবাচক ও পরিমাণবাচক) পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সেবাগ্রহীতা জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারী (প্রধান কার্যালয় ও মডস জোন); ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী; প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা; পানি বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, সাংবাদিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়ক উল্লেখযোগ্য। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে পানি ও পয়ঃসেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সেবাগ্রহীতা জরিপের প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিতে পরিসংখ্যানবিজ্ঞানে ব্যবহৃত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আবাসিক ও বাণিজ্যিক সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রে বহুস্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণে আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগের নমুনা ছিল ২ হাজার ২৫৬টি, যার মধ্যে আবাসিক সংযোগ ১ হাজার ৬৮০ এবং বাণিজ্যিক সংযোগ ৫৭৬। আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগে জরিপ পরিচালনায় নির্বাচিত ১০টি জোনের আওতাধীন ২৮৪টি এলাকা থেকে যথাক্রমে ৭০ ও ৭২টি এলাকা আনুপাতিক হারে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। আবাসিকের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিটি এলাকাকে ৭২টি সংযোগসংবলিত একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়। এরপর দৈবচয়নের ভিত্তিতে একটি গুচ্ছ নির্বাচন করে ওই গুচ্ছ হতে প্রতি ৩টি সংযোগ পরপর ২৪ জন সংযোগ গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিটি এলাকার গ্রাহক সংযোগ তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৮ জন সংযোগ গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। শিল্প সংযোগ আছে এমন ৯টি মডস জোনের মোট ৩৪৬টি সংযোগ থেকে আনুপাতিক হারে মোট ৭২ জন সংযোগ গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। অপরদিকে এলআইসি বা বস্তি এলাকায় ওয়াসার সংযোগ রয়েছে এমন ১৩টি বস্তি থেকে দৈবচয়িতভাবে ৭টি বস্তি বাছাই করে মোট সংযোগ সংখ্যার আনুপাতিক হারে ৫০০ জন সংযোগ গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। এভাবে জরিপের জন্য মোট ২ হাজার ৮২৮ জন সংযোগ গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। জরিপকালে উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি ও অনুপস্থিতির কারণে ৬০ জন উত্তরদাতাকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ ২ হাজার ৭৬৮ জন সংযোগ গ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এটি একটি জটিল জরিপ বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে সংযোগ গ্রহণকারীর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য ভর (Weight) ব্যবহার করা হয়।[১০] বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত বিভিন্ন সূচক ও চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ঢাকা ওয়াসার সুশাসন বিশ্লেষণে কয়েকটি নির্দেশক যেমন সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, জন-অংশগ্রহণ, ন্যায্যতা, কার্যকারিতা, আইনের প্রতিপালন ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

আইনি সীমাবদ্ধতা

ঢাকা ওয়াসাসংশ্লিষ্ট আইনে[১১] কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপদেষ্টা) সুনির্দিষ্ট শর্তের (নিয়োগ-প্রক্রিয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি) অনুপস্থিতি[১২], চুক্তিভিত্তিক ও খণ্ডকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলার দায়বদ্ধতা উল্লেখ না থাকা[১৩], পানির মূল্য নির্ধারণের আগে সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণ করার নির্দেশনা না থাকা এবং পানির মূল্য নির্ধারণে প্রোগ্রেসিভ ট্যারিফ বিষয়ে উল্লেখ না থাকা[১৪] উল্লেখযোগ্য। আইনে উল্লিখিত বিষয়গুলোর অনুপস্থিতির কারণে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলার দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে শিথিলতা তৈরির সুযোগ, পানির নির্ধারিত মূল্য সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহনীয় কি না, সে বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ার ঝুঁকি এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানির মূল্য নির্ধারণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

জনবলের ঘাটতি : ঢাকা ওয়াসার সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান। ঢাকা ওয়াসার মোট ৪ হাজার ৬৬৭টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩ হাজার ২৪৯ জন কর্মরত আছেন[১৫] অর্থাৎ সার্বিকভাবে ৩১ শতাংশ পদ খালি রয়েছে। পদের শ্রেণি অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে শূন্যপদের সংখ্যা বেশি যা যথাক্রমে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। ২০১৬ সাল থেকে তিনটি উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গবেষণা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং অর্থ) শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা ওয়াসার একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৬টি পদ শূন্য রয়েছে। আবার নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী বা বস্তির জন্য জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিটি প্রোগ্রাম ও কনজ্যুমার রিলেশন বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল রয়েছে। বিভিন্ন মডস জোনভিত্তিক ৮০৬টি সচল পাম্প পরিচালনায় যেখানে প্রায় ২ হাজার ৪০০ পাম্প অপারেটর প্রয়োজন, সেখানে বিদ্যমান সংখ্যা ৪৫২ জন।[১৬] এ পদে জনবল ঘাটতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষে পাম্প অপারেটরদের একাংশের দৈনিক ২২ ঘণ্টা কাজ করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার রাজস্ব পরিদর্শকের ৩১০টি পদের বিপরীতে ১৪০টি পদ শূন্য রয়েছে। উভয় পদে জনবল ঘাটতির কারণে নিয়মবহির্ভূতভাবে সহযোগী ('ডুবলি')[১৭] নিয়োগ করার একটি চর্চা বিদ্যমান।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস ঘাটতি : কেন্দ্রীয় অফিসসহ মডস অফিসগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকস ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। মডস জোনগুলোতে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও তদারকিমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম যানবাহন রয়েছে। এ ছাড়া জরুরি পানি সরবরাহ সেবায় প্রয়োজনীয় যানবাহনের ঘাটতি রয়েছে। এ সেবা প্রদানে প্রতিটি মডস জোনে কমপক্ষে ৬টি করে গাড়ির প্রয়োজন হলেও বর্তমানে মডস জোনপ্রতি ৩টি গাড়ি আছে। উল্লেখ্য ১১টি মডস জোনে সচল গাড়ির সংখ্যা ৩৩টি।[১৮]

তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি : তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঢাকা ওয়াসার মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এবং ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইট। এ ক্ষেত্রে উভয় মাধ্যমেই তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি ও দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য, যেমন মডস জোনভিত্তিক জনবল, গ্রাহক তালিকা, আওতাভুক্ত এলাকা, বিভিন্ন পাম্পে পানির উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্রীয় ও সমন্বিতভাবে নেই। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য, যেমন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব ও নিয়মিত প্রকাশ করা হয় না। ওয়েবসাইটে সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ২০১৫-১৬ সালের। এ ছাড়া ওয়েবসাইটে অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ না করা, দুদকের হটলাইন নম্বর না দেওয়া এবং জাতীয় ই-তথ্যকোষ, এমআইএস, সামাজিক মাধ্যমসহ (ফেসবুক পেজ) কিছু লিংক দেওয়া থাকলেও তা কার্যকর নেই। অপরদিকে ওয়েবসাইটে গ্রাহক সেবাসংক্রান্ত তথ্য, যেমন পানির সংযোগ গ্রহণ, সংযোগ স্থানান্তর, সংযোগের আকার বৃদ্ধি, অস্থায়ী সংযোগ নেওয়া বা বন্ধ করা ইত্যাদি সেবাগ্রহীতার কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়নি।[১৯]

ওয়াসা কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যের প্রকৃত হিসাবে ঘাটতি : ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য, যেমন ঢাকা মহানগরীর মোট পানির চাহিদা, পয়ঃসেবার আওতাভুক্ত এলাকা, প্রতিটি পাম্পের আওতাধীন এলাকা এবং পরিচালন আয় ব্যয়ের অনুপাতের প্রকৃত হিসাবে অসামঞ্জস্য ও ঘাটতি দেখা গেছে। ঢাকা ওয়াসার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মহাগরীতে দৈনিক পানির চাহিদা ২৩০ কোটি লিটার কিন্তু মহানগরীর বর্তমান জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে তাদের ন্যূনতম পানির চাহিদা হিসাব করলে শুধু আবাসিক ব্যবহারেই প্রতিদিন পানির চাহিদা দাঁড়ায় প্রায় ২৫৮ কোটি লিটারে। আবার ১৯৯০ সাল থেকে ঢাকা ওয়াসার পয়ঃসেবার আওতাভুক্ত এলাকা ২০ শতাংশ দাবি করে আসছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পয়ঃসেবার আওতাভুক্ত এলাকার প্রকৃত হিসাব নেই। ১৯৯০ সাল-পরবর্তী ঢাকা মহানগরীর আওতা বাড়লেও নতুন কোনো পয়ঃনিষ্কাশন লাইন তৈরি করা হয়নি। অপরদিকে ডিস্ট্রিক্ট মিটারড এরিয়া (ডিএমএ) ছাড়া অন্যান্য এলাকায় একটি পাম্পের উৎপাদিত পানি কতটুকু এলাকায় সরবরাহ করা হয় তার সুনির্দিষ্ট হিসাব ঢাকা ওয়াসার কাছে নেই।

প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি : ঢাকা ওয়াসায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। ২০১৩ সাল থেকে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তা পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে শেষ হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা-যশলদিয়া পানি শোধনাগার প্রকল্পটি ২০১৩ সালে শুরু হয়ে

২০১৬ সালে শেষ হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনো চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটির দুই দফা মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। অন্যদিকে, সায়েদাবাদ (ফেজ-৩) পানি শোধনাগারের কাজ ২০১৫ সালে শুরু হয়ে ২০২০ সালে শেষ হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ২০১৮ পর্যন্ত মাত্র ২ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে।[২০] আবার তেঁতুলঝড়া-ভাকুর্তা ওয়েলফিল্ডের কাজ ২০১২ সালে শুরু হয়ে ২০১৬ সালে শেষ হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনো চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ২০১৩ সালে শুরু হওয়া গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার প্রকল্পের কাজ ২০২২ সালে শেষ হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও মাত্র ২০ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে।[২১] প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণ হিসেবে প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতার ঘাটতি, তদারকির ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়।

সিস্টেম লস কমানোর সক্ষমতায় ঘাটতি : অভ্যন্তরীণ দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির ঘাটতির ফলে ঢাকা ওয়াসায় সিস্টেম লস বিদ্যমান। সিস্টেম লসের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে যোগসাজশে বিল করা, পানি চুরি করে বিক্রি করা, ঢাকা ওয়াসার কর্মী কর্তৃক সরবরাহ লাইন থেকে অবৈধ লাইন দেওয়া, সরবরাহ লাইনের লিকেজ, পাম্পের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি। সিস্টেম লসের কারণে পানির উৎপাদনের বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার তথ্য অনুযায়ী বর্তমান সিস্টেম লস ২২ শতাংশ।[২২]

জন-অংশগ্রহণে ঘাটতি ও গণশুনানিতে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান না হওয়া : ঢাকা ওয়াসার পানির মূল্য নির্ধারণে গ্রাহকদের মতামত গ্রহণ এবং সেবাসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে জন-অংশগ্রহণের ঘাটতি রয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ঢাকা ওয়াসার মডস জোন ৪ ও ১০ এলাকার সেবাগ্রহীতাদের নিয়ে গণশুনানির আায়োজন করে। পরবর্তী সময়ে ৬ মে ২০১৮ তারিখে একটি ফলোআপ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগগুলোর মধ্যে নিয়মিত পানি না পাওয়া, পানিতে দুর্গন্ধ, বকেয়া বিল পরিশোধে ঘুষের দাবি ও ভুতুড়ে বিল উল্লেখযোগ্য। গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব অভিযোগের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান না দেওয়ায় একই অভিযোগ উভয় শুনানিতেই বারবার এসেছে।

দুর্বল তদারকি ব্যবস্থা : ঢাকা ওয়াসার মাঠপর্যায়ে কর্মরত রাজস্ব পরিদর্শক ও পাম্প অপারেটরদের দৈনন্দিন কাজের তদারকির ঘাটতি বিদ্যমান। নিয়মিত তদারকির অভাবে এসব পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়, যেমন মিটার না দেখে বিল করা, অতিরিক্ত বিল করা, যোগসাজশে বিল করা, স্টেশনে পাম্প অপারেটরদের অনুপস্থিত থাকা, নিয়মবহির্ভূতভাবে 'ডুবলি' নিয়োগ ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ জবাবদিহির ক্ষেত্রে ওয়াসা বোর্ডের কার্যকারিতায় ঘাটতি : ঢাকা ওয়াসা বোর্ডকে নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগসহ ব্যবস্থাপনার জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বোর্ড তার ক্ষমতা স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে না পারার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক

প্রভাব, মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বোর্ডের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা ইত্যাদি বিদ্যমান। ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম তদারকিতে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ভূমিকা অনেকটাই আলঙ্কারিক। ফলে বোর্ডের ভূমিকা শুধু বিভিন্ন কাজের অনুমোদন দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (সিটি করপোরেশন) সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি : ড্রেনেজ লাইন, স্যুয়ারেজ লাইন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তা কাটার অনুমতি ইত্যাদি বিষয়ে ঢাকা ওয়াসাকে ঢাকা সিটি করপোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) সাথে সমন্বয় করতে হয়।[২৩] প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, মোট ড্রেনেজ লাইনের প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার ওয়াসার অধীনে এবং সিটি করপোরেশনের অধীনে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। 'ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা-২০০৫' অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব ঢাকা ওয়াসার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।[২৪] তবে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসার সাথে সিটি করপোরেশনের সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হলো : সিটি করপোরেশন কর্তৃক রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ওয়াসার সাথে সমন্বয় না করা, ড্রেনের ক্ষতি হলে সে বিষয়ে ঢাকা ওয়াসাকে অবগত না করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা কাজে রাস্তা কাটার ক্ষেত্রে যথাসময়ে সিটি করপোরেশনের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ার অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে ঢাকা ওয়াসার একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আইন অনুযায়ী ড্রেনগুলো ঢাকা ওয়াসার। কিন্তু সিটি করপোরেশন ইচ্ছামতো যত্রতত্র ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার কাজ করে। আমরা সিটি করপোরেশনকে বারবার চিঠি পাঠাই, নিষেধ করি। কিন্তু তারা শোনে না।' ওয়াসার কাছ থেকে অনুমতির বিষয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনের একজন কর্মকর্তার বক্তব্য, 'রাস্তাঘাট সিটি করপোরেশনের অধীনে, ওয়াসার কাছ থেকে অনুমতি নেব কেন?'

এ ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ড্রেন ও খালে পতিত বর্জ্য নিয়মিত পরিষ্কারের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার এবং গৃহস্থালির কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের। এ ক্ষেত্রে ড্রেন বা খালে পতিত কঠিন বর্জ্য পরিষ্কারের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা ও সিটি করপোরেশনের মধ্যে দায়িত্ব এড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন কঠিন বা ভারী বর্জ্য ড্রেনের উপরিভাগ বা খালের মুখে জমে বৃষ্টির পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

পানিসেবায় সক্ষমতা ও কার্যকারিতা

টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি : ঢাকা ওয়াসায় টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ভূপরিস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির অনুপাত ৭০:৩০ করার লক্ষ্য থাকলেও বর্তমান অনুপাত ২২:৭৮। বৃষ্টির পানি ধারণসহ ভূউপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির পরিবর্তে অপরিকল্পিতভাবে ভূউগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য পাম্প স্থাপনের চর্চা চলমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে গত ১০ বছরে পাম্পের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে-২০০৯ সালে পাম্প ছিল ৪৮২টি[২৫] এবং ২০১৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৯০০টিতে।[২৬] অন্যদিকে, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর প্রতিবছর ২ থেকে ৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। এ ছাড়া অধিক মাত্রায় পানি উত্তোলনের ফলে ঢাকার আশপাশের এলাকার পানি ধারক স্তর (অ্যাকুইফার) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহে ঘাটতি : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ঢাকা ওয়াসার চার ধরনের সংযোগের মধ্যে শুধু আবাসিক ব্যবহারে প্রতিদিন ন্যূনতম পানির চাহিদা ২৫৮ কোটি লিটার হলেও ঢাকা ওয়াসার দাবি অনুযায়ী উৎপাদন সক্ষমতা ২৪০ কোটি লিটার।[২৭] ঢাকা ওয়াসার একজন কর্মকর্তার মতে, 'যেহেতু সেবাগ্রহীতাদের পক্ষ থেকে পানির অভাব সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ ওঠে না, তাই ধারণা করা যেতে পারে চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।' এই গবেষণায় গ্রাহক জরিপ অনুযায়ী সার্বিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ চাহিদা অনুযায়ী পানি পান না। সংযোগের ধরনভেদে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পানি না পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি বস্তি এলাকায়, যা ৭১ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে আবাসিকের ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ, বাণিজ্যিকের ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শিল্পের ১৯ দশসিক শূন্য শতাংশ সেবাগ্রহীতা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পানি পান না।

সারণি ১ : সংযোগের ধরনভেদে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পানি না পাওয়ার হার

সংযোগের ধরন	চাহিদা অনুযায়ী পানি না পাওয়ার হার
বস্তি	৭১.৯%
আবাসিক	৪৫.৮%
বাণিজ্যিক	৩৪.৯%
শিল্প	১৯.০%

জরিপের আওতাভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে পানিসংকটপূর্ণ এলাকা হচ্ছে সূত্রাপুর, জুরাইন, মতিঝিল, কদমতলী, চকবাজার, হাজারীবাগ, ইসলামবাগ, নবাবপুর, সিদ্দিকবাজার, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, বড়বাগ, বাগবাড়ি, আহমেদ নগর, শেওড়াপাড়া, ফার্মগেট, রসুলবাগ, মাদারটেক, নন্দীপাড়া, মোহাম্মদবাগ, পলাশপুর, মুরাদপুর, জগন্নাথপুর, উত্তরা-৬, ইব্রাহিমপুর, কচুক্ষেত, মানিকদি, মিরপুর ১১, নাখালপাড়া, পলাশনগর, ভাসানটেক ও বস্তি এলাকা। সরবরাহ লাইনে পানির চাপ না থাকায় আবাসিক সংযোগে সেবাগ্রহীতাদের ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশ ওয়াসার লাইন বা সংযোগ থেকে মোটর দিয়ে পানি টানতে হয় বলে সেবাগ্রহীতারা উল্লেখ করেছেন। ঋতুভেদে পানি সরবরাহে ঘাটতির ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের সর্বাধিক ৯৪ দশমিক শূন্য শতাংশ শুধু গ্রীষ্মকালের কথা বলেছেন। এ ছাড়া ২০ দশমিক ৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতা সারা বছরই পানির ঘাটতি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করেছেন।

পানি সরবরাহ ও বিলিং ব্যবস্থায় ন্যায্যতার ঘাটতি : ঢাকা ওয়াসা আইনে পানির মূল্য নির্ধারণে ন্যায্যতার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও তা প্রতিপালিত হয়নি। আইনে বলা হয়েছে, 'কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী বা বস্তির পানির অভিকর আবাসিক বা সামাজিক অভিকরের কম হারে নির্ধারণ করতে পারবে।[২৮] কিন্তু নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে আবাসিক হারের সমহারে পানির মূল্য পরিশোধ করতে হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, পানির ব্যবহারের ওপর এবং এলাকাভেদে দামের তারতম্য থাকা উচিত। তাদের মতে, পানির ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে শুল্ক নির্ধারণ করা

হলে পানির অপচয়রোধ সম্ভব হবে। এ ছাড়া বাস্তবক্ষেত্রে সেবাসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও জরুরি ভিত্তিতে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু বস্তি এলাকায় (কড়াইল, কালশী) সেবাগ্রহীতাদের একাংশের কাছ থেকে সংযোগ খরচ নেওয়া সত্ত্বেও কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। আবার সেবাগ্রহীতাদের একাংশের সরবরাহ লাইনের কাজ সমাপ্ত হলেও পানি সরবরাহ করা হয়নি। ঢাকা ওয়াসার পানির শুল্ক নির্ধারণে ভোক্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। অথচ দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গণশুনানির মাধ্যমে শুল্ক নির্ধারণ করার উদাহরণ আছে।

পানির মান : ঢাকা ওয়াসার পানির গুণগত মানের ক্ষেত্রে পানির গন্ধ ও বর্ণকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সরবরাহকৃত পানির বর্ণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ পরিষ্কার ও ৫১ দশমিক ৫ শতাংশ অপরিষ্কার বলে উল্লেখ করেছেন। আবার গন্ধের ক্ষেত্রে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ গন্ধহীন ও ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্গন্ধযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পানির গুণগত মান সারা বছরই খারাপ থাকে বলেছেন সেবাগ্রহীতাদের ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ। আবার সেবাগ্রহীতাদের ৬২ দশমিক ১ শতাংশ শুধু গ্রীষ্মকালে, ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ শুধু বর্ষাকালে এবং ৭ দশমিক ৫ শতাংশ শুধু শীতকালে পানির গুণগত মান খারাপ থাকে বলে উল্লেখ করেছেন।

চিত্র ১ : ঢাকা ওয়াসার পানির মান

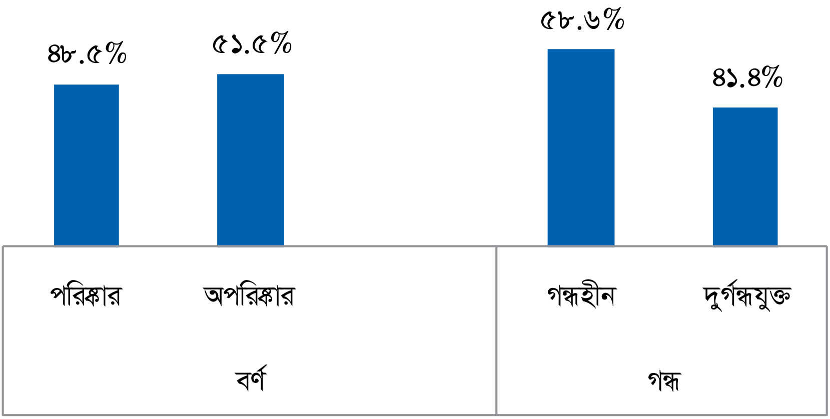

সেবাগ্রহীতাদের ৯৩ দশমিক শূন্য শতাংশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি পানের উপযোগী করেন। তাদের মধ্যে ৯১ দশমিক শূন্য শতাংশ ফুটিয়ে পান করেন। গৃহস্থালি পর্যায়ে পানি ফুটিয়ে পানের উপযোগী করতে ঢাকা মহানগরীর খানার গ্যাস খরচ প্রায় ৩৬ কোটি ৫৭ লাখ ৩৭ হাজার ৮ ঘনমিটার, যার আর্থিক মূল্য ৩৩২ কোটি ৩৭ লাখ ৫৮ হাজার ৬২০ টাকা (প্রায়)।[২৯] আবার পানির গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জরিপের অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের তথ্য অনুযায়ী, ওয়াসার পানি ব্যবহারের কারণে (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৮) সেবাগ্রহীতা বা তার পরিবারের (আবাসিক ও এলআইসি) ২৪ দশমিক ৬

শতাংশ সদস্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আক্রান্ত সেবাগ্রহীতাদের ৬৩ শতাংশ ডায়রিয়া, ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ জন্ডিস, ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ চর্মরোগ, ১৭ দশমিক ১ শতাংশ আমাশয়, ১৯ দশমিক ২ শতাংশ টাইফয়েড, ১৩ দশমিক ১ শতাংশ কলেরা ও ৩ দশমিক ৭ শতাংশ অন্যান্য ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'পানির "নিরাপদ" বিবেচিত উৎসগুলোর ৪১ শতাংশই ক্ষতিকারক ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়াযুক্ত।[৩০]

পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় সক্ষমতা ও কার্যকারিতা

পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদান ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও এ সেবা প্রদানে সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনে ঢাকা ওয়াসার পর্যাপ্ত লাইন নেই। ঢাকা ওয়াসার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পয়ঃসেবার আওতাধীন মোট এলাকা ২০ শতাংশ দাবি করলেও বাস্তবে এর চেয়ে কম। ১৯৯০ সালের পর ঢাকা ওয়াসা নতুন কোনো পয়ঃলাইন তৈরি করেনি। ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন প্রায় ১৪ লাখ ঘনমিটার পয়ঃবর্জ্য তৈরি হয়। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনে ঢাকা ওয়াসার একটি মাত্র ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে যার সক্ষমতা ১ লাখ ৫০ হাজার ঘনমিটার হলেও প্রতিদিন এটি মাত্র ৫০ হাজার ঘনমিটার পরিশোধন করে। বাকি প্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার ঘনমিটার (প্রায় ৯৬ শতাংশ) অপরিশোধিত অবস্থায় বিভিন্ন খাল হয়ে পার্শ্ববর্তী নদীগুলোতে (বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু) পতিত হয়। পয়ঃলাইনের অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নদী দূষণে ঢাকা ওয়াসা অনেকাংশে দায়ী।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের ২০ দশমিক ৫ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বলেছেন পয়ঃনালার পানি উপচে পড়ে, ৭৯ দশমিক ৭ শতাংশ বলেছেন পয়ঃনালা বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ বলেছেন পয়ঃনালা পানির লাইনের সাথে মিশে যায়। পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ২১ দশমিক ৮ শতাংশ বলেছেন যে তারা সারা বছরই সমস্যার সম্মুখীন হন। এ ছাড়া ৯৪ দশমিক ৪ শতাংশ শুধু বর্ষাকালে, ৯ দশমিক ৬ শতাংশ শুধু গ্রীষ্মকালে এবং ২ দশমিক ২ শতাংশ শুধু শীতকালে সমস্যার সম্মুখীন হন বলে উল্লেখ করেছেন।

ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে সক্ষমতা ও কার্যকারিতা

১৯৮৯ সালে ঢাকা ওয়াসার কর্মপরিধিতে ড্রেনেজ কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়। আগে ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ঢাকা ওয়াসার আওতায় ৩৫০ কিমি ড্রেন, ১০ কিমি বক্স কালভার্ট এবং ৭৪ কিমি দৈর্ঘ্যের ২৬টি খাল রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন ২৬টি খালের বর্তমান অবস্থার একটি বিবরণী প্রতিবেদনে ২০টির প্রবাহ সচল দাবি করা হলেও বাস্তবে সেগুলোর একাংশ সচল না থাকা লক্ষণীয়। এগুলোতে ময়লা-আবর্জনা ভরাট হয়ে পানি নিষ্কাশনের অনুপযোগী হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ

কাটাসুর খাল। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনে নতুন ড্রেন নির্মাণ ও সংরক্ষণে ঢাকা ওয়াসার ঘাটতি লক্ষণীয়।[৩১] ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগে কর্মরতদের প্রতি মাসে কমপক্ষে দুবার খাল ও ড্রেন পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও তা করা হয় না। তদারকির অভাবে খাল দখল, খালের মধ্যে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণসহ বিভিন্নভাবে খাল ভরাট হয়ে থাকে।

চিত্র ২ : ঢাকা মহানগরীর খাল ব্যবস্থাপনার চিত্র

অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি : ঢাকা ওয়াসায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক পদসহ বিভিন্ন পদে পছন্দনীয় ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য শর্ত পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়ম অনুযায়ী আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স ৫৯ বছর হলেও ২০১৫ সালে শর্ত শিথিল করে তা ৬০ বছর করা হয়। আবার ২০১৬ সালে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগে বয়সের বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। আবার চুক্তিভিত্তিক পদসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অযাচিত হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। যেমন ২০১৩ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যেমন ২০১৭ সালে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে বোর্ড কর্তৃক তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত বাছাই ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে ওয়াসা প্রশাসনকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। উল্লিখিত চুক্তিভিত্তিক পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে ২০১৭ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে একটি স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

পদায়ন ও বদলিতে অনিয়ম : নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে এ ধরনের কয়েকটি পদে পদায়ন ও বদলিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম লক্ষণীয়। সাধারণ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে বৈষম্যের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকায় গভীর নলকূপ অনুমোদন ও নবায়ন শাখায় কিছু ব্যক্তির যোগসাজশের মাধ্যমে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের অভিযোগ রয়েছে। আবার প্রকল্প পরিচালক হিসেবে 'সুনজরে থাকা' ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া ও 'সুনজরে না থাকা' ব্যক্তিকে কিছু নির্দিষ্ট জোনে বদলি করার অভিযোগ রয়েছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অনিয়ম : ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে পক্ষপাতমূলক আচরণ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ। আবার বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 'সুনজরের' ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। এ প্রসঙ্গে ঢাকা ওয়াসার একজন কর্মকর্তার মন্তব্য, 'যাদের খুঁটির জোর বেশি, তারাই বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়।'

ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম : ঢাকা ওয়াসার ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। ক্রয় পরিকল্পনায় চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে উপযোগিতা বিবেচনা না করার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উপযোগিতা বিবেচনা না করে প্রায় ৪০ কোটি টাকার অটোমেটিক মিটার রিডিং (এএমআর) মিটার ক্রয় করা হয়।[৩২] পরবর্তী সময়ে পানির ময়লা মিটারে আটকে অল্প সময়ে মিটারগুলো বিকল হয়ে যায় এবং মিটারগুলো সঠিক রিডিং দিতে ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে ওয়াসার একজন কর্মকর্তার মন্তব্য, 'যখন দেখা যায় মিটারগুলো ব্যবহার করতে সমস্যা হচ্ছে, তখন ওয়াসা মিটার কেনা বন্ধ করে দিতে পারত। কিন্তু তা না করে পরবর্তী সময়ে আরও দুই ধাপে মিটার ক্রয় করা হয়।' আবার ক্রয় প্রস্তুতি পর্যায়ে (কারিগরি নকশা, ক্রয়পদ্ধতি, দর নির্ধারণ, যোগ্যতা নির্ধারণ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের যোগসাজশে পছন্দনীয় ঠিকাদারকে প্রাক্কলিত মূল্য জানিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষে ক্রয় নীতিমালা অনুসারে দরপত্র প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। এ ছাড়া দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদার নির্বাচন পর্যায়ে সমঝোতামূলক দুর্নীতিসহ ঢাকা ওয়াসার প্রকৌশলী ও তাদের পরিবারের একাংশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৩ : ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

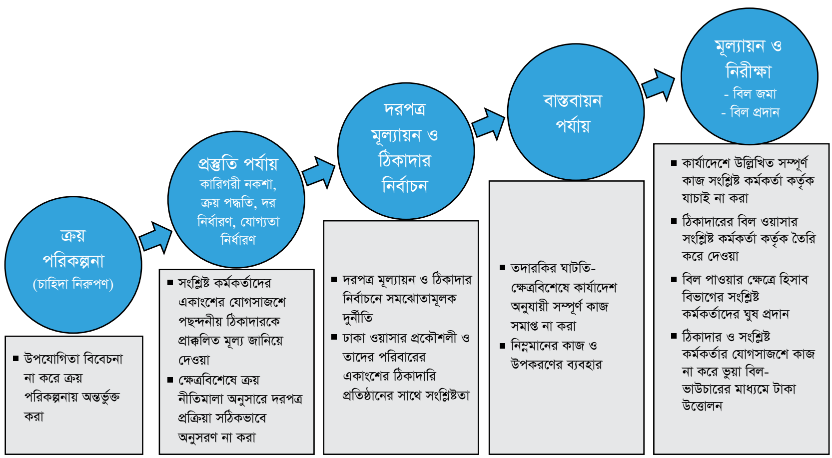

আবার বাস্তবায়ন পর্যায়ে তদারকির ঘাটতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষে কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না করা এবং নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার (বিল জমা, বিল প্রদান) ক্ষেত্রে কার্যাদেশে উল্লিখিত সম্পূর্ণ কাজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই না করা, ঠিকাদারের বিল ওয়াসার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক তৈরি করে দেওয়া, বিল পাওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে কাজ না করে ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি : ঢাকা ওয়াসাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও ধীরগতির কারণে অনুমোদিত মেয়াদ অতিক্রম করে দুই বছর পার হলেও কাজ শেষ হয়নি। এ ক্ষেত্রে দুবার মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় প্রায় ২৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ওই প্রকল্পে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মানের উপকরণ (যেমন পাইপ) ব্যবহার করা হয়নি, যা মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ দল উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া প্রকল্পটির পরামর্শক ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরামর্শক নিয়োগের নিয়ম থাকলেও এ প্রকল্পে সে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয়। অপর একটি প্রকল্পে ক্রয় নীতিমালা অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনুসরণ না করে সরাসরি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার জন্য ছোট ছোট লটে বিভক্ত করা হয়। ওই প্রকল্পে মোট ১১টি প্যাকেজে কাজ সম্পন্ন করার অনুমোদন থাকলেও দুই শতাধিক প্যাকেজের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হয়। আবার এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৮০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিবহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয় যা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কাছে অস্বাভাবিক বলে পরিগণিত হয়। এ ছাড়া প্রকল্পটিতে ৫৪ কিলোমিটার পাইপসংবলিত ড্রেন স্থাপনের পরিকল্পনা থাকলেও ৪৮ কিলোমিটার স্থাপন করেই কাজ সমাপ্ত করা হয়।

প্রশাসনিক কাজে সিবিএর অযাচিত হস্তক্ষেপ : রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে ঢাকা ওয়াসায় সিবিএ নেতাদের একাংশের অযাচিত ক্ষমতার চর্চা লক্ষণীয়। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন বিভাগ ও সার্কেলে জনবলের ঘাটতি থাকলেও তাদের বাধার কারণে জনবল নিয়োগ না দিতে পারার অভিযোগ রয়েছে।

মিটার রিডিং নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি : গ্রাহকদের মিটার রিডিং ও বিলিং সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মিটার চেক না করে বিল করা, গড়ে বিল করা, যোগসাজশের মাধ্যমে বিল করা এবং রাজস্ব পরিদর্শক কর্তৃক মিটার রিডিং না নিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে 'ডুবলি' নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে মিটার রিডিং নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী রাজস্ব পরিদর্শকদের প্রতি মাসে মিটার চেক করে বিল তৈরি করার বিধান রয়েছে। কিন্তু রাজস্ব পরিদর্শকদের একাংশ নিয়মিত মিটার রিডিং না নিয়ে গড়ে বিল প্রদান করে বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্রাহকদের একাংশের মতে, সরবরাহকৃত বিলের সঙ্গে মিটার রিডিংয়ের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। এভাবে নিয়মিত মিটার চেক না করে বিল করায় মাসের পর মাস একজন গ্রাহকের মিটারের রিডিং জমতে থাকে। এরপর হঠাৎ একদিন মিটার চেক করে একটি বড় অঙ্কের

বিল প্রদান করলে গ্রাহকদের জন্য বড় ধরনের বোঝা তৈরি হয়। মিটার রিডাররা তখন সুযোগটি কাজে লাগান। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকরা মিটার রিডারের সহযোগিতা চাইলে তারা নির্ধারিত অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে বিলে টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেন। অপরদিকে, কিছু এলাকায় গ্রাহকদের সাথে রাজস্ব পরিদর্শকদের যোগসাজশের মাধ্যমে বিল করার অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন আবাসিক গ্রাহকের মন্তব্য, 'আমাদের হাউজিংয়ের প্রায় সব বাড়ির মালিকই ওয়াসার মিটার রিডারের সাথে চুক্তিবদ্ধ। মিটার রিডার আমাদের মিটার না দেখেই পানির বিল দেয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসে গড়ে আমার ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকার মতো বিল আসে। এ জন্য আমি মিটার রিডারকে প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা করে দিয়ে থাকি।'

গ্রাহক সেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি : সেবাগ্রহীতাদের ২৬ দশমিক ৯ শতাংশের তথ্যমতে, তারা জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ সময়কালে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসংক্রান্ত সেবা বা সমস্যা নিয়ে ঢাকা ওয়াসার সাথে যোগাযোগ করেছেন। তাদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আবার সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যারা অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (৬১ দশমিক ৯ শতাংশ) তাদের মধ্যে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ দায়িত্ব পালনে অবহেলা, ২০ দশমিক ৭ শতাংশ সময়ক্ষেপণ, ২৩ দশমিক শূন্য শতাংশ ভৌতিক বিল এবং ৩ দশমিক ৮ শতাংশ অন্যান্য ধরনের (মিটার টেম্পারিংয়ে বাধ্য করা) দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, যারা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছেন তাদের ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ বাধ্য হয়ে, ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য, ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ যথাসময়ে সেবা পেতে, ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ নির্ধারিত সময়ের আগে বা দ্রুত সেবা পেতে, ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ নির্ধারিত ফি ও সেবার নিয়মকানুন সম্পর্কে না জানাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের ৮৬ দশমিক ২ শতাংশ ওয়াসার কর্মচারী এবং ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ দালালকে দিয়েছেন।

সারণি ২ : সেবার ধরন অনুযায়ী প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরন	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
পানির সংযোগ গ্রহণ	২০০ থেকে ৩০,০০০
পয়ঃলাইনের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ	৩০০ থেকে ৪,৫০০
গাড়িতে করে জরুরি পানি সরবরাহ	২০০ থেকে ১,৫০০
মিটার ক্রয়/পরিবর্তন	১,০০০ থেকে ১৫,০০০
মিটার রিডিং ও বিলসংক্রান্ত	৫০ থেকে ৩,০০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	১ লাখ থেকে ২ লাখ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

ঢাকা ওয়াসার সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণে প্রতিটি মডস ও রাজস্ব জোনে একটি অভিযোগ ও পরামর্শ কেন্দ্রসহ হটলাইন ব্যবস্থা চালু থাকলেও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে ঘাটতি দেখা গেছে। নমুনা জরিপে দেখা যায় যে সেবাসংক্রান্ত সমস্যার কারণে সেবাগ্রহীতাদের ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ অভিযোগ করেছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ২ দশমিক ৪ শতাংশ ওয়াসা লিংক (১৬১৬২) বা হটলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে ৫৭ দশমিক ৪ শতাংশ পানির পাপ্যতা, ৩২ দশমিক ২ শতাংশ পানির মান, ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ বিল সংক্রান্ত, ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন এবং ১ দশমিক ১ শতাংশ অন্যান্য (মিটার ও পুনঃসংযোগ) বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ হিসেবে ৬১ দশমিক ৫ শতাংশ উল্লেখ করেছেন কোনো সমাধান হয়নি, ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ অভিযোগকারী বলেছেন, সমাধানে দীর্ঘ সময় নিয়েছে, ২০ দশমিক ২ শতাংশ বলেছেন যথাসময়ে সমাধান হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিযোগকারীদের মধ্যে ৬ দশমিক ৯ শতাংশের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি।

ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অবগতি

ঢাকা ওয়াসা সেবা সহজীকরণ ও সেবাবান্ধব করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিল জমা ও বিলসংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন সেবাসংক্রান্ত আবেদন অনলাইনে করার ব্যবস্থা, সেবাসংক্রান্ত তথ্য ও অভিযোগ জানাতে হটলাইন চালু এবং খুচরা পানি সরবরাহে মহানগরীর কয়েকটি স্থানে এটিএম বুথ চালু করা উল্লেখযোগ্য। তবে সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য অংশ এসব উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত নন। ঢাকা ওয়াসা ২০১০ সালে অনলাইনের মাধ্যমে বিল পরিশোধের কার্যক্রমটি শুরু করে; কিন্তু নমুনা জরিপে সেবাগ্রহীতাদের বেশির ভাগই (৯৮ শতাংশ) সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ওয়াসার ওয়েবসাইটে অনলাইনে বিল জমা ও বিলসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়- এ বিষয়ে জানেন ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ সেবাগ্রহীতা, পানি ও পয়ঃসংযোগের আবেদন অনলাইনে করা যায়- এ বিষয়ে জানেন ৩৭ দশমিক ৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতা, ঢাকা ওয়াসার বোতলজাত পানির সেবা সম্পর্কে জানেন ২৮ দশমিক শূন্য শতাংশ সেবাগ্রহীতা, খুচরা পানি সরবরাহে এটিএম বুথ সম্পর্কে জানেন ৮ দশমিক ১ শতাংশ সেবাগ্রহীতা এবং ওয়াসা লিংক (১৬১৬২) সম্পর্কে জানেন মাত্র ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতা।

সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি

ঢাকা ওয়াসার সেবা কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতি ও সেবার নিম্নমানের কারণে গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। সার্বিকভাবে গ্রাহক জরিপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি সেবাগ্রহীতার অসন্তুষ্টি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পানির মান ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় সন্তুষ্টির মাত্রা উদ্বেগজনক। সেবাগ্রহীতাদের মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় ও ৬ দশমিক ৮ শতাংশ পানির মান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সারণি ৩ : সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা

সেবার ধরন	সন্তুষ্টির ধরন (শতকরা হার)		
	সন্তুষ্ট	মোটামুটি	অসন্তুষ্ট
পানি সরবরাহ ও প্রাপ্যতা	২৪.২%	৪৬.২%	২৯.৬%
পানির মান	৬.৮%	৪৬.২%	৪৭.০%
পয়ঃনিষ্কাশন	২.২%	১৯.৩%	৭৮.৫%
অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি	১১.০%	২১.৭%	৬৭.৩%
সার্বিক	**২০.১%**	**৪২.৪%**	**৩৭.৫%**

উপসংহার

ঢাকা ওয়াসা বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের চেষ্টা করলেও পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় এখনো ব্যাপক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি (নিয়োগ-প্রক্রিয়া, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম, ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বাস্তবায়ন) বিদ্যমান। আবার অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে ওয়াসা বোর্ডের কার্যকারিতায় ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা ওয়াসাসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি লক্ষণীয়। বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট শর্তের অনুপস্থিতি, চুক্তিভিত্তিক ও খণ্ডকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলার দায়বদ্ধতা উল্লেখ না থাকা, পানির মূল্য নির্ধারণে জনমত গ্রহণ ও প্রোগ্রেসিভ ট্যারিফ বিষয়ে উল্লেখ না থাকা লক্ষণীয়। ঢাকা ওয়াসার ভিশন ও মিশন অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণ, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণেও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া এলাকাভেদে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মানের তারতম্য ও ন্যায্যতার ঘাটতি বিদ্যমান। পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় সক্ষমতার ঘাটতির কারণে ঢাকা মহানগরীতে সৃষ্ট প্রায় ৯৫ শতাংশ পয়ঃবর্জ্য অপরিশোধিত থেকে যায়। সেবাগ্রহীতা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বস্তি এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী পানি না পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে পানির নিম্নমানের কারণে সেবাগ্রহীতাদের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় এবং পানি বিশুদ্ধকরণে জ্বালানি খরচ (গ্যাসের ব্যবহার) বাবদ বড় অঙ্কের রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। সার্বিকভাবে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার নিম্নমানের কারণে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি সেবাগ্রহীতার অসন্তুষ্টি রয়েছে।

সুপারিশ

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসাকে অধিকতর কার্যকর ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো :

স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য সুপারিশ

১. পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বতন্ত্র রেগুলেটরি কমিশন গঠন করতে হবে; এ কমিশন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে জনমতের ভিত্তিতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং মূল্য নির্ধারণে প্রোগ্রেসিভ ট্যারিফ ব্যবস্থা চালুসহ ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।

২. ঢাকা ওয়াসা আইনের কার্যকর প্রয়োগেরক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করতে হবে।

৩. জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা একাধিক কর্তৃপক্ষের কাছে না রেখে কোনো একক কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

ঢাকা ওয়াসার জন্য সুপারিশ

৪. চুক্তিভিত্তিক পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদিসহ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. শূন্য পদগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের পাশাপাশি প্রযোজ্যক্ষেত্রে অটোমেশনের মাধ্যমে জনবলের ঘাটতি পূরণ করতে হবে এবং অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করতে হবে।

৬. মাঠপর্যায়ের সেবা কার্যক্রম, খাল পরিদর্শন, রাজস্ব আদায়, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. পানি ও পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের লক্ষ্যে নতুন পয়ঃলাইন তৈরিসহ বিদ্যমান লাইনের যথাযথ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৮. ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমাতে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতে বৃষ্টির পানি ধারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পাশাপাশি ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নিরাপদ ও মানসম্মত পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১০. নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সারা ঢাকা মহানগরীতে ডিস্ট্রিক্ট মিটারড এরিয়া (ডিএমএ) স্থাপন দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১. পানি শোধনাগার প্রকল্পসমূহের কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে।

১২. ওয়েবসাইটে সেবাসংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করা এবং সেবাসংক্রান্ত গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে প্রচারণা বাড়াতে হবে।

১৩. প্রধান কার্যালয় ও মডসজোনগুলোতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এবং পরিদর্শনের জন্য পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ ছাড়া অসাধু কর্মচারীদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

১৫. সেবার মান যাচাই ও উন্নতিকল্পে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় পানিনীতি* ১৯৯৯ (ঢাকা, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯), পৃ. ৫।

২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় পানি আইন* ২০১৩, ধারা ৩ (২) (ঢাকা, বাংলাদেশ সরকার, ২০১৩)।

৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ : সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; ২০৩০ সালের মধ্যে, নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সবার সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন (৬.১); ২০৩০ সালের মধ্যে সব খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানিসংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা (৬ দশমিক ৪)।

৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫/১৬ - ২০১৯/২০*, (ঢাকা, বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬), পৃ. ২৭৭।

৫ সাইদ হাফিজুর রহমান ও শেখ তাওহীদুল ইসলাম, *কান্ট্রি বেইজলাইন অ্যাসেসমেন্ট-ওয়াটার সেক্টর ইন্টিগ্রিটি ইন বাংলাদেশ* (ঢাকা, বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক, ২০১৪) https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2015/fr_bawin_baseline-assessment_15_en.pdf

৬ ঢাকা ওয়াসা, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬* (ঢাকা, ঢাকা ওয়াসা, ২০১৬) পৃ. ৮।

৭ ডেমোগ্রাফিয়া ওয়ার্ল্ড আরবান এরিয়াস ২০১৮-এর ১৪তম সংস্করণের তথ্য মতে, ঢাকা মহানগরীর প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৪৭ হাজার ৪০০ জন যা বিশ্বের অন্যান্য নগরীর তুলনায় সর্বোচ্চ। ঢাকা মহানগরী বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭২ লাখ এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৭২ শতাংশ।

৮ বিস্তারিত দেখুন সাইদ হাফিজুর রহমান ও শেখ তাওহীদুল ইসলাম, ২০১৪; এ এফ এম আজিম উদ্দিন ও মোহাম্মদ আবদুল বাতেন, *ওয়াটার সাপ্লাই অব ঢাকা সিটি: মার্কি ফিউচার*, (ঢাকা, উন্নয়ন অন্বেষণ, ২০১১); মানোজ শর্মা ও ম্যালিসা অ্যালিপ্যালো, *দি ঢাকা ওয়াটার সার্ভিস টার্নঅ্যারাউন্ড* (ম্যানিলা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ২০১৭) https://www.adb.org/sites/default/files/publication/384631/dhaka-water-services.pdf

৯ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে ঢাকা ওয়াসার সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ ও কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়া, শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহে ঘাটতি, এলাকাভেদে পানি সরবরাহে তারতম্য, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি, প্রকল্প ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে সুশাসনের ঘাটতিসহ নানা অভিযোগ লক্ষণীয়।

১০ Weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=Probablity of selecting a PSU (Primary Sampling Unit) under a MODS Zone, p2= Selection probablity of a segment within the PSU, p3= Selection probality of a connection (Residential, Commercial, Industrial and LIC) from the selected segment of a PSU। সকল বিশ্লেষণকে ভর দ্বারা সমন্বয় করা হয়েছে।

১১ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬; ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (আর্থিক) প্রবিধানমালা, ২০০৯; ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ) কর্তৃপক্ষ প্রবিধানমালা, ২০১১।

১২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা আইন এবং বিধিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ওয়াসা আইনের ২৮(৪) উপধারায় শুধু ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে এ আইনের ধারা ২৯-এ উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ সম্পর্কে বলা হলেও সেখানে তাদের চাকরির শর্তাবলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

১৩ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রবিধানমালা, ২০১০-এর ধারা ২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যদি তাদের নিয়োগের শর্তে এ প্রবিধানমালার বিভিন্ন বিষয়াদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে তাহলে এ প্রবিধানমালা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হবে না, ফলে উক্ত শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলার দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে শিথিলতা তৈরির সুযোগ রয়েছে।

১৪ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর উপধারা ১০(২)-এ পানির মূল্য কার্যকর হওয়ার ত্রিশ দিন আগে তা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গণমাধ্যমে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের মতামত নেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা বা গণশুনানির আয়োজন বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে পানির নির্ধারিত মূল্য সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহনীয় কি না, সে বিষয়ে বাস্তব অবস্থা যাচাই না করার ঝুঁকি রয়েছে।

১৫ ঢাকা ওয়াসা, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬* (ঢাকা, ঢাকা ওয়াসা, ২০১৬)।

১৬ তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (তথ্য প্রাপ্তি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

১৭ ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে তারা 'ডুবলি' হিবেসে পরিচিত।

১৮ তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (তথ্য প্রাপ্তি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

১৯ গবেষক দল সর্বশেষ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকা ওয়াসার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে।

২০ *প্রথম আলো*, ৩১ জুলাই ২০১৮।

২১ *প্রথম আলো*, ৩১ জুলাই ২০১৮।

২২ ঢাকা ওয়াসা, 'ঢাকা ওয়াসা সার্বিক অগ্রগতি : আগামীর কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক ঢাকা ওয়াসা আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন, ২১ নভেম্বর, ২০১৭, ঢাকা।

২৩ ১৯৯৬ সালের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, ঢাকা ওয়াসা পানি নিষ্কাশনের জন্য বড় ড্রেন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও খাল দেখভাল করবে। এ ছাড়া 'বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন সুবিধার জন্য ময়লা নির্গমন প্রণালি ও নির্মাণ ও সংরক্ষণে'র দায়িত্বও ঢাকা ওয়াসার অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সিটি করপোরেশন আইন ২০০৯-এর তৃতীয় তফসিলে বলা হয়েছে, ছোটখাটো নালা, ড্রেন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে সিটি করপোরেশন। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত 'ঢাকা মহানগরীর

ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা-২০০৫'-এ বলা হয়েছে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব ঢাকা ওয়াসার হাতে থাকবে। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি কোনো ড্রেন লাইন করতে চায় তাহলে ঢাকা ওয়াসার পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে।

[২৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, *ঢাকা মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালা*, (ঢাকা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০০৫)।

[২৫] *প্রথম আলো*, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭।

[২৬] তথ্য অধিকার আইনে আবদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (তথ্য প্রাপ্তি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

[২৭] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[২৮] ঢাকা ওয়াসা, *ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ) কর্তৃপক্ষ প্রবিধানমালা*, ২০১১ (ঢাকা, ঢাকা ওয়াসা, ২০১১) ধারা ১৫ (২)।

[২৯] ঢাকা মহানগরীর মোট জনসংখ্যার (১,৭২,০০০০০ জন) ৯৩ দশমিক শূন্য শতাংশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি পানের উপযোগী করেন। এ হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি পানের উপযোগী করেন মোট জনসংখ্যার = ১,৭২,০০০০০*০.৯৩ = ১,৫৯,৯৬০০০ জন। পানের উপযোগী করার ক্ষেত্রে ৯১ দশমিক শূন্য শতাংশ পানি ফুটিয়ে বা সেদ্ধ করেন। এ হিসেবে পানি ফুটিয়ে বা সেদ্ধ করে পান করেন মোট জনসংখ্যার = ১,৫৯,৯৬০০০*০.৯১ = ১৪৫৫৬৩৬০ জন। ২০১১ সালের জাতীয় আদম শুমারির তথ্য অনুযায়ী ঢাকা জেলার শহর এলাকার খানাগুলোর গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৩। এ হিসাবে ঢাকা মহানগরীর পানি ফুটিয়ে পান করে এমন খানার সংখ্যা = ১৪৫৫৬৩৬০/৪.৩ = ৩৩৮৫২০০টি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন একজন ব্যক্তির ন্যূনতম খাবার পানির চাহিদা ৩ লিটার। এ হিসাবে একটি খানায় ন্যূনতম খাবার পানির চাহিদা = ৩ লিটার * ৪.৩ = ১৩ লিটার (প্রায়)। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ১৩ লিটার পানি ফুটাতে বা সেদ্ধ করতে প্রায় ৫০ মিনিট সময় লাগে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যয়িত গ্যাসের পরিমাণ ০.২৯৬ ঘনমিটার। তিতাস গ্যাসের ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ৯.১০ টাকা। সুতরাং প্রতিদিন খানাপ্রতি পানি ফুটিয়ে বা সেদ্ধ করা বাবদ জ্বালানি খরচ = ০.২৯৬*৯.১০= ২.৬৯ টাকা। এ হিসাবে ঢাকা মহানগরীর পানি ফুটিয়ে খায় এমন খানার জ্বালানি বাবদ বার্ষিক গ্যাসের ব্যবহার = ০.২৯৬*৩৩৮৫২০০*৩৬৫= ৩৬৫৭৩৭০০৮ ঘনমিটার যার আর্থিক মূল্য খরচ = ৩৩৮৫২০০*২.৬৯*৩৬৫= ৩৩২ কোটি ৩৭ লাখ ৫৮ হাজার ৬২০ টাকা (প্রায়)।

[৩০] ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, *প্রমিজিং প্রোগ্রেস : এ ডায়াগনস্টিক ও ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, হাইজিন অ্যান্ড প্রবার্টি ইন বাংলাদেশ*, (ওয়াশিংটন, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১৮) https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29450/124159-WP-P154882-PUBLIC.pdf?sequence=6&isAllowed=y

[৩১] ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন ২৬টি খালের বর্তমান অবস্থার বিবরণী প্রতিবেদন- ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত।

[৩২] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় *

নিহার রঞ্জন রায় ও শাম্মী লায়লা ইসলাম

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে কোনো দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত নিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয়।[১] দলিল নিবন্ধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দলিলের বিশুদ্ধতার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা; সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে সর্বসাধারণকে জ্ঞাতকরণ বা প্রচারের সুবিধা; জালিয়াতি রোধ; কোনো সম্পত্তি আগে হস্তান্তরিত হয়েছিল কি না তা অনুসন্ধানে তথ্যভান্ডার থেকে সহায়তা প্রদান; স্বত্বের দলিলের নিরাপত্তা প্রদান এবং মূল দলিল খোয়া গেলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মূল দলিলের অস্তিত্ব প্রমাণার্থে সহায়তা প্রদান করা।[২]

উপমহাদেশে ১৮৬৪ সালে দলিল নিবন্ধন পদ্ধতির প্রবর্তন হয় এবং পরবর্তী সময়ে 'নিবন্ধন আইন-১৯০৮' অনুযায়ী মূল্য নির্বিশেষে সব ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। নিবন্ধন আইন ১৯০৮-এর ১৭ ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য দলিলগুলো হচ্ছে মূল্য নির্বিশেষে সব ধরনের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সাফ কবলা দলিল, হেবা বা দানপত্র দলিল, বন্ধকী দলিল, সম্পত্তির বাটোয়ারা দলিল, বায়না চুক্তির দলিল, এওয়াজ বদল দলিল, আমমোক্তারনামা, উইল ইত্যাদি। বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধনযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিবন্ধন না হলে ওই দলিল নিয়ে কোনো আদান-প্রদান প্রমাণিত হয় না।

নিবন্ধন বিভাগ এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন দলিল নিবন্ধন কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালে নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তরের অধীন সারা দেশে ৪৯৭টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এবং ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস নিবন্ধন কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করছে। নিবন্ধন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীনে ৩৬ লাখ ৭২ হাজার ৪২৮টি দলিল নিবন্ধন হয়েছে এবং এ থেকে মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ১২,৪৩২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭২,৭৩১ টাকা।[৩]

---

* ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

দলিল নিবন্ধনসেবা সহজীকরণ এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[৪] এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'নিবন্ধন আইন-১৯০৮'-এর যুগোপযোগী হালনাগাদ সংশোধন, 'নিবন্ধন ম্যানুয়াল-২০১৪', 'নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৪' ও 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন এবং 'সর্বনিম্ন বাজারমূল্য বিধিমালা-২০১০'-এর হালনাগাদকরণ, দলিলের গতানুগতিক ভাষা পরিবর্তন করে সহজতর করা, দলিল লেখার সুনির্দিষ্ট ফরম্যাট চালু করা, দলিল কম্পিউটারে কম্পোজ করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং দলিল নিবন্ধন ফি, স্ট্যাম্প শুল্কসহ যাবতীয় কর ও শুল্ক পে-অর্ডারে পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নাগরিক সনদ ও বিভিন্ন দলিলের ফি, স্ট্যাম্প ও আনুষঙ্গিক কর পরিশোধের হারের তালিকা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ, রেকর্ডরুমের সুরক্ষা বৃদ্ধিতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

এ ধরনের নানা সংস্কার কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে দেশের ভূমি নিবন্ধনসেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম, সুশাসনের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে আসে। টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত সেবা খাতে দুর্নীতি শীর্ষক বিভিন্ন জাতীয় খানা জরিপে (১৯৯৭-২০১৭) ভূমি নিবন্ধনসেবা ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতিপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের খানা জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানাকে গড়ে ১১ হাজার ৮৫২ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ছাড়া টিআইবির 'ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৫) শীর্ষক গবেষণায় এবং ৯টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ওপর পরিচালিত বেইজলাইন জরিপে[৫] (২০১৫-২০১৭) ভূমি দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রথমত, দুর্নীতিমুক্ত ও জনবান্ধব ভূমি নিবন্ধনসেবা নিশ্চিতে নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরি। দ্বিতীয়ত, ভূমি খাতের ওপর বিভিন্ন গবেষণায় ভূমি দলিল নিবন্ধনে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র আংশিকভাবে উঠে এলেও সুনির্দিষ্টভাবে এই সেবার ওপর সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে নিবিড় গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। তৃতীয়ত, ভূমি খাত টিআইবির কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের ভূমিসেবা খাত নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা এবং তার আলোকে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ভূমিসেবা খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় দলিল নিন্ধনের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের নিবন্ধন অধিদপ্তর তথা নিবন্ধন অফিসগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- ভূমি দলিল নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- ভূমি দলিল নিবন্ধন কার্যে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রভাব নিরূপণ করা এবং
- ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবা কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণা পরিধি

দেশে যত ধরনের দলিল নিবন্ধিত হয় তার অধিকাংশ ভূমিসংক্রান্ত। এ গবেষণায় শুধু ভূমিসংক্রান্ত নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে সম্পাদিত ভূমি বা সম্পত্তি নিবন্ধন কার্যক্রম এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের এলাকা ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে দেশের ৮টি বিভাগ থেকে মোট ১৬টি (প্রতিটি থেকে দুটি করে) জেলার রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের আওতাধীন সব জেলা রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্যে এক বছরে সম্পাদিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দলিল নিবন্ধনের সংখ্যার ভিত্তিতে দুটি করে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্য থেকে কমপক্ষে দুটি এবং কোথাও কোথাও তিনটি করে মোট ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের আওতাধীন সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর মধ্যে এক বছরে সম্পাদিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দলিল নিবন্ধনের সংখ্যার ভিত্তিতে দুটি করে মোট ৩২টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে। এ ছাড়া অবস্থান ও বৈচিত্র্যগত (জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবনে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলায় নিবন্ধন সংখ্যার বিবেচনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, নদীভাঙন এলাকা, সীমান্তবর্তী এলাকা ইত্যাদি) গুরুত্ব বিবেচনায় আরও ৯টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস নির্বাচন করা হয়েছে।

এ গবেষণায় নিবন্ধন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী (অফিস সহকারী, মোহরার, টিসি মোহরারসহ অন্যান্য), রেকর্ডকিপার, নকলনবিশ, দলিল লেখক, আইনজীবী, সেবাগ্রহীতা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী, সার্ভেয়ার, দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা (স্থানীয় ও জাতীয়

পর্যায়ে), ব্যাংক কর্মকর্তা, রিয়েল এস্টেট প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার) আলোকে নির্বাচিত জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে সম্পাদিত ভূমি বা সম্পত্তি নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি; যেমন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। জুলাই ২০১৮-আগস্ট ২০১৯ সময়ের মধ্যে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, এ গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ নিবন্ধনসেবা সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন তথা সব জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার, মোহরার, অন্যান্য কর্মচারী, নকলনবিশ, দলিল লেখক, সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে দলিল নিবন্ধনসেবায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

গবেষণার ফলাফল

আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা : আইন অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য জমির মালিকানা যাচাইয়ে যে বাধ্যবাধকতা ও পদ্ধতি রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। যেমন অনেক সময় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে জমির খতিয়ান বা রেকর্ড অব রাইটসের হালনাগাদ কপি না থাকায় সাব-রেজিস্ট্রাররা দলিলের সঙ্গে উপস্থাপিত খতিয়ানের কপি বৈধ কি অবৈধ তা সহজে যাচাই করতে পারেন না। ফলে জাল দলিল তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, আইনে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নকলনবিশ নিয়োগ বা তালিকাভুক্তিকরণ-সংক্রান্ত নির্দেশনা বিধিবদ্ধ নেই। এ ছাড়া, নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪-এর অষ্টম অধ্যায়ের ৪২ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে যে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা তার নিকট আনীত দলিলের বৈধতার সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় এবং দলিলটি সকল নিয়ম মেনে উপস্থাপিত হওয়া সাপেক্ষে তিনি সন্তুষ্ট হলে সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করে (প্রতারণামূলক বা সরকারি নীতির পরিপন্থী হলেও) দলিলটি নিবন্ধন করতে বাধ্য থাকবেন। এর ফলে অন্য পক্ষের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া, সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজারমূল্য নির্ধারণ বিধিমালা ২০১০ অনুযায়ী সম্পত্তির একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে নিবন্ধন 'ফি' ধার্য হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাজারমূল্য সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেখা যায় যে কোথাও কোথাও সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্য মৌজার শ্রেণিভিত্তিক গড় মূল্যের চেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে অতিরিক্ত নিবন্ধন ফি দিতে হয় এবং সেবাগ্রহীতারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপরদিকে দেখা যায় যে কোথাও কোথাও সম্পত্তির প্রকৃত বা বাস্তব মূল্য নির্ধারিত বাজার মূল্যের থেকে অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা দলিলে প্রকৃত ক্রয়মূল্য না দেখিয়ে নির্ধারিত বাজারমূল্য উল্লেখ করেন। ফলে প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের তুলনায় কম টাকা নিবন্ধন ফি দিতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকার যথাযথ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

অবকাঠামোগত ঘাটতি : অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা বা অপ্রতুলতা রয়েছে। অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিস পুরোনো ও জরাজীর্ণ ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণার আওতাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ২৭টি অফিসই পুরোনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। ভবনগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে এর বিভিন্ন অংশ ভাঙা, দেয়ালে ফাটল, প্লাস্টার খসে পড়েছে, ছাদ চুইয়ে পানি পড়ছে এবং স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় রয়েছে, যেখানে প্রচুর মেরামত ও সংস্কার কার্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ছাড়া অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে কাজের পরিধি ও নিয়োজিত লোকবলের তুলনায় কক্ষের অপ্রতুলতা রয়েছে, বিশেষ করে নকলনবিশদের ক্ষেত্রবিশেষে ২০-২৫ জনকে একটি কক্ষে এমনকি সিঁড়ির নিচে ও বারান্দায় বসে কাজ করতে হয়। একইভাবে, অধিকাংশ জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত রেকর্ডরুমগুলো পুরোনো ও প্রয়োজনের তুলনায় অপরিসর এবং কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে থাকায় পোকামাকড়ের (উইপোকা) উপদ্রবে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও বিভিন্ন নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

লজিস্টিকস ঘাটতি : জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর অবকাঠামোগত ঘাটতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণেরও (আসবাব, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফরম, বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার, ইনডেক্স, রেকর্ডরুমের জন্য কেরোসিন, ন্যাপথলিন, যানবাহন ইত্যাদি) ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩২টিতেই এমন চিত্র দেখা যায়। দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক চেয়ার-টেবিল, আলমারিসহ প্রয়োজনীয় আসবাব নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান আসবাবের অবস্থা জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারি না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও বালামগুলো অফিসের বিভিন্ন স্থানে (আলমারির ওপরে, মেঝেতে ইত্যাদি স্থানে) খোলা অবস্থায় রাখা হয়। কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের আসবাব, বিশেষ করে টেবিল-চেয়ার স্বল্পতার কারণে নকলনবিশদের নিজেদেরই চেয়ার-টেবিল ক্রয় করে নিয়ে এসে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসেই 'বালাম বই' বা বুক ভলিউম স্বল্পতা রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ১৮টিতেই এমন চিত্র দেখা যায়। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে 'বালাম বই' বা বুক ভলিউমের স্বল্পতা বা ঘাটতি থাকায় নকলনবিশরা মূল দলিল থেকে কপি করে যথাসময়ে বালাম বইতে তুলতে পারে না এবং এর ফলে একদিকে সেবাগ্রহীতাদের দলিল পেতে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়, অন্যদিকে কাজ না থাকায় নকলনবিশরাও সে সময় পারিশ্রমিক পায় না।

বাজেট ঘাটতি : সার্বিকভাবে নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা রয়েছে। দেখা যায় স্থানীয় পর্যায় থেকে চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ে আর্থিক চাহিদা প্রেরণের চর্চা নেই। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর জন্য প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণ বাজেট (লজিস্টিকস, কন্টিনজেন্সি বাবদ) বরাদ্দ দেওয়ায় অফিসের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করা দুরূহ। কিছু ক্ষেত্রে

স্থানীয় পর্যায়ে বাজেট পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় বাড়িভাড়া, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকে। কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দাপ্তরিক ব্যয় মেটানোর জন্য দলিল লেখক সমিতির ওপর অনিয়মতান্ত্রিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, যা দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অপরদিকে বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন কমিশন করার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১০ টাকা যাতায়াত ভাতা এবং প্রতি ৩০০ শব্দ লেখার জন্য নকলনবিশদের পারিশ্রমিক ২৪ টাকা।[৬]

ভূমি নিবন্ধনসেবায় ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি : ভূমি নিবন্ধনসেবা এখনো ডিজিটাইজেশন হয়নি। ভূমি নিবন্ধনসেবাসংক্রান্ত কোনো ডেটাবেস নেই। এর ফলে এ সেবাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে পাওয়া ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ক্ষেত্রবিশেষে জাল দলিল সহজে চিহ্নিত করা যায় না এবং নিবন্ধনের পর মূল দলিল ও দলিলের নকল উত্তোলনে সেবাগ্রহীতারা দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়।

জনবল ঘাটতি : সার্বিকভাবে নিবন্ধন অধিদপ্তর থেকে শুরু করে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে বিভিন্ন পদে জনবল ঘাটতি রয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রারের পদ ফাঁকা রয়েছে এবং ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ২২টি অফিসে পূর্ণকালীন সাব-রেজিস্ট্রারের ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে ওই অফিসগুলোতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে একজন সাব-রেজিস্ট্রারকে একাধিক (কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটি) সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কার্য সম্পাদন করতে হয়। নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সব কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রার সপ্তাহে এক বা দুই দিন তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার অফিসে অফিস করেন এবং শুধু ওই দিনগুলোতে ওই অফিস দলিল নিবন্ধনের কাজ হয়। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয় না। ফলে ওই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে নিবন্ধন কাজে বিলম্ব ঘটে। এতে করে সেবাগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। একইভাবে, দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অন্যান্য কর্মচারী সংখ্যা সে হারে বৃদ্ধি পায়নি। একটি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সাব-রেজিস্ট্রারসহ স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা হচ্ছে পাঁচজন এবং এই জনবল দিয়ে বর্তমান সময়ে নিবন্ধনকাজ সম্পন্ন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া অস্থায়ী কর্মী হিসেবে পিওন, উমেদার ও নকলনবিশরা কাজ করেন। জনবল কম থাকায় অনেক সময় নকলনবিশদের দিয়ে অফিসের কাজ (ইনডেক্সিং, সার্চিং ইত্যাদি) করানোয় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি বা দলিলে অভিগম্যতা পান, যা ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশিক্ষণের ঘাটতি : বর্তমানে জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে এবং সবাই সমান সুযোগ পান না। অপরদিকে জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ থাকলেও অন্যান্য কর্মচারী, বিশেষ করে সহকারী, মোহরার ও নকলনবিশদের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় স্বচ্ছতার ঘাটতি : ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার কিছু ঘাটতি উঠে এসেছে। আইন ও বিধিতে দৃষ্টিগোচর স্থানে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞপ্তি যেমন ফির তালিকা, দলিল দাখিলের সময়সূচি, সমাপ্তকৃত দলিলের দৈনিক বিজ্ঞপ্তি, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রত্যাহারসংক্রান্ত নির্দেশনা, প্রত্যাহৃত পাওয়ার অব অ্যাটর্নির তালিকা, নাগরিক সনদ, তল্লাশি ও নকলের আবেদন গ্রহণের সময়সূচি, রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত দূরত্ব তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ অফিসে এর সবগুলো প্রদর্শিত নেই। গবেষণার আওতাধীন ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ৩১টি অফিসে নাগরিক সনদ আছে। কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের কাছে দৃশ্যমান নয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তথ্য হালনাগাদ করা হয় না এবং লেখা অস্পষ্ট ও ছোট থাকে। গবেষণার আওতাধীন ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কোনেটিতেই পৃথক কোনো তথ্য অনুসন্ধান ডেস্ক ও নিবন্ধনসংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের মাধ্যম প্রদর্শিত নেই। আবার নিবন্ধন অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকলেও তা হালনাগাদ নয়। এ ছাড়া নিবন্ধন অধিদপ্তরের বিস্তারিত কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদন নেই– আইন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে নিবন্ধন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে।

ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় জবাবদিহির ঘাটতি : বিভাগীয় পরিদর্শক ও জেলা রেজিস্ট্রার কর্তৃক জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলো নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। দেখা যায় যে কোনো কোনো অফিস দীর্ঘদিন এ ধরনের কার্যক্রমের বাইরে থেকে যাচ্ছে। একইভাবে রেকর্ডরুমগুলোও নিয়মিত পরিদর্শনের ঘাটতি রয়েছে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিবন্ধন মহাপরিদর্শকের অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় কিছু ক্ষেত্রে তা প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টির পাশাপাশি পরিদর্শন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে। জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারী, নকলনবিশ, দলিল লেখকদের কার্যক্রম ও আচরণ যথাযথভাবে তদারকি না হওয়ায় তাদের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইন অনুযায়ী কোনো দলিল লেখক নির্ধারিত হারের অধিক 'ফি' দাবি করলে তার সনদ বাতিলযোগ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে দলিল লেখকরা অতিরিক্ত অর্থ সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে আদায় করলেও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে স্থানীয় পর্যায়ে দলিল লেখক সমিতির শক্ত অবস্থান, রাজনৈতিক যোগাযোগ ও স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার কারণে দলিল লেখকদের জবাবদিহি করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধনে আর্থিক দুর্নীতির সাথে নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসাজশ থাকায় যথাযথভাবে ও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জবাবদিহি কাঠামো কাজ করে না। স্থানীয়ভাবে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী নকলনবিশ ও দলিল লেখকদের একাংশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা থাকে। একইভাবে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও নিবন্ধন অধিদপ্তরের সাথেও তারা যোগাযোগ ও সমঝোতা রক্ষা করে চলে।

অপরদিকে গবেষণাভুক্ত ৪১টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে ২৪টি অফিসে অভিযোগ বাক্স পরিলক্ষিত হয়নি। যেসব অফিসে অভিযোগ বাক্স আছে সেখানেও খুব কমসংখ্যক অভিযোগ দায়ের হয়। তবে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা নেই এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় অধিকাংশ সেবাগ্রহীতা অভিযোগ করেন না। দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর গণশুনানিতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসও অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমাধান পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যার কার্যকর সমাধান হয় না। অপরদিকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানি চালু করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এসব অফিসে গণশুনানির নির্ধারিত পদ্ধতি (প্রচার-প্রচারণা, নির্ধারিত স্থান, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয় না। আবার ভূমি নিবন্ধনসেবায় আন্তপ্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়সংক্রান্ত কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও নিবন্ধনসেবা কার্যক্রম মূলত ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভূমি দলিল নিবন্ধনের পর উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক দ্রুত রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান হালনাগাদের বিধান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় না। সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে নিয়মিত হালনাগাদ খতিয়ান সরবরাহ না হওয়ায় সাব-রেজিস্ট্রারদের সঠিক মালিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ (এলটি নোটিশ) উপজেলা ভূমি অফিসে নিয়মিত এবং যথাযথভাবে পাঠানো হয় না।

ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন : দলিল নিবন্ধনে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে টাকা ছাড়া কোনো কাজ করানো অত্যন্ত দুরূহ। দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য সেবাগ্রহীতারা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন বা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের তাদের নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। দলিল লেখার 'ফি' সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের ধারণা না থাকায় অধিকাংশ দলিল লেখক সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে উচ্চহারে পারিশ্রমিক আদায় করেন। বিভিন্ন অজুহাতে এবং বিভিন্ন হিসাবে (যেমন প্রতি লাখে, থোক বা প্যাকেজে ইত্যাদি) সেবাগ্রহীতারা অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়। এই টাকার পরিমাণ অনেক সময় এলাকা (অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বা যেসব এলাকার জমির দাম বেশি), সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যাটাগরি (ছোট বা বড়), সেবাগ্রহীতাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য, দলিল লেখকদের সাথে সেবাগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের (আত্মীয় বা পরিচিত) ভিত্তিতে এবং দলিলের ধরন অনুযায়ী (যেমন সাফ-কবলা দলিলে বেশি টাকা লাগে আবার হেবা দলিলের ক্ষেত্রে কম টাকা লাগে ইত্যাদি) কম-বেশি হয়ে থাকে। দলিল নিবন্ধনের ধরনভেদে দলিলের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে দলিল লেখকদের প্রতি লাখে ১ থেকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রদান করতে

হয়। এ ছাড়া নির্ধারিত নিবন্ধন ফির বাইরে প্রতিটি দলিল নিবন্ধনের জন্য দলিল লেখক সমিতির নামে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। গবেষণার আওতাভুক্ত সব এলাকার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় দলিল লেখকদের দলিল লেখক সমিতিতে ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে হয়।

অপরদিকে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের 'অফিস খরচ' হিসেবে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। এই নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণও কখনো প্রতি লাখে শতকরা হারে, কখনো থোক বা প্যাকেজে আকারে নির্ধারিত হয় এবং জমির মূল্য, শ্রেণি, অবস্থান, দলিলের ধরন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র থাকা/না থাকা, এলাকা ইত্যাদি বিষয় অনুযায়ী কম বা বেশি হয়ে থাকে। প্রতি দলিলের জন্য সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে এই অতিরিক্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে দলিল নিবন্ধনের জন্য সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ১ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত নিয়মবহির্ভূত অর্থ হিসেবে আদায় করা হয়। এ ছাড়া নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক থাকলে এক রকম অর্থ এবং ঠিক না থাকলে এই অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় যোগসাজশের মাধ্যমে হয় এবং এর সাথে সাব-রেজিস্ট্রার, সহকারী, মোহরার, নকলনবিশ, দলিল লেখকদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিদিনের এই জমাকৃত অর্থ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে পদ অনুযায়ী ভাগাভাগি করে থাকেন। এই টাকা ভাগাভাগিও বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও পদ অনুযায়ী শতকরা হার নির্ধারিত থাকে। যেমন অভিযোগ রয়েছে যে এই অর্থের ১০-৫০ শতাংশ সাব-রেজিস্ট্রার এবং বাকি অংশ অফিসের সবার মধ্যে পদ অনুযায়ী ভাগ-বাটোয়ারা হয়। আবার কখনো দলিলপ্রতি আদায়কৃত অর্থের ভিন্ন পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন পদের ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ থাকে। এই দলিলপ্রতি উত্তোলিত অর্থের একটি অংশ জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, নিবন্ধন অধিদপ্তর পর্যন্ত যাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য সরকার নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় যা সাধারণভাবে ১ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত দলিলের মেয়াদ, এলাকা, দলিলের ধরন, আকার ও প্রাপ্তির সময় অনুযায়ী নকল উত্তোলনের খরচে কম-বেশি হয়।

প্রতারণা ও জালিয়াতি : অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি কমানোর জন্য বা ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের সময় জমির বাস্তব মূল্য দলিলে না লিখে কম মূল্য উল্লেখ করা হয়। এতে নিবন্ধন ফি কমে আসে। কিন্তু এর মাধ্যমে সরকার রাজস্ব হারায়। যেসব ক্ষেত্রে জমির প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত বাজার মূল্যের থেকে বেশি সেসব ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়। অর্থাৎ প্রকৃত মূল্য উল্লেখ না করে নির্ধারিত বাজারমূল্য উল্লেখ করা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত গড় মৌজা মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দেখিয়ে দলিল নিবন্ধন করা হয়। এটি করা হয় মূলত সম্পদ ব্যাংকে বন্ধক রেখে অধিক ঋণ পাওয়ার জন্য। এ ছাড়া সাধারণত জমির শ্রেণি অনুযায়ী জমির মূল্যে পার্থক্য হয়। কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি কম দেওয়ার উদ্দেশ্যে দলিলে জমির প্রকৃত শ্রেণি উল্লেখ না করে অন্য

কোনো শ্রেণি উল্লেখ করা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে নিবন্ধন ফি ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের ধরন পরিবর্তন করা হয়। যেমন সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় হলেও বিক্রয় দলিল না করে হেবা দলিল করা হয় নিবন্ধন খরচ কমানোর জন্য। বাংলাদেশে সম্পত্তির নিবন্ধন 'ফি' উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। ভারতে সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন ফি ও অন্যান্য ফি মিলেয়ে সম্পত্তির মূল্যের ৭-১০ শতাংশ খরচ হয় এবং ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে সম্পত্তির মূল্যের ৫-৭ শতাংশ স্ট্যাম্প ফি ও ১ শতাংশ নিবন্ধন ফি হিসেবে নেওয়া হয়।[৭] সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধন ও অন্যান্য ফি বাবদ সম্পত্তির মূল্যের ওপর যেখানে শ্রীলঙ্কায় ৫ দশমিক ১ শতাংশ, ভারতে ৭ দশমিক ২ শতাংশ লাগে সেখানে বাংলাদেশে ১০ দশমিক ২ শতাংশ ব্যয় হয়।[৮] এ কারণেও দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য কম দেখানো বা প্রকৃত মূল্য গোপন করার প্রবণতা কাজ করে। অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে জাল দলিল প্রস্তুত করে একজনের জমি অপর একজনের নামে নিবন্ধন করা হয়। নিবন্ধনের সময় জালকৃত বিভিন্ন নথিপত্র (জাতীয় পরিচয়পত্র, খতিয়ান, খাজনার দাখিলা) উপস্থাপন, দলিলে দাতার স্বাক্ষর জাল এবং নিবন্ধনের সময় প্রতারণামূলকভাবে এক ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির পরিচয় ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে করা হয়।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা : কিছু ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে না নেওয়া ও গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য যাচাই করা হয় না। যেমন অনেক সময় বণ্টননামা ঠিক না থাকলেও নিবন্ধন হয়ে যায়। দেখা গেছে অধিকাংশ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে (৪১টির মধ্যে ২১টিতে) সাব-রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারী নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত থাকেন না এবং অফিসের কাজ দেরিতে শুরু হয়। দলিল নিবন্ধনের কাজ দেরিতে শুরু হওয়ায় অনেক সেবাগ্রহীতাকে ফেরত যেতে হয় এবং অভিযোগ রয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধনসংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অবৈধ লেনদেন ও এর ভাগ-বাটোয়ারা রাত পর্যন্ত চলে।

প্রভাব বিস্তার : সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে এবং রেজিস্ট্রেশনসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য নানা ধরনের চাপ রয়েছে; বিশেষ করে কিছু ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন করা বা না করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা হয়। এ ছাড়া নকলনবিশদের নিয়োগ ও দলিল লেখকদের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ, তদবির তথা রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। ফলে এই নকলনবিশ, কর্মচারী ও দলিল লেখকরা অনেক বেশি ক্ষমতায়িত অনুভব করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

সময়ক্ষেপণ : সাধারণত একটি দলিল নিবন্ধনের কাজ সম্পূর্ণ হতে অনেক সময় লাগে। দলিল রেজিস্ট্রেশনের পর মূল দলিল পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কখনো কখনো মূল দলিল হাতে পেতে আনুমানিক তিন বা চার বছর সময় লেগে যায়। এর কারণ হিসেবে জানা যায় যে জনবল স্বল্পতা, বালাম সরবরাহের ঘাটতি বা নকলনবিশদের কাজের ধীরগতির জন্য মূল দলিল বালামে উঠতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায়। একইভাবে দলিলের নকল উত্তোলনের জন্য জরুরি ফি দিয়ে

আবেদন করলে নকল পেতে সাত দিন লাগার কথা আর সাধারণ ফি দিয়ে করলে হলে ১৫ দিন। কিন্তু নকলনবিশদের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার পরও তারা সময়মতো দলিলের নকল পান না এবং এই নকল পেতে তাদের ১৫ দিনের বেশি সময় লাগে।

ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি

কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নকলনবিশ নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ : সাব-রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারীর পদোন্নতি ও বদলির জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে তদবির ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে সাব-রেজিস্ট্রারদের নিয়োগ পিএসসির মাধ্যমে হলেও কর্মরত সাব-রেজিস্ট্রারদের একাংশ বিভিন্নভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। যেমন মুজিবনগর সরকার কর্মচারী, বিভাগীয় কোটায় (৫ শতাংশ) প্রধান অফিস সহকারী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুজিবনগর সরকার কর্মচারী নিয়োগ (১৯৭ জন) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের একাংশের বয়স ১৯৭১ সালে ১৮ বছরের কম ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।[৯] আবার বিভাগীয় কোটায় প্রধান অফিস সহকারী থেকে পদোন্নতি পেয়ে যারা সাব-রেজিস্ট্রার হয়েছেন তাদের একাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এইচএসসি পাস ব্যক্তিও সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

অন্যদিকে সাব-রেজিস্ট্রারদের বদলির জন্য নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন, প্রভাব বিস্তার বা তদবির করা হয়। বিশেষ করে পছন্দনীয় স্থানে (যেখানে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা বেশি, জমির অধিক মূল্য ইত্যাদি) বদলির জন্য বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। নিবন্ধন সেবা অধিক দুর্নীতিপ্রবণ হওয়ায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে বদলির বিষয়টি লোভনীয় এবং এ ক্ষেত্রে লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেশি। সাব-রেজিস্ট্রারদের বদলির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে ৩ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা লেনদেন হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এলাকাভেদে নিয়মবহির্ভূত এই অর্থ লেনদেনের পরিমাণ কম বা বেশি হয়। ঢাকা বা এর আশপাশের এলাকায় বদলির জন্য ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

আবার সাব-রেজিস্ট্রার থেকে জেলা রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন, প্রভাব বিস্তার বা তদবিরের অভিযোগ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নকলনবিশ পদে তালিকাভুক্তি এবং নকলনবিশ থেকে স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। নকলনবিশদের তালিকাভুক্তি বা কাজে যোগদানের জন্য ২০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়। এ ক্ষেত্রে মেয়র, সাংসদ, মন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশও প্রয়োজন হয়। আবার নকলনবিশ নিয়োগ জেলা রেজিস্ট্রারের এখতিয়ার হলেও এ ক্ষেত্রে নিবন্ধন অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত ও মনোনয়নই প্রাধান্য পায়। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায় থেকে কোনো চাহিদা না থাকলেও মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর থেকে নিয়োগের সুপারিশ বা অনুমোদন করা হয়। একইভাবে নকলনবিশ থেকে স্থায়ী মোহরার পদে নিয়োগের জন্য এবং কর্মচারীদের বদলি ও পদোন্নতির জন্যও অর্থের লেনদেন ও তদবির হয়। নকলনবিশ থেকে মোহরার পদে যোগদানের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ও নিবন্ধন অধিদপ্তরে সার্বিকভাবে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২ লাখ থেকে ৮ লাখ টাকা দিতে

হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া মোহরার থেকে অফিস সহকারী পদে পদোন্নতির জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে ৩ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা দিতে হয় সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। আবার অফিস সহকারী থেকে প্রধান সহকারী পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম : দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রেও আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক সুপারিশ বা প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন হয়। এই টাকার অংশ দলিল লেখক সমিতি, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং নিবন্ধন অধিদপ্তর পর্যন্ত দিতে হয়। এসব সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবও কাজ করে। এ ছাড়া লাইসেন্স প্রদানের জন্য অনেক তদবিরের পাশাপাশি স্থানীয় সাংসদের সুপারিশ লাগে। এ ছাড়া লাইসেন্স পাওয়ার পর একজন দলিল লেখককে দলিল লেখক সমিতিতে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ২ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট 'ফি' দিয়ে দলিল লেখকদের লাইসেন্স নবায়ন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

দলিল নিবন্ধনের কাজে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের মাত্রা বা প্রবণতা অত্যন্ত বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে একটি যোগসাজশ বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি কিছু সেবাগ্রহীতাকেও এই যোগসাজশের অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের এই যোগসাজশের দুর্নীতির শিকার হতে হয় এবং তাদের জিম্মি করা হয়। অতি সাধারণ ও বৈধ দলিল নিবন্ধনের জন্যও তাদের ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনে বাধ্য করা হয়। দলিল নিবন্ধনে বিদ্যমান দুর্নীতির ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। এটি হচ্ছে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী দলিল লেখকদের জিম্মি করে টাকা নেয় এবং এরা একে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে এবং উভয় পক্ষই লাভবান হয়। অপরদিকে দলিল লেখকরা সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করে টাকা নেয় এবং এখানেও কিছু ক্ষেত্রে উভয়পক্ষই লাভবান হয়। দলিল নিবন্ধনসংক্রান্ত কাজটি যদি অবৈধ, অসাধু বা নিয়মবহির্ভূত উপায়ে করা হয় তখন ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সাধারণ সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি হয়। দলিল নিবন্ধন ফি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সচেতনতারও অভাব রয়েছে। ফলে তারা সহজেই দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবা জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়া সত্ত্বেও এই সেবার যুগোপযোগী মান উন্নয়নে আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। দলিল নিবন্ধন সেবায় আর্থিক দুর্নীতির সাথে নিবন্ধনসংশ্লিষ্ট

সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবিশ ও দলিল লেখকদের একাংশের পারস্পরিক যোগসাজশ থাকায় অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি কাঠামোর কার্যকারিতায় ঘাটতি রয়েছে। ভূমি নিবন্ধনসেবার প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে এবং সেবাগ্রহীতা ও সরকার উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[১০] ভূমিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকার কারণে যথাযথ ভূমি নিবন্ধনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সার্বিকভাবে আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং জবাবদিহি ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে ভূমি দলিল নিবন্ধনসেবায় সুশাসনের ঘাটতি বিদ্যমান।

সুপারিশ

আইনি, পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসংক্রান্ত

১. দলিল নিবন্ধনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইনি ও পদ্ধতিগত সংস্কার এবং আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে-

- ভূমি দলিল নিবন্ধনের পর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস কর্তৃক ল্যান্ড ট্রান্সফার নোটিশ দ্রুত উপজেলা ভূমি অফিসে পাঠানো এবং উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ান দ্রুত হালনাগাদ করে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- নকলনবিশ নিয়োগ বা তালিকাভুক্তিকরণ-সংক্রান্ত নির্দেশনা নিবন্ধন আইনে বিধিবদ্ধ করতে হবে।
- 'সম্পত্তির সর্বনিম্ন বাজারমূল্য নির্ধারণ বিধিমালা-২০১০' সংস্কার করে বাস্তব মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- নিবন্ধন 'ফি' বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং সেবাগ্রহীতাদের সুবিধা বিবেচনা করে যুক্তিসংগতভাবে পুনর্নির্ধারণ (বিশেষ করে কমানোর) করতে হবে।

২. জমির মালিকানা পরিবর্তনের দলিল করার ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার ভূমি, সেটেলমেন্ট অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিস যুক্ত থাকে। দেশের পরিবর্তনশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা সাপেক্ষে যথাযথভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর ও দলিল নিবন্ধনের জন্য সরকারের এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তসমন্বয় বৃদ্ধিতে একক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ লক্ষ্যে ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম ও এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে হবে।

৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে দেশের সব সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

৪. জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী এবং নকলনবিশদের নিয়োগ, কর্মচারীদের বদলি ও পদোন্নতি এবং দলিল লেখকদের লাইসেন্স প্রাপ্তি স্বচ্ছ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে।

৫. জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. দলিল নিবন্ধন, দলিলের নকল তল্লাশি, উত্তোলন এবং নিবন্ধনসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মতো সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

ভূমি নিবন্ধনসেবায় ডিজিটাইজেশন

৭. ভূমি নিবন্ধনসেবা সহজীকরণ, জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত করতে এই সেবা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাইজেশন করতে হবে। এ লক্ষ্যে–

- ই-নিবন্ধনব্যবস্থা দ্রুত চালু করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সব প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- হালনাগাদ রেকর্ড অব রাইটস বা খতিয়ানের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডারের সাথে সমন্বিত থাকবে এবং প্রতিটি নাগরিকের ভূমির বিদ্যমান খতিয়ানের তথ্য প্রদর্শন করবে এবং এই তথ্যভান্ডারে সাব-রেজিস্ট্রারদের তাৎক্ষণিক অভিগম্যতা থাকবে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৮. দলিল নিবন্ধন কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতে আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি ও তালিকা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া নাগরিক সনদ হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করতে হবে এবং অফিস প্রাঙ্গণে তথ্য কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন করতে হবে।

৯. নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা রেজিস্ট্রার, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ওপর নিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিতকরণ, নিবন্ধন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং নিবন্ধন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।

জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

১০. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবিশ ও দলিল লেখকদের কার্যক্রম ও আচরণ নিয়মিত কঠোর তদারকির আওতায় আনতে হবে এবং তাদের জবাবদিহি নিশ্চিতে অফিসে আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি, প্রতিবছর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হালনাগাদ আয় ও সম্পত্তির বিবরণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১১. সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অফিস কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষার

ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আনুষ্ঠানিক ও যথাযথভাবে সুনির্দিষ্ট ফলোআপসহ গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

শুদ্ধাচারচর্চা নিশ্চিতকরণ

১৪. জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবিশ, দলিল লেখক এবং ভূমি দলিল নিবন্ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের যেকোনো অনিয়ম-দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে 'এথিকস কমিটি' গঠন, ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওপরের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, নিবন্ধন অধিদপ্তর, দেশের সব সাব-রেজিস্ট্রার ও জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, নকলনবিশ, দলিল লেখক, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজকে একসাথে কাজ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন*, ২০১৬-২০১৭, বিস্তারিত দেখুন : http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

[২] উপক্রমণিকা, নিবন্ধন ম্যানুয়াল ২০১৪।

[৩] নিবন্ধন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, ২২ আগস্ট ২০১৯।

[৪] বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-২০১৭, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : http://lawjusticediv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lawjusticediv.portal.gov.bd/page/5902d221_c9a4_4ae0_8d4e_005803ddc41a/annual_report_2016_17_draft_copy.pdf

[৫] ৯টি বেজলাইন প্রতিবেদন, টিআইবি, ২০১৫-২০১৭।

[৬] নকলনবিশদের অনুলিপি কাজ বাবদ অর্থ আদায় ও পরিশোধকরণ বিধিমালা, ২০১৮, এসআরও নং-২০০-আইন/২০১৮

৭ https://www.bankbazaar.com/home-loan/property-registration-fees-and-stamp-duty-charges.html

৮ The World Bank, *Expanding Housing Finance to the Underserved in South Asia: Market Review and Forward Agenda*, 2010।

৯ বিস্তারিত দেখুন *শীর্ষ কাগজ*, 'মুজিবনগরের ভুয়া কর্মচারী সাব-রেজিস্ট্রারদের লাগামহীন দুর্নীতি', ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

১০ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪।

ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. জুলকারনাইন ও মো. মোস্তফা কামাল

গবেষণার প্রেক্ষাপট

ডেঙ্গুজ্বর একটি রোগ-সংক্রামক কীটবাহিত ভাইরাসজনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ (Tropical Disease)। এডিস ইজিপটাই ও এডিস এলবোপিকটাস প্রজাতির মশার মাধ্যমে এর সংক্রমণ হয়ে থাকে। ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস সংক্রমণ করে থাকে। ১৯৭০-এর দশকের আগে মাত্র ৯টি দেশের ডেঙ্গু মহামারির অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে গত পাঁচ দশকে খুব দ্রুত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ বর্তমানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।[১] ডেঙ্গুতে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা জানা না গেলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্কলিত তথ্যমতে প্রতিবছরে প্রায় ১০০টি দেশে ৫০-১০০ মিলিয়ন (৫-১০ কোটি) মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তিসহ অন্যান্য চিকিৎসার প্রাক্কলিত খরচ প্রায় ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা।[২]

চিত্র ১ : বাংলাদেশে ডেঙ্গুপ্রবণতা (২০০০-২০১৯)

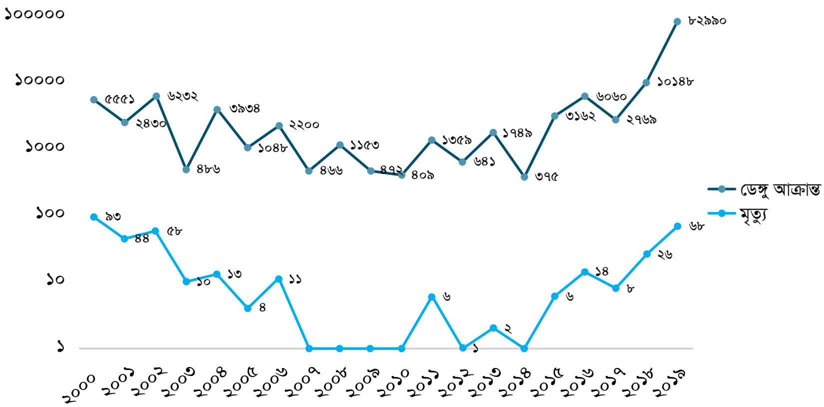

তথ্যসূত্র : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

---

* ২০১৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গুজ্বরের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। তবে প্রথম ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব হয় ২০০০ সালে। এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৫ হাজার ৫৫১ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৯৩।[৩] বাংলাদেশে ডেঙ্গু একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত বর্ষা মৌসুম (মে-আগস্ট) এবং বর্ষা পরবর্তী মৌসুম (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) হলেও ২০১৪ সাল থেকে এর ধরন পরিবর্তিত হয়ে প্রাক-বর্ষা মৌসুমেও (জানুয়ারি-এপ্রিল) ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে। ২০১৫-১৭ সালে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এর আগের ১৪ বছরে আক্রান্তের সংখ্যার চেয়ে সাত গুণ বেশি।[৪] বাংলাদেশে এডিস মশার মাধ্যমে ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়ারও ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ বছর মোট ১৩ হাজার ৮১৪ জন চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়।[৫]

সারণি ১ : সরকারি হিসাব অনুযায়ী মাসভিত্তিক ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা (২০০৮- সেপ্টেম্বর ২০১৯)

মাস	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
২০০৮	০	০	০	০	০	০	১৬০	৪৭৩	৩৩৪	১৮৪	০	০	১১৫১
২০০৯	০	০	০	০	১	০	৪	১২৫	১৮৮	১৫৪	০	০	৪৭২
২০১০	০	০	০	০	০	০	৬১	১৮৩	১২০	৪৫	০	০	৪০৯
২০১১	০	০	০	০	০	৬১	২৫৫	৬৯১	১৯৩	১১৪	৩৬	৯	১৩৫৯
২০১২	০	০	০	০	০	১০	১২৯	১২২	২৪৬	১০৭	২৭	০	৬৪১
২০১৩	৬	৭	৩	৩	১২	৫০	১৭২	৩৩৯	৩৮৫	৫০১	২১৮	৫৩	১৭৪৯
২০১৪	১৫	৭	২	০	৮	৯	৮২	৮০	৭৬	৬৩	২২	১১	৩৭৫
২০১৫	০	০	২	৬	১০	২৮	১৭১	৭৬৫	৯৬৫	৮৬৯	২৭১	৭৫	৩১৬২
২০১৬	১৩	৩	১৭	৩৮	৭০	২৫৪	৯২৬	১৪৫১	১৫৪৪	১০৭৭	৫২২	১৪৫	৬০৬০
২০১৭	৯২	৫৮	৩৬	৭৩	১৩৪	২৬৭	২৮৬	৩৪৬	৪৩০	৫১২	৪০৯	১২৬	২৭৬৯
২০১৮	২৬	৭	১৯	২৯	৫২	২৯৫	৯৪৬	১৭৯৬	৩০৮৭	২৪০৬	১১৯২	২৯৩	১০১৪৮
২০১৯	৩৮	১৮	১৭	৫৮	১৯৩	১৮৮৪	১৬২৫৩	৫২৬৩৬	১১৮৩৯	-	-	-	৮২৯৯০

তথ্যসূত্র : রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং জুন মাস থেকে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্যমতে জুলাই মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১৬ হাজার ২৫৩। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৮২ হাজার ৯৯০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৬৮। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই সংখ্যা শুধু হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সংখ্যা বিবেচনা করে; ঢাকায় সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সব মিলিয়ে মাত্র ৪১টি হাসপাতালের তথ্য এবং ৬৪টি জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক পাঠানো তথ্য সংকলন করা হয়। যেহেতু ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অল্প কয়েকটি হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেই হিসাবে আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক লাখ বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। সরকারি হিসাবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া

রোগীদের মধ্যে ঢাকায় ৫৪ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ঢাকার বাইরের হাসপাতালে ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) কাছে ডেঙ্গু সন্দেহে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০৩ জনের মৃত্যুর তথ্য পাঠানো হয়, এর মধ্যে আইইডিসিআর ১১৬ জনের মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে ৬৮ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত হয়।[৬] যদিও বেসরকারি তথ্যমতে মৃতের সংখ্যা ২২৩ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)।[৭]

গবেষণার যৌক্তিকতা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩-এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডসসহ অবহেলিত সব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের মহামারি নির্মূল করা এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জারি রাখতে হবে।[৮] এ ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক কৌশল ২০১২-২০'-এর লক্ষ্যমাত্রায় ২০১৫ সালের মধ্যে সদস্য দেশগুলোর ডেঙ্গু রোগের প্রকৃত বোঝা প্রাক্কলন (True disease burden) করা, ২০২০ সালের মধ্যে ডেঙ্গু মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ এবং রোগের হার ২৫ শতাংশ হ্রাস করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[৯] এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বাংলাদেশে তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যেকোনো প্রাদুর্ভাবে সাময়িকভাবে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা আর চলমান রাখা হয় না।

২০১৯ সালে বাংলাদেশে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া ডেঙ্গুর ব্যাপকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশ কর্তৃক প্রথম দিকে এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার, যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, জরুরি পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট (এনএস১ টেস্ট কিট), মশক নিধন যন্ত্র, জনস্বাস্থ্য কীটনাশক, রোগ-নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সিন্ডিকেটের সক্রিয় হওয়ার বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একইভাবে ২০১৭ সালে চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবের সময়ও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকায় ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও এবং গত কয়েক বছরের অন্যতম রোগের বোঝা হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না তা নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবির কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত, স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন গবেষণার ধারাবাহিকতায় ডেঙ্গুকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা এবং এ সংশ্লিষ্ট সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে তা পর্যালোচনা করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যেসব অংশীজন ও

নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের মধ্যকার সমন্বয় পর্যালোচনা করা এবং এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

ঢাকা শহরের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ এ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং তাদের মধ্যকার সমন্বয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় যেসব কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস
- মশা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
- মশা নিধন জনবল ও উপকরণে চাহিদা নিরূপণ এবং ক্রয় প্রক্রিয়া
- কীটনাশকের মান পরীক্ষা, কীটনাশক নিবন্ধন
- মাঠপর্যায়ে কীটনাশক প্রয়োগ
- মাঠপর্যায়ের জনবল ও যন্ত্রপাতি
- মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- মশ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়।

গবেষণাপদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, মশক নিবারণী দপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটনাশক আমদানিকারক, বিক্রয় ও উৎপাদনকারী এবং বেসরকারি বালাই বা কীট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক প্রমুখ ব্যক্তির কাছ থেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২০ আগস্ট ২০১৯ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের (২০১৫ হতে ২০১৯ সাল) মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

ঢাকা শহরের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান অংশীজন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং এ ক্ষেত্রে তাদের যে কার্যক্রম তা চিত্র ২-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

চিত্র ২ : মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন : স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯-এর একটি সংশোধনের মাধ্যমে ২০১১ সাল থেকে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে বিভক্ত করা হয়। এই আইন অনুসারে সিটি করপোরেশনের অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে– সিটি করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ করা, নগরীতে সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান কল্পে স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ উভয় সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের মশক নিধন বা নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে শহরের মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ মশার উৎসস্থল নির্মূলের কাজে সহায়তা করে থাকে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে অনুমোদিত ২৮০ জন মশা নিধনকর্মীর মধ্যে বর্তমানে ২৭০ জন কর্মী আছে। মশা নিধনকর্মীদের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৪ জন মশক সুপারভাইজার রয়েছে। পক্ষান্তরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডভিত্তিক মশক কর্মীর সংখ্যা ৪০৯ এবং মশক সুপারভাইজারের সংখ্যা ২০। সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগের মাধ্যমে কীটনাশক, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, কীটনাশক নির্বাচন ও ক্রয় এবং এর মান পরীক্ষা করা হয়।

সারণি ২ : একনজরে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বিষয়	উত্তর সিটি করপোরেশন	দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
মোট ওয়ার্ড	৫৪ (৩৬ পুরোনো+১৮টি নতুন)	৭৫ (৫৭ পুরোনো+১৮টি নতুন)
আয়তন	৮২.৬৩৮ ব.কি.	১০৯.২৫১ ব.কি.
জনসংখ্যা	৩৯,৫৭,৩০২	৩৮,৮৩,৪২৩
হোল্ডিং সংখ্যা	১৭২,২৫৪	১৬৫,০০০
মশক নিয়ন্ত্রণ বাজেট ২০১৯-২০	৪৯.৩ কোটি টাকা	৪৩.৩ কোটি টাকা
মশক নিয়ন্ত্রণ বাজেট ২০১৮-১৯	২১.০ কোটি টাকা (সংশোধিত ১৭.৫)	২৬.০ কোটি টাকা (সংশোধিত ১৯.৫২)
মশক নিয়ন্ত্রণ ব্যয় (২০১৮-১৯)	মোট ব্যয় ১৭.৫ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৪.০ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ১.৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ২.০ কোটি টাকা)	মোট ব্যয় ১৯.৫২ কোটি টাকা (কীটনাশক ১৭.৩৯ কোটি টাকা, কচুরিপানা ও আগাছা পরিষ্কার ০.২৫ কোটি টাকা, ফগার/হুইল/স্প্রে মেশিন পরিবহন ১.৮৮ কোটি টাকা)
যন্ত্রপাতি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৪৫৯টি (নতুন ক্রয় ৪৬৩) ফগিং মেশিন-৩২২টি (নতুন ক্রয় ২০০টি) হুইলব্যারো মেশিন-১০টি	হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৪৯৮টি ফগিং মেশিন-৩২৯টি হুইলব্যারো মেশিন-১৭টি
মশক নিধনকর্মী	২৭০ (অনুমোদিত ২৮০ জন)	৪০৯
বার্ষিক ব্যবহৃত কীটনাশক	অ্যাডাল্টিসাইড-৩৪৯,০০০ লিটার লার্ভিসাইড-২৭৯৯ লিটার	অ্যাডাল্টিসাইড-২.২ লাখ লিটার (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯) লার্ভিসাইড- ১৮১৫ লিটার (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯)

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর : স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচির (এইচপিএনএসপি ২০১৭-২২) রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (সিডিসি) কর্মপরিকল্পনায় এডিসবাহিত রোগ (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা) নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৭-২২-এর মধ্যে যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– রোগসংক্রমাক কীটের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, খসড়া জাতীয় কৌশল প্রণয়ন এবং এর হালনাগাদকরণ, এডিস মশার জরিপকার্য পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস করা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা রোগের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা এবং এসব রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য প্রচারণা এবং কমিউনিটির সক্রিয় সম্পৃক্ততা তৈরি করা।[১০] এর অংশ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহায়তায় রোগ নিয়ন্ত্রণ

শাখা ২০১৭ সাল থেকে বছরে তিনবার (প্রাক-বর্ষা মৌসুম, বর্ষা মৌসুম ও বর্ষা-পরবর্তী মৌসুম) এডিস মশার জরিপকার্য পরিচালনা করে আসছে। যদিও তারা ২০১৩ সাল থেকে বছরে একবার করে এডিস মশার জরিপ করত।[১১]

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (ধারা ৪) অনুসারে বালাইনাশকের আমদানি, উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন, মোড়কজাতকরণ, বিক্রয় ও বিক্রয়ের প্রস্তাবের জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে ওই পণ্যের ব্র্যান্ডের জন্য নিবন্ধন করতে হয় এবং লাইসেন্স নিতে হয়। মশা নিধনের কাজে ব্যবহৃত সব জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কীটনাশক এই দপ্তরের কাছে নিবন্ধিত হতে হয়। এবং এই দপ্তরের নিবন্ধিত কীটনাশক ও এর আমদানিকারক এবং উৎপাদকেরাই শুধু সিটি করপোরেশনের ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সিটি করপোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের পর নিবন্ধন অনুযায়ী এর উপাদান সঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করাতে এই দপ্তরের কাছে কীটনাশকের নমুনা পাঠিয়ে থাকে। এ ছাড়া সিটি করপোরেশন বিভিন্ন সময়ের কীটনাশক ক্রয়-সম্পর্কিত কমিটিগুলোতে এই দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) : রোগতত্ত্ব ও সংক্রামক রোগ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর সাথে সাথে পরজীবী ও রোগ সংক্রামক কীটবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৬ সালে সংসদে একটি বিল অনুমোদনের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব নজরদারি করে থাকে। উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অধীনে বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কীটনাশকের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কীটতত্ত্ব বিভাগ কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করে থাকে। এ ছাড়া সিটি করপোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআরের কাছে কীটনাশকের নমুনা পাঠিয়ে থাকে।

মশক নিবারণ দপ্তর : স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে এটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে চলে যায় এবং ১৯৮১-৮২ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসার পর সরাসরি সিটি করপোরেশনের অধীনে কাজ করছে। মশা নিয়ন্ত্রণে এই দপ্তরের সরাসরি কোনো কার্যক্রম নেই। এই দপ্তরের বর্তমান কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৮০, যারা দুই ভাগ হয়ে দুই সিটি করপোরেশনের মশক নিধনকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। এ ছাড়া দুই সিটি করপোরেশনের ক্রয় করা কীটনাশক রাখার পণ্যাগার হিসেবে এর অবকাঠামো ব্যবহৃত হচ্ছে।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ২০১৯ সালে গৃহীত উদ্যোগ

২০১৯ সালে জুন-জুলাই মাসে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়ার পর গণমাধ্যমের চাপে এবং উচ্চ আদালতের অসন্তুষ্টির পর ডেঙ্গুর ব্যাপকতাকে স্বীকার করে দুই সিটি করপোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন কিছুটা বিলম্বে হলেও নিচের উদ্যোগ গ্রহণ করে :

- অকার্যকর কীটনাশক সরবরাহ করায় এবং নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন ধরে কীটনাশক সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে উত্তর সিটি করপোরেশন কর্তৃক ৫ মাসের জন্য কালো তালিকাভুক্তিকরণ (জুলাই ২০১৯);
- উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিতর্কিতভাবে বন্ধ রাখা কিছু জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের আমদানি প্রক্রিয়া পুনরায় উন্মুক্তকরণ (জুলাই ২০১৯);
- নতুন কীটনাশক ক্রয়ের জন্য উভয় সিটি করপোরেশন বহিঃস্থ কীটতত্ত্ববিদ, অন্যান্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞসহ সিটি করপোরেশনের মশক নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন (জুলাই ২০১৯);
- বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা (আগস্ট ২০১৯); যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে কীটতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রেষণে উত্তর সিটিতে প্রেরণ; ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য 'ওয়ার্ড ডেঙ্গু প্রতিরোধ সেল' গঠন;
- বিদ্যমান কীটনাশকের অকার্যকারিতার কারণে নতুন কীটনাশক আমদানি ও প্রয়োগ (আগস্ট ২০১৯);
- ডেঙ্গু মশার উৎস ধ্বংস করার জন্য 'চিরুনি অভিযান'; ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও জরিমানা (আগস্ট ২০১৯); এবং
- বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

এডিস মশা জরিপ ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস

ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব ২০০০ সাল থেকে শুরু হলেও ২০১৪ সাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা এডিস মশার ঘনত্ব নির্ণয়ের জরিপকার্য পরিচালনা করে থাকে এবং ২০১৭ সাল থেকে বছরে তিনবার জরিপ (প্রাক-বর্ষা মৌসুম, বর্ষা মৌসুম ও বর্ষা-পরবর্তী মৌসুম) করা হয়। ঢাকা শহরের দুই সিটি করপোরেশনের ৯৮টি ওয়ার্ডের ১০০টি এলাকায় পরিচালিত জরিপগুলোতে বছরজুড়ে এডিস মশার লার্ভা ও পিউপার উচ্চ ঘনত্ব দেখা যায়।

২০১৯ সালের প্রাক-বর্ষা মৌসুম (৩-১২ মার্চ) এডিস মশার জরিপে বলা হয়েছিল জরিপকৃত ১০০টি এলাকার মধ্যে ৮৬ শতাংশ স্থানে এডিস মশা অত্যান্ত বেশি। এই জরিপে ব্যবহৃত ব্রুটো ইনডেক্সে (Breteau Index) দেখা যায় ঢাকা উত্তরের এডিস মশার লার্ভার গড় ঘনত্ব ছিল ২১ এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের গড় ঘনত্ব ছিল ২৬-এর অধিক। এই জরিপের ফলাফলে এডিসের ঘনত্ব ক্ষতিকর মাত্রার চেয়ে বেশি বলে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা হলেও তখন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরে বর্ষা মৌসুম জরিপের (১৭-২৭ জুলাই) দেখা যায় এডিস মশার লার্ভার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়ে উত্তর সিটিতে ৫৭ ও দক্ষিণে ৭৯ হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ণবয়স্ক

মশার সংখ্যা প্রাক-বর্ষা মৌসুমের চেয়ে (৩৬টি) বর্ষা মৌসুমে (২০৭টি) কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।

এই দুই জরিপের বাইরে ৩১ জুলাই-৪ আগস্ট ২০১৯ সময়কালে করা রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বিশেষ জরিপে ঢাকা শহরের ১৪টি এলাকার মধ্যে ১২টিতে ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি মশার লার্ভা পাওয়া যায়। একটি এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি পাত্রে লার্ভা পাওয়া গেলে পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় অথচ এই জরিপে পাঁচটি স্থানে ৮০ শতাংশের বেশি পাত্রে লার্ভা পাওয়া গেছে।[১২] এই পাঁচটি এলাকা হচ্ছে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমলাপুর বিআরটিসি বাস ডিপো, কমলাপুর রেলওয়ে কলোনি, মহাখালী বাস টার্মিনাল ও শাহজাহানপুর বস্তি। রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার এই জরিপ কার্যক্রম শুধু ঢাকা শহরকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে ঢাকার বাইরের এডিস মশার ঘনত্ব জানা যায় না ও ডেঙ্গু রোগের পূর্বাভাস পাওয়া যায় না।

কীটনাশকের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা ও সতর্কতা

বাংলাদেশে *এডিস ইজিপ্টাই* মশার কোন কোন কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধী ক্ষমতা (Resistance) তৈরি হয়েছে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ (ICDDR,B) একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই গবেষণায় কোন কীটনাশক কার্যকারিতা হারিয়েছে এবং কোন কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য রয়েছে (Susceptibiltiy) তা এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়। অভি ট্র্যাপের মাধ্যমে ঢাকা শহরের নয়টি এলাকা এবং টাঙ্গাইল, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বান্দরবান জেলার দুটি করে এলাকা থেকে এডিস মশার ডিম সংগ্রহ করা হয়। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত বোতল বায়োসে (Bottle bioassay) পদ্ধতি ব্যবহার করে পারমিথ্রিন (পাইরিথ্রয়েড), ডেল্টামিথ্রিন (পাইরিথ্রয়েড), ম্যালাথিউন (অর্গানোফসফেট) ও বেন্ডিওকার্ব (কার্বামেট) এই চারটি কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা ও মশক নিধনের সামর্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মাত্রা অনুসারে প্রতিরোধী শক্তি ও মশকনিধনের সামর্থ্য পরীক্ষায় যদি ৯৮ থেকে শত ভাগ মশা মারা যায় তাহলে ওই কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য আছে, যদি ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ মশা মারা যায় তাহলে ওই কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এ ক্ষেত্রে কীটনাশকের ডোজ ২/৫/১০ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং যদি ৯০ শতাংশের কম মশা মারা যায় তাহলে এই কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী শক্তি তৈরি হয়েছে বলে ধরা হয়।

দেখা যায় প্রায় সব এলাকার মশার পারমিথ্রিনে প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এই কীটনাশকে মশার মৃত্যুহার পাওয়া যায় ০-১৪.৮ শতাংশ এবং ডোজ দ্বিগুণ করলে মৃত্যুহার হয় ৫ দশমিক ১ থেকে ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ। ডেল্টামেথ্রিন এবং ম্যালাথিউন এলাকাভেদে কার্যকর এবং বেন্ডিওকার্ব সব এলাকায় কার্যকর হিসেবে দেখা যায়। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কীটনাশকের যে মিশ্রণটি (পারমিথ্রিন+টেট্রামিথ্রিন+প্রালেথ্রিন) মশা নিধনের কাজে ব্যবহার করে তার মধ্যে কিলিং এজেন্ট হচ্ছে পারমিথ্রিন।

আইসিডিডিআরবি তাদের গবেষণা ফলাফল ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সিডিসি, ইউএসএ এবং গবেষক ও কীটতত্ত্ববিদদের নিয়ে ২০১৮ সালের মে মাসে একটি সভার মাধ্যমে প্রকাশ করে। তারা সেখানে সুপারিশ করে যে, যেহেতু পারমিথ্রিনে মশার উচ্চমাত্রার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে সেহেতু এই কীটনাশক পরিবর্তন করে বেন্ডিওকার্ব ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু বেন্ডিওকার্ব বাংলাদশে নিবন্ধিত নয় সেহেতু বেন্ডিওকার্ব বাংলাদেশে নিবন্ধিত না হওয়া পর্যন্ত ডেল্টামিথ্রিন বা ম্যালাথিউন ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নিবন্ধিত কীটনাশকের প্রতিরোধী ক্ষমতা পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং বিকল্প কী কী কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করার সুপারিশ করা হয়।[১৩]

আগাম পূর্বাভাস ও গবেষণাকে গুরুত্ব না দেওয়া

জাতীয় নির্বাচনের বছর হওয়ার কারণে আইসিডিডিআরবির গবেষণার ফলাফল প্রকাশের সভায় একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এই গবেষণা তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ না করার জন্য বলেন। আইইডিসিআর ও আইসিডিডিআরবিকে এ বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে বলেন এবং এই কীটনাশক কিউলেক্স মশার ক্ষেত্রে কার্যকর কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। আইসিডিডিআরবি কিউলেক্স মশার ওপর পরীক্ষা করে দেখেছে যে এটা কিউলেক্সের জন্যও কার্যকর নয়। আইসিডিডিআরবির প্রতিবেদনকে গুরুত্ব না দিয়ে পরবর্তী সময়ে কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী শক্তি পরীক্ষা না করেই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন যথাক্রমে (জ্বালানিসহ) ১৪ কোটি এবং ১৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার একই কীটনাশক (পারমিথ্রিনসহ সংমিশ্রণ) পুনরায় ক্রয় করে। পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর আইসিডিডিআরবির এই প্রতিবেদন জুন মাসের শেষের দিকে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার প্রাক-বর্ষা মৌসুম জরিপের ফলাফলে এডিস মশার লার্ভার উচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গেলে এ বিষয়ে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সতর্ক করা হয় যে যদি কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে মশা নিয়ন্ত্রণ এবং তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা না হয়, তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। কিন্তু এডিস মশা নির্মূলের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে জুন মাস থেকে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং জুলাই থেকে মহামারি আকারে দেখা গেলেও সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ না করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একাংশ এ বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিতে থাকে এবং কেউ কেউ একে 'গুজব' হিসেবে অভিহিত করে। এ বছরসহ বিগত বছরগুলোতেও 'ডেঙ্গু মশার প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র মানুষের ঘরের ভেতরে, এ ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনের কিছু করার নেই' ইত্যাদি মন্তব্য করা হয়। কারও বাসায় মশা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। যদিও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বিশেষ মশা জরিপে সবচেয়ে বেশি এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যায় বাস টার্মিনাল, বাস ডিপোর পরিত্যক্ত টায়ারে, রেলস্টেশনে, সরকারি হাসপাতালে ইত্যাদি জনসমাগম স্থলে।

সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীর ভিড়, গণমাধ্যমের চাপে ও উচ্চ আদালত কর্তৃক সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশের পর দুই সিটি করপোরেশন ডেঙ্গু রোগের ব্যাপকতাকে স্বীকার করে নিয়ে কিছু কার্যক্রম শুরু করে।

ডেঙ্গুর প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি

বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে ২০০০ সাল থেকে। প্রতিবছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই অধিক আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ঢাকা শহরে দুটি সিটি করপোরেশন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের এ ধরনের কোনো কার্যক্রম নেই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দৈনিক ডেঙ্গু স্ট্যাটাস রিপোর্টের '২০১৯ সালের ডেঙ্গু ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর তথ্যে' ঢাকায় সব সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৪১টি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগী এবং ৬৪ জেলার সিভিল সার্জন কর্তৃক পাঠানো তথ্য সংকলন করা হয়। এ ক্ষেত্রে তারা শুধু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার রোগীর সংখ্যা বিবেচনা করে থাকে। রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলো থেকে পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া ডেঙ্গু রোগী যারা আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হয়নি, তাদের তথ্য সংকলন করা হয়নি।[১৪] উল্লেখ্য, ঢাকায় শুধু বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যাই প্রায় ৬ শতাধিক এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার।[১৫]

এ ছাড়া ডেঙ্গু রোগে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন ২০৩টি তথ্য এসেছে, তার মধ্যে তারা ১১৬টি তথ্য পর্যালোচনা করে ৬৮টি মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত হয়েছে।[১৬] যদিও বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ২২৩ জন।[১৭] এ ছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একাংশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে দেখানোর চেষ্টা করেন যে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও তাদের 'হেলথ বুলেটিন : বাংলাদেশ ডেঙ্গু পরিস্থিতি ২০১৯'-এর প্রথমেই ডেঙ্গুর বৈশ্বিক পরিস্থিতি দেখায়। এ ক্ষেত্রে শুধু গুটিকয়েক হাসপাতালের খণ্ডিত পরিসংখ্যান দিয়ে অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু আক্রান্তের হারের সাথে তুলনামূলক চিত্র দিয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতির মাত্রা কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

দেশব্যাপী ডেঙ্গু রোগের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত করতে না পারার কারণে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নিধারণ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, কলকাতার পৌরসংস্থানে প্রতি ওয়ার্ডে দুজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী রয়েছেন যার কাজ হচ্ছে ওই ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া এবং ডেঙ্গু রোগী সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম ওই এলাকায় গিয়ে সেখানকার ডেঙ্গু প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিত ও ধ্বংস করে।[১৮]

জাতীয় নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা না থাকা

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৭-২২-এ সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার (সিডিসি) কর্মপরিকল্পনায় এডিসবাহিত রোগ (ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা) নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– এডিস মশার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, খসড়া জাতীয় কৌশল প্রণয়ন এবং এর হালনাগাদকরণ, এডিস মশার জরিপকার্য পরিচালনা করা এবং ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস করা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা রোগের ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা এবং এসব রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য প্রচারণা করা এবং কমিউনিটির সক্রিয় সম্পৃক্ততা তৈরি করা।[১৯] এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করার কথা তা খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ফলে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে এডিস নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নেই। এ ছাড়া এ বিষয়ে সিটি করপোরেশনের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও নেই।

এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা না থাকা

জরুরি ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে দুই সিটি করপোরেশন মশক নিধনকর্মীদের ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করলেও অন্য সময়ে ওয়ার্ডভিত্তিক বা আঞ্চলিক পর্যায়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনায় এবং তা ঘাটতি ছিল।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সব পদ্ধতির সমন্বয় না করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রামক কীটের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা হ্যান্ডবুকে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে :[২০]

পরিবেশগত পদ্ধতি (environmental) : যার মধ্যে রয়েছে এডিস মশার উৎসস্থল বা প্রজনন ক্ষেত্র নির্মূল করা;

যান্ত্রিক পদ্ধতি (mechanical) : মশা ধরার ফাঁদ ব্যবহার;

জৈবিক পদ্ধতি (biological) : প্রাকৃতিকভাবে মশার শুককীট নিধন করা, গাপ্পিফিশ, ব্যাকটেরিয়া, বোটানিক্যাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি এবং

রাসায়নিক পদ্ধতি (chemical) : রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে মশা নিধন করা (অ্যাডাল্টিসাইড, লার্ভিসাইড), বায়োর‍্যাশনাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি।

রাসায়নিক পদ্ধতি ছাড়া আর সব পদ্ধতিতেই জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে পরিবেশগত ব্যবস্থানপার ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততার বেশি প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে শুধু রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও বাকি পদ্ধতিগুলো সিটি করপোরেশনের পরিকল্পনায় ও বাজেটে কখনোই রাখা হয়নি।

দুই সিটি করপোরেশনই শুধু সাধারণ কিউলেক্স মশাকে লক্ষ্য করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে এডিস মশার উৎস নির্মূল বা প্রজনন ক্ষেত্র

ধ্বংস করা। কিন্তু এ বছরের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের আগে এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য কোনো কার্যক্রম নেওয়া হয়নি। দুই সিটি করপোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ বা নিধন কার্যক্রম অধিকাংশ সময়ই অ্যাডাল্টিসাইডনির্ভর (পূর্ণবয়স্ক মশা নিধন)। লার্ভিসাইড (মশার শুককীট নিধন) মাঝে মাঝে প্রয়োগ করা হলেও তা নিয়মিত ছিল না। বিশেষজ্ঞমতে অ্যাডাল্টিসাইড ৩০ শতাংশ এবং লার্ভিসাইড ৮০ শতাংশ কার্যকর। তবে অ্যাডাল্টিসাইডের চেয়ে লার্ভিসাইড এবং প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করা সহজ, অনেক বেশি কার্যকর ও স্বল্প খরচের হলেও দুই সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম সব সময় অ্যাডাল্টিসাইডকেন্দ্রিক; এর কারণ হচ্ছে– প্রথমত, এই কার্যক্রম মানুষের নজরে বেশি পড়ে এবং দ্বিতীয়ত, এই কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি এবং দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয় (কারণ এ ক্ষেত্রে কীটনাশক, ফগার মেশিন ও মেশিন চালানোর জন্য জ্বালানি প্রয়োজন হয়)।

উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ না করা

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োজন তার মধ্যে শুধু রাসায়নিক পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে থাকে। এই একটিমাত্র পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ ও এর চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কীটনাশকের জৈবিক কার্যকারিতা, কীটনাশকের প্রতি মশার প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হওয়া, কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য, কীটনাশকের ব্যবহার পদ্ধতি, স্বাস্থ্যঝুঁকি, পণ্যের নিবন্ধন, পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার, বণ্টন ও মজুতের সামর্থ্য, পণ্যের মূল্য ছাড়াও পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করা প্রয়োজন হলেও দুই সিটি করপোরেশনই এসব বিষয় বিবেচনা না করেই কীটনাশক নির্ধারণ করে থাকে।

এই সব বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ করার জন্য ২০১৭ সালে একটি কমিটি করা হয়েছিল যেখানে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, আইন কর্মকর্তা ও পাঁচজন কাউন্সিলর, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) কীটতত্ত্ব বিভাগের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের একজন উপপরিচালক ছিলেন। কিন্তু এই কমিটি পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে কার্যকর ছিল না। এই বছরে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পর আবারও উভয় সিটি করপোরেশনে একটি করে কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি করা হয়েছে, যেখানে সিটি করপোরেশনের মেয়র, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার প্রতিনিধি, আইইডিসিআরের প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবির প্রতিনিধি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের প্রতিনিধি, কীটতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়া দুই সিটি করপোরেশনের একটিতেও কীটতত্ত্ববিদ নেই। কীটতত্ত্ববিদ ছাড়াই কীটনাশক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কীটনাশকের কার্যকারিতা নিয়ে আইসিডিডিআরবির গবেষণাকেও আমলে নেওয়া হয়নি। কীটনাশক প্রয়োগের মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়, কারণ মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে এর যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না।

পণ্যের চাহিদা নিরূপণ বা প্রাক্কলন

রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বছরের কীটনাশকসহ বিভিন্ন উপকরণের চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশনের আয়তন, রোগের প্রাদুর্ভাব, বিগত বছরের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন হলেও দুই সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ক্রয়ের পরিমাণের তারতম্য লক্ষ করা যায় (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : দুই সিটি করপোরেশনের কীটনাশক বাবদ বার্ষিক ব্যয়

অর্থ বছর	কীটনাশক ক্রয় (কোটি টাকায়)	
	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন	ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
২০১৬-১৭ (সংশোধিত)	তথ্য পাওয়া যায়নি	১৫.৯৬
২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	১৫.০	১২.০
২০১৮-১৯ (সংশোধিত)	১৪.০	১৭.৩৯
২০১৯-২০ (বাজেট)	৩০.০	৩৮.০

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে (২০১৯-২০) বিশেষ কোনো কর্মসূচি না রেখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের বাজেট প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। পক্ষান্তরে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কোনো কোনো বিশেষ কার্যক্রম (যেমন আইটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণ) তাদের বাজেটে রাখলেও কীটনাশকের বাজেট তারাও প্রায় দ্বিগুণ করেছে, যদিও শুধু কীটনাশক প্রয়োগ করে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে অনিয়ম

প্রতি অর্থবছরের শুরুতে ক্রয়কারী কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব বাজেটের জন্য অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওই প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।[২১] এ ছাড়া ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথাও বলা হয়েছে।[২২] ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কীটনাশক ও মশা নিধন উপকরণের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউর ওয়েবসাইটে থাকলেও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের এ বিষয়ক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না। উল্লেখ্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ক্রয় পরিকল্পনায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

দরপত্রের দলিল প্রস্তুতিতে অনিয়ম

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় যথাসময়ে শেষ করতে না পারার কারণে নভেম্বর ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত কীটনাশকশূন্য

ছিল। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন সিপিটিইউ পরিচালিত ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে মশক নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত যে উন্মুক্ত দরপত্রগুলো দেয় তাতে দেখা যায়, দরপত্রে কীটনাশক বা কীটনাশকের উপাদান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া নেই, দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোনোটিতে কীটনাশকের পরিমাণের কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো কোনোটিতে ছিল না এবং দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা কী হবে তা কোনোটিতে ছিল এবং কোনোটিতে ছিল না। যদিও সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী চাহিদাকৃত পণ্যের বিস্তারিত বিনির্দেশের (specification) বিবরণ দলিলে, দরপত্রে বা প্রস্তাব দলিলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[২৩] সিটি করপোরেশন যেহেতু দরপত্রে কীটনাশকের বিনির্দেশের বিবরণ দিচ্ছে না, সেহেতু একই ধরনের কীটনাশক ১০-১২ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া কীটনাশকের বিবরণে শুধু ব্যবহার উপযোগী তৈরি পণ্য চাওয়া হয়, ফলে তৈরি কীটনাশকে ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানের মাত্রা কম দিলেও কম দরের কারণে কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ থাকে।

দরপত্র পদ্ধতিতে অনিয়ম

সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বা মূল্য-সীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হলে, পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি সবার আগে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।[২৪] এ ক্ষেত্রে উত্তর সিটি করপোরেশন সিপিটিইউ পরিচালিত ইজিপি পোর্টালের মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মশা নিয়ন্ত্রণের কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কীটনাশক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে না গিয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ সিটি করপোরেশন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জকে সরাসরি কীটনাশক ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তারা এই সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৩৭৮ টাকা লিটার দরে ৭ লাখ লিটার অ্যাডাল্টিসাইড এবং ৪ হাজার লিটার লার্ভিসাইড ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করে। কিন্তু 'বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) আইন, ২০১৮' অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অধীনে কীটনাশকের কোনো ব্র্যান্ডের নিবন্ধন ছাড়া কোনো কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণ, পুনঃমোড়কজাতকরণ, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব ও মজুত অথবা কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।[২৫] ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের কোনো ব্র্যান্ড আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত নয়।

সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্য সম্পাদন, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য পেশাগত, কারিগরি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা, সন্তোষজনকভাবে পণ্য উৎপাদন ও তৈরির সামর্থ্য, বিক্রয়-পরবর্তী সেবা প্রদানের সুবিধা থাকতে হবে বলা হলেও এ বিষয়ে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, কারিগরি বা ব্যবস্থাপনা জ্ঞান নেই।[২৬] এই বিধিমালা অনুযায়ী ক্রয়কারী কেবল একজন সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে দরপত্র

দাখিলের জন্য যেসব শর্তে আহ্বান জানাতে পারবে সেগুলো হচ্ছে[২৭]–

- যদি পেটেন্ট, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ও একক স্বত্বাধিকারের কারণে একই ধরনের পণ্য প্রস্তুতকরণে অন্যদের নিবৃত্ত রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে একক স্বত্বাধিকারভুক্ত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কেবলমাত্র একক স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকেই ক্রয়ের ক্ষেত্রে;
- কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী ওই উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী বা পরিবেশকের কাছ থেকে জটিল ধরনের প্ল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ ক্রয় করতে হবে মর্মে কোনো পূর্বশর্ত থাকলে;
- যেসব পণ্য কোনো একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় এবং যার এমন কোনো সাব-ডিলার নেই যারা নিম্নতর মূল্যে ওই পণ্য বিক্রয় করতে পারে বা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে এর উপযুক্ত কোনো বিকল্প পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ নেই;
- ক্রয়ের সময়ে বলবৎ যুক্তিসংগত বাজারমূল্যে পচনশীল পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে (যেমন তাজা ফল, সবজি এবং অনুরূপ পণ্য);
- ব্যতিক্রমী সুবিধাজনক শর্তে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়, যদি ওই পণ্য অতি সাম্প্রতিক কালে উৎপাদিত, অব্যবহৃত ও উৎপাদনকারীর গ্যারান্টিযুক্ত হয়;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষিপণ্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করা হলে;
- বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা থেকে সরকারের নিজস্ব অর্থে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় করা হলে;
- কোনো সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসারে স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে কোনো বিশেষায়িত পণ্য ক্রয় করা হলে;
- বিদ্যমান সরঞ্জামাদির খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারীর পরিবর্তনের ফলে যদি সংগৃহীতব্য বা প্রাপ্তব্য খুচরা যন্ত্রাংশ বা সেবা, বিদ্যমান স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি, যন্ত্রাংশ বা সেবার ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনযোগ্য না হয়;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত কোনো জরুরি পরিস্থিতি বা অনুরূপ সংকট মোকাবিলায় তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমার মধ্যে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় করা হলে;
- তফসিল-২-এ বর্ণিত মূল্যসীমা অতিক্রম না করা সাপেক্ষে, অতি জরুরি বা প্রয়োজনীয় পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয় (যথা : ক্যাটারিং সেবা, অ্যাম্বুলেন্স সেবা, পরিবহন সেবা, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, প্লামবিং সেবা, কাঠের কাজসংক্রান্ত সেবা, স্থাপত্য সেবা ইত্যাদি)।

তবে উপরিউক্ত কোনো শর্তই ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে সরাসরি দরপত্রে আহ্বানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দরপত্র পদ্ধতির কারণে আর্থিক ক্ষতি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডকে প্রতি লিটার কীটনাশক ৩৭৮ টাকা দরে কার্যাদেশ দেওয়ায় প্রতি লিটার কীটনাশক ক্রয়ে ১৬১ টাকা ক্ষতি হয়েছে, কারণ তারা লিমিট অ্যাগ্রোপ্রোডাক্ট নামে যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই কীটনাশক ক্রয় করে সেই একই প্রতিষ্ঠান উত্তর সিটির উন্মুক্ত দরপত্রে একই কীটনাশকের জন্য প্রতি লিটারের দর ২১৭ টাকা প্রস্তাব করে। এর ফলে কীটনাশক বাবদ মোট ক্রয়ের ৪০ শতাংশ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী প্রথমে মূল্য প্রস্তাব আহ্বান করবে এবং দরপত্রদাতার সাথে দর-কষাকষি করবে।[২৮] কিন্তু এ ক্ষেত্রে কীটনাশকের বাজার দর বিবেচনা করে উপযুক্ত দর-কষাকষি করা হয়নি।

দরপত্রের দলিল প্রক্রিয়াকরণ ও কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম

কীটনাশক ক্রয়ে ধাপে ধাপে কমিশন আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়, যেমন বিল নেওয়ার সময়, পণ্যাগারে কীটনাশক সরবরাহের সময় ইত্যাদি। তবে অভিযোগকারীরা টাকার পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

কীটনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক কীটনাশক পণ্যাগারে সরবরাহ করার পর এই কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা তিনটি ধাপে পরীক্ষা করা হয়–

১. সিটি করপোরেশন কর্তৃক মাঠপর্যায়ের কার্যকারিতা পরীক্ষা, কীটনাশক মাঠপর্যায়ে কার্যকর হলে;

২. রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক কার্যকারিতা পরীক্ষা (efficacy test); এবং

৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ে নিবন্ধিত কীটনাশকের বিবরণ অনুযায়ী সব উপাদান যথাযথভাবে আছে কি না, তা পরীক্ষা করা।

কীটনাশকের মাঠপর্যায়ের কার্যকারিতা পরীক্ষায় সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

রোগসংক্রামক কীট নিয়ন্ত্রণ বা মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কি না, তা পরিবীক্ষণ করা জরুরি। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন ১০-১২ বছর ধরে মশা নিয়ন্ত্রণে একই কীটনাশক (পারমিথ্রিন) ব্যবহার করলেও কীটনাশকের মশা নিধনের সামর্থ্য ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা করানো বা কীটনাশক পরিবর্তন করার কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। মাঠপর্যায়ে কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য সিটি করপোরেশনের নিজস্ব কোনো ল্যাবরেটরি ও কীটতত্ত্ববিদ নেই।

কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি

বিভিন্ন ধরনের জনস্বাস্থ্য কীটনাশক পরীক্ষা করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রটোকল প্রয়োজন হয়। যে এলাকায় কীটনাশক দেওয়া হচ্ছে সেই এলাকা থেকে মশার লার্ভা নিয়ে রেয়ারিং কলোনিতে রাখতে হয়। পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে ৩-৫ দিন বয়স্ক স্ত্রী মশা যেটি এখনো রক্তপান করেনি এ রকমের মশা পরীক্ষার জন্য ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[২৯] কিন্তু রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এ ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে থেকে কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা তৈরি হয়নি এমন মশা নিয়ে এসে পরীক্ষা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ল্যাব সাপোর্ট, মশার রেয়ারিং কলোনি না রেখেই আইইডিসিআর মশারির মধ্যে ফগিং করে দেখে যে মশা এই ওষুধে মরে কি না। এ ছাড়া কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিও সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কার্যকারিতার সনদ প্রদান, ক্ষেত্র বিশেষে পরীক্ষা না করেই প্রতিবেদন দেওয়া ইত্যাদি। কোনো কীটতত্ত্ববিদ ছাড়াই আইইডিসিআরের কীটতত্ত্ব বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। এখানে চিকিৎসক দিয়ে কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করানো হয়। দুই সিটি করপোরেশন কর্তৃক পাঠানো একই প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত একই কীটনাশক আইইডিসিআরের পরীক্ষায় একবার কার্যকর আরেকবার অকার্যকর বলা হয়েছে।

কীটনাশকের নিবন্ধনে অনিয়ম ও দুর্নীতি

যেকোনো ব্যক্তিকে কীটনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, মোড়কজাতকরণের জন্য 'বালাইনাশক আইন ২০১৮ (ধারা ৪)' অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অধীনে ওই পণ্যের জন্য নিবন্ধন ও লাইসেন্স নিতে হয়। এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্য কীটনাশকের নিবন্ধন পাওয়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কীটনাশকের একচেটিয়া উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধা পেতে উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কর্মকর্তাদের একাংশকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাখে। এ ছাড়া উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কীটনাশকের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও এ বিষয়ে কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয় না।

> 'একটি কীটনাশকের নিবন্ধন নিতে হলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ২-৩ লাখ টাকা খরচ করতে হয়, তা-ও সবাইকে দেওয়া হয় না, এর জন্য তদবিরও করতে হয়।'
>
> *- একটি বেসরকারি কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক*
>
> 'এখানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় শুধু কথা বলতেই ৫ হাজার টাকা দিতে হয়, এরপর প্রতি ধাপেই টাকা দিতে হয়, আর একটি পণ্যের নিবন্ধন নিতে ২ বছরেরও বেশি সময় লাগে, ফলে আমি নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছি।'
>
> *- অপর একটি বেসরকারি কীটনাশক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক*

যদিও বলা হয় একটি পণ্য নিবন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের আবেদন যাচাই করার জন্য পেস্টিসাইড টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি (পিটাক) ও সাব-পিটাকের যে সভাগুলো হওয়ার কথা তা যথাক্রমে ছয় ও তিন মাস পরপর হওয়ার কারণে এই বিলম্ব হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে যে অর্থ না দিলে কোনো কীটনাশকের নিবন্ধনের আবেদনপত্র ওই কমিটির আলোচনা সভায় উত্থাপন করা হয় না।

মাঠপর্যায়ের অপ্রয়োজনীয় ও লোক দেখানো মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে দুই সিটি করপোরেশনের কিছু অপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে, যেগুলো কার্যকর ছিল না। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ছিল হোল্ডিং করদাতাদের জন্য অ্যারোসল ক্রয়। হোল্ডিং করদাতাদের বিনা মূল্যে অ্যারোসল প্রদানের জন্য ২ লাখ অ্যারোসল ক্রয় করা হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হোল্ডিং করদাতারা সিটি করপোরেশনে গিয়ে অ্যারোসল নিয়ে আসবেন। প্রথমত, যারা হোল্ডিং করদাতা তাদের অ্যারোসল ক্রয় করার সামর্থ্য আছে এবং দ্বিতীয়ত, তারা রিকশা ভাড়া ও সিএনজি ভাড়া খরচ করে একটি অ্যারোসল আনতে সিটি করপোরেশনে যাবে না। কিন্তু যাদের অ্যারোসল ক্রয়ের সামর্থ্য নেই তাদের কথা বিবেচনা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংসে ‘স্টপ ডেঙ্গু’ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়। এই অ্যাপে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করার জন্য প্রজনন ক্ষেত্রের ছবি তুলে আপলোড করা ছাড়া আর কোনো ফিচার যুক্ত করা হয়নি এবং ছবি আপলোড করার পর এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। ডেঙ্গু রোগ ও এডিস মশাবিষয়ক কোনো তথ্য এখানে নেই। ছবি আপলোড করার ক্ষেত্রেও কারিগরি ত্রুটি রয়েছে। এ ছাড়া গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য লোক দেখানো বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যেমন পরিষ্কার সড়কে ‘বর্জ্য পরিষ্কার’ ও ফগিং করা ইত্যাদি।

মাঠপর্যায়ের মশা নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি

মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে অ্যাডাল্টিসাইড প্রয়োগের জন্য যে কীটনাশক ও ফগার মেশিনের জ্বালানি সরবরাহ করা হয়, মাঠপর্যায়ের কর্মীদের একাংশ তা যথাযথভাবে ব্যবহার না করে বাজারে বিক্রি করে দেয়। এ ছাড়া লার্ভিসাইডের জন্য যে কীটনাশক সরবরাহ করা হয় তা ব্যবহার না করে কোনো কোনো কর্মী কীটনাশক ফেলে দেন। সাধারণত প্রধান সড়ক ধরে ফগিং করা হয়, তখন একটু ভেতরের দিকের বাড়ি বা বাড়ির নিচতলায় বা গ্যারেজে ফগিং করানোর জন্য কর্মীদের ৫০-২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন, কিন্তু দুই সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জন-অংশগ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

দায়িত্ব পালনে অবহেলা

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন যে ঈদযাত্রার কারণে এডিস মশা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। ডেঙ্গু রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তা প্রতিরোধে ঈদযাত্রায় প্রতিটি বাস ছাড়ার আগে মশানাশক অ্যারোসল স্প্রে করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বাসমালিকদের চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু এই কার্যক্রমও

বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে এই সময় ডেঙ্গু ঢাকার বাইরে ৬৪টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ট্রেন ও লঞ্চেও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি।

দুই সিটি করপোরেশনের সব ওয়ার্ডের সব এলাকায় সমানভাবে মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয় না। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় নিয়মিতভাবে ফগিং করা হয় না। এ ছাড়া ডেঙ্গু মৌসুম শেষ না হতেই কোনো কোনো এলাকায় মশানিধন কার্যক্রম শিথিল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা : জনবল ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের অভাব

ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মী বণ্টনের ক্ষেত্রে ওই ওয়ার্ডের আয়তন বিবেচনা করা হয় না। যেমন দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একটি ওয়ার্ডের আয়তন ০.৬১৮ বর্গকিলোমিটার এবং সেখানে ৭ জন মশকনিধনকর্মী আছে, পক্ষান্তরে একটি ওয়ার্ডের আয়তন ১.৯২৭ বর্গকিলোমিটার হলেও সেখানকার কর্মী সংখ্যা ৬। একইভাবে উত্তর সিটি করপোরেশনের একটি ওয়ার্ডের আয়তন ১.৯৪৬ বর্গকিলোমিটার এবং সেখানে ৯ জন কর্মী আবার একটি ওয়ার্ডের আয়তন ৩.৬৬১ বর্গকিলোমিটার হলেও সেখানে ৫ জন কর্মী আছেন। সার্বিকভাবে দুই সিটি করপোরেশনে গড়ে ওয়ার্ডপ্রতি ৫ জন মশক নিধনকর্মী রয়েছেন, যা মশা নিধন, বিশেষত এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য অপ্রতুল। উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর সংস্থায় প্রতি ওয়ার্ডের জন্য গড়ে ১৫ জন কর্মী রয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের প্রতি চার ওয়ার্ডের জন্য গড়ে মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক বা মশক সুপারভাইজার রয়েছেন। ফলে মশার কীটনাশক দেওয়ার কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা মনিটরিং করার কার্যক্রম খুবই দুর্বল। এ ছাড়া মশক নিধনকর্মীদের, বিশেষত অস্থায়ীভাবে দিনচুক্তিতে বা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মীদের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

কেস ১ : সিঙ্গাপুরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম[৩০]

সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট এজেন্সির (এনইএ) কর্মীরা নিয়মিতভাবে মানুষের ঘরে ঘরে এবং এলাকায় গিয়ে জনসমাগম, নির্মাণ এলাকা এবং হাউজিং এস্টেটে ডেঙ্গু মশার প্রজননস্থল খুঁজে ধ্বংস করে থাকেন। এভাবে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ২ লাখ ২৪ হাজার পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ১ হাজার ৮০০ অভিযান চালানো হয়েছে নির্মাণ এলাকায়। এর মাধ্যমে ২ হাজার ৯০০ এডিস মশার প্রজননস্থল খুঁজে বের করে ধ্বংস করা হয়েছে। ২০১৮ সালে এনইএ মোট ১০ লাখ পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়েছে যার মধ্যে ৯ হাজারটি ছিল নির্মাণ এলাকা। এর মাধ্যমে সে বছর মশার প্রায় ১৮ হাজার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হয়।

সিঙ্গাপুরের আইন অনুসারে নির্মাণকাজের সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পেস্ট কন্ট্রোল অফিসার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দিতে হয়। যাদের কাজ হলো প্রতিদিন সকালে মেঝে পরিষ্কার করা এবং দুই সপ্তাহে একবার মশকরোধী তেল প্রয়োগ করা, যেন এসব সাইটে জমে থাকা পানিতে মশা জন্মাতে না পারে। এনইএ প্রতি মাসে অন্তত একবার নির্মাণ এলাকাগুলো পরিদর্শন করে, আইন ভঙ্গ করলে জরিমানা করা হয়, এমনকি সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ করেও দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে ৪০টি নির্মাণকাজ বন্ধ করার আদেশ প্রদান করা হয়। এভাবে নিয়মিত নজরদারির ফলে ২০১৩ সালে যেখানে ১১ শতাংশ নির্মাণ এলাকায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ২০১৯ সালে তা মাত্র ৪ শতাংশে নেমে আসে।

এনইএর নিজস্ব কর্মীর পাশাপাশি এডিস প্রতিরোধ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমেও আবাসিক এলাকায় পরিদর্শন কার্যক্রম চালানো হয়। এনইএ এ রকম ৮ হাজার ৫০০ ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা এলাকায় এলাকায় মানুষকে সচেতন করার কাজ করে। ডেঙ্গু মশার বৃদ্ধির ওপর নজর রাখার জন্য এনইএ গোটা সিঙ্গাপুরজুড়ে ৫০ হাজার গ্রেভিট্র্যাপ (Gravitrap-ডিম পাড়তে ইচ্ছুক স্ত্রী এডিস মশা আটকানোর বিশেষ ফাঁদ) স্থাপন করেছে। এই ফাঁদে আটকানো মশার তথ্য থেকে এনইএ ধারণা করতে পারে কোন কোন এলাকায় এডিশ মশার প্রাদুর্ভাব বেশি হচ্ছে, ফলে সীমিতসংখ্যক লোকবল দিয়ে কোথায় কোথায় অভিযান পরিচালনা করলে সবচেয়ে কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এই ফাঁদের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক এডিস মশা মারা সম্ভব হয়। এই গ্রেভিট্র্যাপ নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে এনইএ ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২১ শতাংশ বেশি মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা : অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ঘাটতি

২০১৮ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ঢাকা উত্তর সিটির ৬৫২টি মেশিনের মধ্যে অর্ধেক মেশিন নষ্ট ছিল। বর্তমান অর্থবছরে উত্তর সিটি করপোরেশন জরুরি পরিস্থিতিতে নতুন কিছু মেশিন ক্রয় ও কিছু মেশিন মেরামত করলেও এখনো ৪০-৪৫টি মেশিন নষ্ট। পক্ষান্তরে ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯৪০টি মেশিনের মধ্যে ৪২৮টি মেশিন নষ্ট ছিল (হ্যান্ডেলড মেশিন ৪৪২টির মধ্যে ২০৮টি, ফগার মেশিন ৪৪৭টির মধ্যে ২০২টি এবং হুইলব্যারো ৫১টির মধ্যে ১৮টি নষ্ট)।[৩১] অধিকাংশ নষ্ট মেশিনের যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ নষ্ট মেশিনের কারণে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম দীর্ঘদিন সীমিত পর্যায়ে ছিল। এ ছাড়া যন্ত্রপাতির অভাবে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডগুলোর কিছু কিছু এলাকা এখনো মশা নিধন কার্যক্রম নিয়মিত হচ্ছে না। যেমন, একটি এলাকায় কর্মীসংখ্যা ১০ জন কিন্তু মেশিন আছে ৩টি।

কেস ২ : কলকাতা পৌরসংস্থানের এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২০১৮ সালে পৌরসংস্থার অধীনে ১৫টি ডেঙ্গু ডিটেকশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ২০১৮ সালে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ বিনা মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করিয়েছে। ১৪৪টি ওয়ার্ডে ৯৩০টি মশা নিয়ন্ত্রণ দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে দুজন করে কর্মী থাকেন। একজন মশা নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন এবং একজন মানুষকে এডিস মশা বিষয়ে সতর্ক করে থাকেন। তারা প্রতিদিন মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টে অনলাইনে এসব তথ্য প্রেরণ করেন। এডিস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১৬টি র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম এবং ১৬টি বোরোতে একটি করে মোট ১৬টি বোরো **র‍্যাপিড** অ্যাকশন টিম রয়েছে, যার প্রতিটিতে ৮-১০ জন করে কর্মী রয়েছেন। নিজ নিজ কর্মএলাকার মশা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে আন্তমন্ত্রণালয় ও আন্তবিভাগীয় সভা পরিচালনা করা। নৌকার মাধ্যমে লার্ভিসাইডিং করা। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট, ব্যানার, টিভি বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। সহজে **পৌঁছানো যায় না** এমন এলাকায় এডিস মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করতে ড্রোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়

দেশব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, আইইডিসিআর, সিটি করপোরেশন, স্থানীয় সরকার, রাজউকসহ অন্যান্য বিভাগীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, রিহ্যাব, পরিবেশ অধিদপ্তর, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর ইত্যাদি দপ্তরগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সহ কিছু বিষয়ে সমন্বয় প্রয়োজন রয়েছে–

- এডিস মশার প্রজননস্থল নির্মূলে নির্মাণাধীন ভবন ও বড় বড় নির্মাণ প্রকল্প এলাকা তদারকি ও তাদের আইনের আওতায় আনা;
- বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ইত্যাদি এলাকা তদারকি ও এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা;
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস দেওয়া;
- এডিস মশা জরিপ; প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে ডেঙ্গু আক্রান্তের এলাকা (হটস্পট) চিহ্নিত করা; তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ
- জলাবদ্ধতা নিরসন ও এডিস মশার উৎস নির্মূলের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

কিন্তু এসব বিষয়ে উল্লিখিত দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। ২০১৯ থেকে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পর থেকে মশার উৎস নির্মূলে মশক নিধনকর্মীদের সাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মীরা কাজ করছেন। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিধনের ক্ষেত্রে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিরা কখনোই সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করেননি এবং সমন্বিতভাবে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উদ্যোগ নেননি। ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ও হটস্পট চিহ্নিত

করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। অন্যদিকে যাদের ওপর মশা নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্ব ছিল তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ও অবহেলার কারণে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ জনগণের ওপর দায় চাপিয়ে জরিমানা শুরু করে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুযোগের ঘাটতি

কীটতত্ত্ববিদসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞকে শুধু জরুরি পরিস্থিতিতে মতামতের জন্য ডাকা হয়। কিন্তু জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় না। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে জরুরি পরিস্থিতিতে যে কমিটিগুলো করা হয়ে থাকে তা পরবর্তী সময়ে কার্যকর থাকে না। বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা বিশেষজ্ঞদের মতামত পছন্দ না হলে তাদের পরবর্তী সময়ে আর ডাকা হয় না। সিটি করপোরেশনগুলো কীটনাশকের মান পরীক্ষা করার জন্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংকে নিয়মিত ডাকে না; তবে তাদের যখন ডাকা হয় তখন তারা যান।

চিত্র ৩ : মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল

মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের ঘাটতি ও ফলাফল

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব হলেও ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবে যেসব বিষয় সামনে আসে তার মধ্যে রয়েছে : জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা না থাকা, এডিস মশা জরিপের পূর্বাভাস অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ গ্রহণ না করা, অকার্যকর কীটনাশক ব্যবহার এবং মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত ও অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এর ফলে এ বছর বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব প্রায় মহামারি পর্যায়ে চলে যায়, ডেঙ্গু মশা ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয় এবং বেসরকারি হিসাবে ২২৩ জনের মৃত্যু হয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের রোগের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুশাসনের যেসব ঘাটতি এই গবেষণায় উঠে আসে তার মধ্যে রয়েছে– সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ে ও অংশগ্রহণের ঘাটতি, দীর্ঘদিন ধরে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব হলেও কৌশল প্রণয়নে গুরুত্ব না দেওয়া অর্থে সংবেদনশীলতায় ঘাটতি, এডিস মশা জরিপের পূর্বাভাস ও ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে যথাযথ সাড়া প্রদান না করা, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি এবং কীটনাশক ক্রয়ে ও এর মান পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি (চিত্র ৩)।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব থাকলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে যে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা করার কথা তা খুব প্রাথমিক অবস্থায় আছে। ঢাকা শহরের এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না রেখে দুই সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম শুধু রাসায়নিক ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতিনির্ভর যা এডিস মশার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এই কীটনাশকনির্ভর মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ক্রয়ের সুযোগ বেশি থাকার ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা উপযুক্ত ও কার্যকর অ্যাডাল্টিসাইড নির্ধারণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কীটনাশক ক্রয়ে যথাযথভাবে সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ না করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে, নির্ধারিত বাজেটের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না এবং মানহীন কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত এই আংশিক পদ্ধতিটিও অকার্যকর হওয়ার ফলে সার্বিক মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যায়। এ ছাড়া ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত চিত্র চিহ্নিত, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতির ফলে যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে লোক দেখানো অকার্যকর কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে, যা লক্ষাধিক মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়া এবং দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কারণ।

সুপারিশ

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ ও এই কার্যক্রম সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো–

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

১. সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সব অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট করতে হবে।

২. জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মশা নিধনে নিজস্ব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করে সিটি করপোরেশনগুলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন এডিস মশার উৎস নির্মূল, পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক ব্যবহার); বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

আইনি সংস্কার

৪. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে নির্মাণাধীন ভবন, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (রিহ্যাব, হাউজিং এস্টেট কোম্পানি ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে স্পষ্ট করতে হবে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান থাকতে হবে।

এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর আগাম সতর্কতা

৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রকে একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইসের অধীনে নিয়ে আসতে হবে, যেখানে সবার প্রবেশের সুযোগ থাকবে; ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সিটি করপোরেশন এবং দেশের অন্য এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর ইত্যাদি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই সিটি করপোরেশনগুলো সব হটস্পট চিহ্নিত করবে এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করবে।

৭. এডিস মশার জরিপ কার্যক্রম ঢাকার বাইরে সম্প্রসারিত করতে হবে; এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

জনবল ও প্রশিক্ষণ

৮. জনসংখ্যা, আয়তন, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠপর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদার ভিত্তিতে নিয়োগ, আউট সোর্সিং বা জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে; এর জন্য পর্যাপ্ত ও সুষম বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৯. মশা নিধনকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে এডিস মশা নির্মূলের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মশক নিধন কীটনাশক ও উপকরণ ক্রয়

১০. উপযুক্ত কীটনাশক ও এর চাহিদা নির্ধারণ, ক্রয়, কার্যকারিতা ও সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিশেষজ্ঞ কারিগরি কমিটি করতে হবে; তাদের কার্যক্রম নিয়মিত হতে হবে এবং সভাগুলোর কার্যবিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

১১. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে কীটনাশক ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ক্রয় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১২. মশা নিধন কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

কীটনাশকের মান ও কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা পরীক্ষা

১৩. মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা রোধ করার জন্য কিছুদিন পরপর যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীটনাশক পরিবর্তন, একেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. তৃতীয় পক্ষ (বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কীটতত্ত্ববিদ, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি) কর্তৃক মশার কীটনাশক প্রতিরোধী ক্ষমতা এবং মশা নিধন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের কীটতত্ত্ববিদসহ বিশেষজ্ঞ শূন্যপদগুলো পূরণ করতে হবে এবং পদ না থাকলে পদ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, Dengue and severe dengue, key facts. বিস্তারিত দেখুন : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

২ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 'Global Strategy for Dengue Prevention And Control 2012-20, বিস্তারিত দেখুন : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75303/9789241504034_eng.pdf

৩ Dhar Chowdhury, Parnali & Haque, Emdad & Driedger, S. (2015). Dengue Disease Risk Mental Models in the City of Dhaka, Bangladesh: Juxtapositions and Gaps Between the Public and Experts. Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis. 36. 10.1111/risa.12501, বিস্তারিত দেখুন : https://www.researchgate.net/publication/282047789

৪ Pulak Mutsuddy, Sanya Tahmina Jhora, Abul Khair Mohammad Shamsuzzaman, S. M. Golam Kaisar, and Md Nasir Ahmed Khan, "Dengue Situation in Bangladesh: An Epidemiological Shift in terms of Morbidity and Mortality," Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, vol. 2019, Article ID 3516284, 12 pages, 2019. https://doi.

org/10.1155/2019/3516284.

[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ন্যাশনাল হেলথ বুলেটিন* ২০১৭, বিস্তারতি দেখুন : http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/home/4364-health-bulletin-2017 (১৮.০৯.২০১৯ তারিখে সংগৃহীত)।

[৬] হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৯ সালের ডেঙ্গু রোগী ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর সর্বশেষ তথ্য, বিস্তারিত দেখুন : http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/2019/dengue/Dengue_20190918.pdf (১৮.০৯.২০১৯ তারিখে সংগৃহীত)।

[৭] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন : https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1614778

[৮] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), বিস্তারতি দেখুন : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

[৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক কৌশল ২০১২-২০*, প্রাগুক্ত।

[১০] এইচপিএনএসপি কর্মপরিকল্পনা, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিস্তারিত দেখুন : http://www.dghs.gov.bd/images/docs/OP/2018/CDC.pdf,

[১১] Mutsuddy, P., Tahmina Jhora, S., Shamsuzzaman, A., Kaisar, S., & Khan, M. (2019). Dengue Situation in Bangladesh: An Epidemiological Shift in terms of Morbidity and Mortality. *The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology = Journal canadien des maladies infectieuses et de la microbiologie medicale*, *2019*, 3516284. doi:10.1155/2019/3516284

[১২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ২০১৯, হেলথ বুলেটিন, বিস্তারিত দেখুন : http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/home/5175

[১৩] Mohammad Shfiul Alam et al. (2018), Baseline survey of insecticide resistence in Aedse aegypti in Bangladesh, ICDDR,B and CDC, Atlanta, USA, unpublished

[১৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৯ সালের ডেঙ্গু ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর সর্বশেষ তথ্য, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন : http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Notice/2019/dengue/Dengue_20190918.pdf

[১৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ-নির্ণয়কেন্দ্রের তালিকা থেকে প্রাপ্ত।

[১৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৯ সালের ডেঙ্গু ও সন্দেহজনক ডেঙ্গু রোগীর সর্বশেষ তথ্য, প্রাগুক্ত।

[১৭] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[১৮] কলকাতা পৌরসংস্থান, বাজেট স্টেটমেন্ট ২০১৯-২০, বিস্তারিত দেখুন : https://www.kmcgov.in/KMCPortal/downloads/KMC_Budget_English_2019_2020.pdf

[১৯] এইচপিএনএসপি কর্মপরিকল্পনা, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, প্রাগুক্ত।

[২০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, WHO/Department of control of neglected tropical diseases, Handbook for integrated vector management, 2012, বিস্তারিত দেখুন : https://www.who.int/neglected_diseases/vector_ecology/resources

[২১] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ১৬ (৯)।

[২২] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ১৬ (১১)।

[২৩] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৪ (২) (ছ) (৩) (গ)।

[২৪] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৬১ (১)।

[২৫] *বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) আইন, ২০১৮*, ধারা ৪।

[২৬] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৪৮ (২) (ক) (অ, ই, ঈ, ঊ)।

[২৭] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৭৬ (১)।

[২৮] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮*, বিধি ৭৫(৩)।

[২৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, (2016) Monitoring and managing insecticide resistance in Aedes mosquito populations: interim guidance for entomologists, বিস্তারিত দেখুন : https://apps.who.int/iris/handle/10665/204588

[৩০] National Environment Agency, Singapore, NEA Urges Continued Vigilance in Fight Against Dengue, বিস্তারিত দেখুন : https://www.nea.gov.sg/media/news/news/index/nea-urges-continued-vigilance-in-fight-against-dengue-2019

[৩১] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন : http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2018/02/25/city-corporations-failing-tackle-mosquito-problem/

বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়*

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, মো. মোস্তফা কামাল ও মো. খোরশেদ আলম

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৯.১), মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৯.২) এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার (অনুচ্ছেদ ২৮.১) তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি (অনুচ্ছেদ ০১) দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য 'কাউকে পিছিয়ে না রাখা'। নানাভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশে পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, দলিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, চা-শ্রমিক, যৌনকর্মী, হিজড়া, শরণার্থী জনগোষ্ঠী অন্যতম। বাংলাদেশের সমাজে কাঠামোগতভাবে অসমতা, বৈষম্য ও বঞ্চনা বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান (শফি ও কিলবি, ২০০৩; গোস্বামী, ২০০৪; ডারহাজেন ও ইসলাম, ২০০৬; সরকার ও ড্যাবেই, ২০০৭; নাসরীন ও তাতে, ২০০৭; আলী, ২০১৩; আলী, ২০১৪; এমজেএফ, ২০১৬)। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের ভিন্ন জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয় ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণে নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয় (ডারহাজেন ও ইসলাম, ২০০৬; আলী, ২০১৩; এমজেএফ, ২০১৬)। এসব বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী সমাজে বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য ও বঞ্চনার সংস্কৃতি প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন ঘটায় (ডিএফআইডি, ২০০৬)। কারণ পেছনে ফেলে রাখা মানুষগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে সমান অভিগম্যতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় (সিলভার, ২০০৭)। আবার প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আবার দুর্নীতি অন্যায্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যকে আরও ঘনীভূত করে (মোসে, ২০১০)। এমন পরিস্থিতি পেছনে ফেলে রাখা জনগোষ্ঠীকে সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে (সেন, ১৯৯৯)।

---

* ২০১৯ সালের ১০ মার্চ ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

বাংলাদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ১৪১ (বিবিএস, ২০১১)। তবে বেসরকারি সূত্রমতে এ সংখ্যা ৩০ লাখের অধিক হয়েছে বলে ধারণা করা হয় (রায় ও চাকমা, ২০১৫)। বাংলাদেশের দলিত জনসংখ্যা নিয়ে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সমাজসেবা অধিদপ্তরের (২০১৭) অনানুষ্ঠানিক জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে দলিতদের সংখ্যা আনুমানিক ১৪ লাখ ৯০ হাজার ৭৬৬।[১] তবে বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের সংখ্যা ৪৫-৫৫ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদিবাসী ও দলিতদের জাতিগত-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় বৈচিত্র্যময়। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসীরা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জীবনধারণ পদ্ধতির ধারক ও বাহক। মূলধারার জনগোষ্ঠীর মাঝে বসবাস এবং সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আগ্রাসনের সম্মুখীন হলেও তাদের আদি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান[২]। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (১৯ মার্চ ২০১৯) অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর[৩] অস্তিত্ব রয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কিছু উদাহরণ হলো ওঁরাও, কোচ, কোল, খুমি, খাসি, খিয়াং, গারো, চাক, চাকমা, ডালু, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখোয়া, মালপাহাড়ী, বম, বর্মণ, ম্রো, মুণ্ডা, মণিপুরি, মারমা, রাখাইন, লুসাই, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নথিতে প্রাপ্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী দলিত জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে ‘অচ্ছুত’ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের ওপর ‘অস্পৃশ্যতা’ আরোপিত এবং মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সীমিত। বাংলাদেশে বসবাসরত কিছু দলিত জনগোষ্ঠীর উদাহরণ হলো নমশূদ্র, বাগদি, মালো, ধীবর, মানতা, চৌদালি, নিকারি, হরিজন, ধাঙ্গর, বাঁশফোর, কুমার, ঋষি, শীল, রজদাস, ধোপা, জোলা, যুগী, পাটনি, রবিদাস, সিং, নুনিয়া, ভূমিজ, পাত্র, মালাকার, চুনারু, কাহারু, বাজনদার, ওঝা, হাজাম, কাহার, বেহারা, কলু প্রভৃতি (চৌধুরী, ২০০৯)।

কতকগুলো যৌক্তিকতার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, ভিন্ন জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে নানা ধরনের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে পিছিয়ে রাখার ধারাবাহিকতা এবং অধিকার নিশ্চিতে ও সেবায় অন্তর্ভুক্তিতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আদিবাসী ও দলিতদের আরও পিছিয়ে রাখার সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিতদের সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা বিদ্যমান; তবে জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে তারা কী ধরনের বৈষম্য ও দুর্নীতির শিকার

১ http://www.dss.gov.bd/site/page/909e2813-4cbf-49a8-81bf-12366bb20ee4/বেদে-ও-অনগ্রসর-জনগোষ্ঠীর-জীবনমান-উন্নয়ন (সর্বশেষ ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেখা হয়েছে)।

২ https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html (সর্বশেষ ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে দেখা হয়েছে)।

৩ এ নিবন্ধে তাদের আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

হয় এবং তার ব্যাপ্তি কতটুকু সে বিষয়ে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, টিআইবির অগ্রাধিকার কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতারা যেসব দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় তা তুলে ধরা। এ গবেষণার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও দলিতেরা অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে যে বৈষম্য ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার ওপর আলোকপাত করে যথাযথ সুপারিশ পেশ করার প্রয়াস রয়েছে।

মূলত দুটি গবেষণা জিজ্ঞাসার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো : (ক) বাংলাদেশের আইন, নীতিমালা ও সেবা প্রদানের চর্চাগুলো আদিবাসী ও দলিতদের জন্য কতখানি অন্তর্ভুক্তিমূলক? এবং (খ) অধিকার পূরণ ও সেবা প্রদানে আদিবাসী ও দলিতদের অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ কী কী?

প্রান্তিকতা ও বঞ্চনার শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম গোষ্ঠী হিসেবে সমতলের (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের সমতল অঞ্চলগুলোয় বসবাসরত আদিবাসী) আদিবাসী ও বর্ণপ্রথার মাধ্যমে নির্ধারিত 'নিম্নবর্ণ' পরিচয় বহনকারী দলিতদের এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি সেবা হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবাকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদিবাসী ও দলিতদের সক্ষমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এই সেবার গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য পৃথক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আদিবাসী ও দলিত-অধ্যুষিত জেলাগুলোকে (৩৩টি আদিবাসী-অধ্যুষিত জেলা এবং দলিতদের ক্ষেত্রে সব জেলা) পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তাদের মধ্য থেকে কাঠামোবদ্ধ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথকভাবে ১৪টি করে মোট ২৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বিভাগগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। নির্বাচিত আদিবাসী-অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে ১টি করে উপজেলা এবং দলিত-অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে ১টি করে উপজেলা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। বাছাই করা উপজেলা থেকে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার আদিবাসী ও বর্ণের দলিতদের নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে পাহান, সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহাতো, মালপাহাড়ী, গারো, বর্মণ, হাজং, কোচ, মুণ্ডা, রাজবংশী, রাখাইন, খাসিয়া, মণিপুরি ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর দলিতদের মধ্যে রয়েছে বাঁশমালী, রবিদাস, হরিজন, জেলে, পাটনি, কুমার, সিং, বাঁশফোড়, পশ্চিমা, বাগদি, কর্মকার, ঋষি, নুনিয়া, জলদাস ও শীল জনগোষ্ঠী। এ গবেষণার সময়কাল ছিল ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও তথ্যের উৎস নিম্নরূপ :

পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা	- সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, প্রতিবেদন, নিবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই-পুস্তক, ওয়েবসাইট
নিবিড় সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ	- আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী : গোত্রপ্রধান, নারী, পুরুষ, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - আদিবাসী ও দলিত-অধ্যুষিত এলাকার মূলধারার জনগোষ্ঠী
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ	- স্থানীয় পর্যায় : উপজেলা নির্বাহী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সমাজসেবা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি - জাতীয় পর্যায় : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি

এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্তির কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ, আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি, অধিকার পূরণ ও সেবায় বৈষম্যহীনতা এবং শুদ্ধাচার চর্চা।

অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি	নির্দেশক
বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ	• আদিবাসী ও দলিতদের পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ
আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি	• আইন ও নীতিমালায় আদিবাসী, দলিতদের পরিচয় ও অধিকারের স্বীকৃতি • স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী, দলিতদের পরিচয় ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা
অধিকার পূরণ ও সেবায় বৈষম্যহীনতা	• আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার পূরণে সংবেদনশীলতা • আদিবাসী ও দলিতদের সরকারি সেবা প্রদানে বৈষম্যহীন আচরণ
শুদ্ধাচার চর্চা	• আদিবাসী ও দলিতদের সরকারি সেবা প্রদানে তথ্যের উন্মুক্ততা, নিয়ম ও নীতির চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা

গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা

আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ

আদিবাসী ও দলিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) প্রদান। এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০

কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২৮০টি উপজেলায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা ও উপকরণ বিতরণে তা ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে দলিতদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসূচি। এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে শিক্ষাবৃত্তি, বয়স্ক ভাতা (পঞ্চাশোর্ধ্ব), যুব ও মধ্যবয়সীদের প্রশিক্ষণ ও অনুদান দেওয়া হয়েছে।

২০১৭-২০ সময়সীমার জন্য ৪৮ দশমিক ৫৬ কোটি টাকার পৃথক কর্মসূচিও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। দলিত ম্যানুয়াল ২০১৩ প্রণয়ন করে দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী ও দলিতদের ‘বাদ পড়া’ গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে দুর্গম এলাকার আদিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কর্মকাঠামো ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে গৃহীত একটি কর্মসূচি ১৫টি জেলার ৬৯টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে ৫ শতাংশ কোটা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে আবেদনের জন্য শিথিলযোগ্য বয়সসীমা (৩২ বছর) নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হরিজনদের জন্য ৮০ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া প্রণয়ন করা। খসড়া এ আইনে বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

আইন ও নীতিমালায় সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জ

আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় কতকগুলো সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিসত্তা এবং দলিতদের পরিচয়ের স্বীকৃতি না থাকা। আবার বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সনদ ২০০৭ স্বাক্ষরে বিরত থাকা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর না করায় অধিকার পূরণে বাধ্যবাধকতা থাকলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০-এ আদিবাসীদের ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে, যা জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিপন্থী। অন্যদিকে, দলিত ম্যানুয়াল ২০১৩-এ হরিজনরাও দলিতদের অন্তর্ভুক্ত হলেও দলিত ও হরিজনদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংজ্ঞায়নে উভয় গোষ্ঠীকে শুধু পরিচ্ছন্নতা কাজের সাথে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ দলিত পরিবারের শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আবার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১তেও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০-এ সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের উল্লেখ নেই। আবার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তাকৌশল ২০১৫তেও সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়নি। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সহায়তার উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য ভূমিহীন দলিতদের আবাসন সহায়তার উল্লেখ করা হয়নি এ কৌশলপত্রে। আবার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বারোপ করা হলেও দলিত নারীদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১-এ আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কে স্বীকৃতি নেই। আবার খাসজমিতে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের ভূমি অধিকারের বিষয়টির উল্লেখ নেই। এ ছাড়া প্রথাগতভাবে বসবাসরত বননির্ভর আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বিষয়টিরও এ নীতিতে উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭-এ গুরুত্ব বিবেচনায় কোনো স্থান বা এলাকাকে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষণা এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বিধান থাকায় প্রথাগতভাবে বসবাসরত বননির্ভর আদিবাসীদের বসবাসের অধিকার সুরক্ষিত না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২)-এ উপকারভোগী হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী ও দলিত মৎস্যজীবীদের উল্লেখ করা হয়নি। আবার সংশোধনীতে ‘প্রকৃত মৎস্যজীবী’ থেকে ‘প্রকৃত’ শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে জলমহালে উপকারভোগী হিসেবে আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী তাদের ক্ষেত্রে অভিগম্যতায় ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৮ সালে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে সব কোটা রহিতকরণের ফলে ‘উপজাতি’দের জন্য ৫ শতাংশ কোটাও বিলুপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে কোটা বিলীন করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আবার অনগ্রসরতম গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম হলেও দলিতদের জন্য কোনো কোটা সুবিধা নেই। ফলে চাকরিতে কোটা সুবিধা পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিতদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। মডেল নিয়োগ বিধি ২০১৭-এ পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হরিজনদের ৮০ শতাংশ কোটা থাকলেও যথেষ্টসংখ্যক হরিজন না পাওয়ার শর্তে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে পূরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর অপপ্রয়োগের মাধ্যমে মূলধারা থেকে ২০ শতাংশের অধিক কর্মী নিয়োগ করে হরিজনদের বঞ্চিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

অধিকার পূরণে ঘাটতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিগম্যতায় প্রতিবন্ধকতা : কিছু ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অস্বীকার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার নিজ ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চনার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন অনেক ক্ষেত্রে সনাতন ও

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের ধর্ম শিক্ষা না পড়িয়ে মূলধারার ধর্ম শিক্ষা পাঠদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত না করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় পড়াশোনার সুযোগ তৈরি না হওয়ায় তারা মূলধারার ভাষা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষকের কথা, পরীক্ষার প্রশ্ন বুঝতে তাদের সমস্যা হয়। সন্তানদের জড়তা ভাঙাতে তাদের অভিভাবকরা তাদের সাথে বাড়িতে বাংলায় কথা বলেন। এর ফলে তাদের মাতৃভাষা বিলুপ্তির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আবার অভিভাবকদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তিতে বাধাদানের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে মূলধারার প্রভাবশালী ও স্থানীয় সাংসদের সাহায্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত আদিবাসী সভাপতিকে অপসারণ এবং নির্বাচিত দলিত সদস্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত না করার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

স্বাস্থ্যসেবার আওতায় না আনা : দলিত ও আদিবাসী গর্ভবতী নারীদের টিকা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পাড়াগুলোয় টিকা ক্যাম্প স্থাপন না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাথমিক টিকা না দেওয়ায় গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী শিশুর মৃত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় না আনা : ভাতা পাওয়ার যোগ্য হলেও দরিদ্র আদিবাসী ও দলিতদের একটি বড় অংশ তালিকাভুক্তির বাইরে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অনেক দলিত ও আদিবাসী দরিদ্র বয়স্ক নাগরিক অভিযোগ করেছেন যে তারা বারবার যোগাযোগ করেও ভাতার তালিকাভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার হরণ : ভোটদান ও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকতে আদিবাসী ও দলিতদের বাধ্য করার অভিযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান ও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকে। ভোটের সময় বিভিন্ন পক্ষ তাদের শাসিয়ে যায় বলে তারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। একটি এলাকার কয়েকজন দলিত ব্যক্তি বলেন, 'ভোট আসলে অনেক পক্ষই শাসিয়ে যায়, তাই প্রায় ২০ বছর যাবৎ কোনো নির্বাচনেই আমরা ভোট দিতে যাই না।' অপর একটি এলাকার একজন আদিবাসী ব্যক্তি উল্লেখ করেন, 'আমি ভোটে দাঁড়াতে চাইলে ওরা আমার গরু মেরে ফেলল, ধান নষ্ট করল, হুমকি দিল। পরে আর নির্বাচন করা হয় নাই।'

বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত না করা : সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত না করায় তারা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যায়।

ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চনা : ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চনার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে ভোগকৃত জমিতে আদিবাসীদের বসবাস ও চাষাবাদের অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ছাড়া প্রভাবশালীরা ভুয়া দলিল বানিয়ে আদিবাসী ও দলিতদের জমির মালিকানা দাবি এবং ভূমি থেকে নানা কৌশলে উচ্ছেদ করছে।

অন্যদিকে বনভূমিতে জীবিকার অধিকার খর্ব করার উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কিছু এলাকায় সামাজিক বনায়নের নামে মূলধারার প্রভাবশালীদের বনের জমিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ ও গাছ লাগানোর অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে বনভূমিতে আদিবাসীদের প্রথাগত জীবিকার সংস্থানে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। আবার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নামে ভূমি অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্তও বিদ্যমান। কিছু এলাকায় বন সংরক্ষণের নামে আদিবাসীদের মতামত ছাড়াই বনের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ এবং পর্যটনের নামে ইকো-পার্ক ও কৃত্রিম লেক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণের উদাহরণ রয়েছে। এগুলো আদিবাসীদের বন থেকে উচ্ছেদের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বন বিভাগের হয়রানি প্রসঙ্গে এক আদিবাসী ব্যক্তির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তার বর্ণনায়, 'আমার নামে ১৭টা পর্যন্ত মামলা হয়েছে। জেল দিয়েছে। জেলে থাকতেও গাছ কাটার মামলা হয়েছে।'

ভূমির ক্ষেত্রে হয়রানির উদাহরণও লক্ষণীয়। যেমন রংপুর চিনিকলের নামে সাঁওতালদের জমি অধিগ্রহণ এবং চুক্তি অনুযায়ী আখ চাষ না করলে প্রকৃত মালিক হিসেবে সাঁওতালদের জমি ফেরত দেওয়ার শর্ত লঙ্ঘন করার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। সেখানে শর্তসাপেক্ষে অধিভুক্ত করা ভূমি আদিবাসীদের ফিরিয়ে না দিয়ে প্রভাবশালীদের ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করলে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় প্রকৃত ভূমির মালিক অর্থাৎ আদিবাসীদের বাড়িঘর পোড়ানো, হত্যা, হয়রানিমূলক মামলা ও উচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটেছে। অন্য আরেকটি জায়গায় খাস পুকুরপাড়ে বসবাসরত আদিবাসীদের ইজারা নেওয়া পুকুরে মাছ মূলধারার জনগোষ্ঠী কর্তৃক লুট হয়। এতে বাধা দিতে গিয়ে এক আদিবাসী ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে উপজেলা প্রশাসন মূলধারার জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ হয়।

সেবা প্রদানে বৈষম্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'অস্পৃশ্যতা'র চর্চা বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষক কর্তৃক দলিত কলোনিতে অবস্থিত বিদ্যালয়ে বদলিকে শাস্তিস্বরূপ মনে করা হয়। শিক্ষক কর্তৃক দলিত শিক্ষার্থীদের বইখাতা স্পর্শ না করা এবং বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি না করার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। এক দলিত শিক্ষার্থীর বর্ণনামতে, 'মুসলমানরা আমাদের সাথে বসতে চায় না। আমাদের পেছনের বেঞ্চে বসতে বলে।' অপর এক দলিত শিক্ষার্থীর বক্তব্য, '...ওরা আমাদের প্রায়ই বলে, তোমাদের গায়ে গন্ধ। এখান থেকে সরে যাও।' আবার বিরূপ আচরণের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের 'জাত তুলে' গালি দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার দলিত শিক্ষার্থীকে দিয়ে বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া একই অপরাধে মূলধারার শিক্ষার্থীদের কিছু না-বলা এবং দলিত শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে মূলধারার অভিভাবকরা তা সহজে মেনে নেবে না ভেবে ফল প্রকাশে বিলম্ব এবং সনদ দিতে সময়ক্ষেপণের উদাহরণ রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান : স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানেও 'অস্পৃশ্যতা'র চর্চা বিদ্যমান। দলিত পরিচয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা জরুরি সেবা নিতে যাওয়া রোগীকে স্পর্শ করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হবে বলে প্রাথমিক 'চেক-আপ' না করেই ওষুধ লিখে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে কটূক্তি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। এক আদিবাসী ব্যক্তি উপজেলা হাসপাতালে সেবা নিতে গেলে তার প্রতি কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, 'আপনি এখানে এসেছেন কেন? আপনাদের তো মিশনারি হাসপাতাল আছে, সেখানে যান।' কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে যাওয়া অপর এক দলিত নারী বলেন, 'চোখের সামনে চেয়ারম্যানের মেয়েকে ওষুধ দিল, আর আমাদের ধমক দিয়া বের করে দিল।' কোনো কোনো ক্ষেত্রে শয্যা খালি থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী ও দলিত রোগীকে মেঝেতে থাকতে বাধ্য করা হয়। এক আদিবাসী প্রসূতির প্রতি উপজেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, 'তুমি সাঁওতাল, তুমি মেঝেতেই থাকতে পারবে।' অন্যদিকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মুমূর্ষু রোগীর অক্সিজেন সংযোগ খুলে নিয়ে মূলধারার রোগীর জন্য ব্যবহারের উদাহরণও রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : অনেক ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনে আদিবাসী ও দলিত প্রতিবন্ধী, বয়স্ক পুরুষ, বয়স্ক ও বিধবা নারী, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার না দিয়ে তুলনামূলক স্বচ্ছলদের অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এক আদিবাসী অভিভাবক থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত সন্তানের জন্য সহায়তা চেয়ে গেলে তার প্রতি এক সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন, 'আপনার বাচ্চার রক্তের টাকাও সরকার দেবে নাকি?' আবার সহায়তা প্রদানেও বৈষম্য করা হয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দলিত ও আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসবের সময় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে সহায়তা প্রদান না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ভূমিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান : আদিবাসী ও দলিতরা খাসজমির জন্য আবেদন করলেও অনেকাংশে পরিচয়ের কারণে তা অগ্রাহ্য করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের গোত্রভিত্তিক বসবাসের সংস্কৃতি বিবেচনায় না নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে খাসজমি বরাদ্দ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফলে বরাদ্দ ফলপ্রসূ না হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। আবার দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে সহায়তা না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীরা আদিবাসী ও দলিতদের জমি দখল করলে তা উদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইলেও পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান : সালিসে জনপ্রতিনিধিরা অনেকাংশে অন্যায়ের শিকার আদিবাসী বা দলিতদের পরিবর্তে মূলধারার ক্ষমতাধরদের পক্ষাবলম্বন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে সালিসের ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের ওপর তাদের অনাস্থা তৈরির উদাহরণ রয়েছে। জমি দখল হয়ে গেলে চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন না হওয়া প্রসঙ্গে এক দলিত নারী বলেন, 'কার কাছে বিচার চাইতে যাব? তাদের আত্মীয়রাই তো জমি দখলের সাথে জড়িত।'

আবার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা প্রদানে অবহেলার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে আদিবাসী ও দলিত-অধ্যুষিত জনপদে রাস্তা তৈরি বা মেরামত করা হয় না।

এ ছাড়া তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানের উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয় না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের ঘটনাও ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করতে দলিতদের ঘরের চারপাশে ময়লার স্তূপ বানিয়ে থাকার পরিবেশ নষ্ট করার এবং উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসন না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিপরীতভাবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অকার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের উদাহরণও রয়েছে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে বসবাসের অনুপযোগী জায়গায় দলিতদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আবার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শহরের বাইরে দূরবর্তী স্থানে পুনর্বাসন করা হয়। এতে তাদের যাতায়াত খরচের অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হয়। ফলে তারা শহরে ফিরে বাস্তুহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

সেবা প্রদানে শুদ্ধাচারের ঘাটতি

শিক্ষাসেবা : শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততায় ঘাটতি রয়েছে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তি এবং দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত তথ্যের যথাযথ প্রচার করা হয় না বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে অনিয়মও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক তাদের সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এমন আদিবাসী ও দলিত ব্যক্তির সন্তানদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ম ভঙ্গ করে দলিত শিক্ষার্থীদের প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কারণে শিক্ষা উপবৃত্তি লাভে সমস্যা হলে তা সমাধানের নামে ২০০-৩০০ টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে, যদিও এ বিষয়টি মূলধারার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। আবার অভিযোগ গ্রহণ-নিষ্পত্তিতে ঘাটতি লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের ভাষা শুনে বিদ্রূপাত্মক আচরণ করা বিষয়ে শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেও প্রতিকার না পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে আদিবাসী ও দলিত শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে 'হোম ভিজিট' করতে অনীহার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার আদিবাসী ভাষায় প্রণীত পাঠ্যবই বিতরণ ও পাঠদান হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ থেকে তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা : স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন আদিবাসীদের জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য কর্মসূচি সম্পর্কে আদিবাসী এমনকি স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের মধ্যেও তথ্যের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ বিদ্যমান, যদিও তা মূলধারার ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। তবে দলিত ও আদিবাসী প্রসূতিদের কার্ড থাকলেও সন্তান প্রসবের সময় নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার দলিত ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রসূতি কার্ড প্রদানের বিনিময়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিও উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত পাড়ায় গর্ভকালীন সেবা এবং শিশুদের প্রাথমিক টিকা নিশ্চিত করতে তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টিকা না দেওয়ায় চট্টগ্রাম জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী শিশুর মৃত্যু হলেও টিকা কার্যক্রম তদারকিতে ব্যর্থতার দায়ে যথাযথ জবাবদিহি না হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বদলি করা হয় মাত্র।

সারণি ১ : স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
বহির্বিভাগ	২০-১০০	সন্তান প্রসব	১০০-৯,০০০
জরুরি বিভাগ	১০০-২০০	প্রসূতি সেবা কার্ড	৫০০-৩,০০০
রোগ নির্ণয়	১০০-৪৫০		

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণে ঘাটতি বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে প্রচার এবং উপকারভোগী নির্বাচনে তাদের সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার তালিকাভুক্তিতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। জনপ্রতিনিধিরা তাদের পছন্দের লোক, ভোটের হিসাব, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার সহায়তা বিতরণেও অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গির্জা ও মন্দিরের জন্য বরাদ্দ, দলিত ভাতা ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা এবং বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মীয় উৎসবের সময় একেকটি গির্জা ও মন্দিরের নামে এক টন চাল বরাদ্দ থাকলেও চাল না দিয়ে নগদ টাকা প্রদান করা হয়। এক টন চালের দাম বাজারদর অনুযায়ী কমপক্ষে ২৫-৩০ হাজার টাকা হলেও ১২-১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার অন্য একটি এলাকায় আদিবাসীদের চাহিদা যাচাই না করেই গরু কিনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গরুর আকার ছোট-বড় হলেও প্রতিটির একই দাম (৪০ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে গরুর মূল্য বিশ্বাস না করায় এবং মূল্য দুই বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে জেনে গরু নিতে অনীহা প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তার মন্তব্য করেন, ‘তাদের মধ্যে অনেক জটিলতা-কুটিলতা আছে।’ অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে তদারকির ঘাটতিও লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তি ও বরাদ্দ বিতরণে তদারকির ঘাটতি স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় এ ক্ষেত্রে তদারকি ফলপ্রসূ হয় না।

সারণি ২ : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকাভুক্তিতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
বয়স্ক ভাতা	৫০০-৫০০০	ভিজিএফ/ভিজিডি	১,০০০-২,০০০
প্রতিবন্ধী ভাতা	১,০০০-৫,০০০	গৃহ নির্মাণ	৬,০০০-২০,০০০
বিধবা ভাতা	৫০০-২,০০০	দলিত ভাতা	১,৫০০-২,০০০
মাতৃত্বকালীন ভাতা	৫০০-৪,০০০		

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা : এ ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে বিভিন্ন সনদের জন্য নির্ধারিত ফি সম্পর্কে আদিবাসী ও দলিতরা জানতে চাইলে সঠিক তথ্য দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার জন্মসনদসহ অন্যান্য সনদ নিতে গিয়ে পরিচয়ের কারণে তাদের বিদ্রূপাত্মক আচরণ, হয়রানি ও সময়ক্ষেপণের শিকার হতে হয়। অন্যদিকে সালিসসহ অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও সেবা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিও বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় জনপ্রতিনিধিদের নামে অভিযোগ দায়ের হয় না। আবার অভিযোগ দায়ের করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তদারকির ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

সারণি ৩ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
জন্মসনদ	১০০-৭০০	সালিস	১,০০০-৮০,০০০
আদিবাসী সনদ	৩৫০-৫,০০০	ট্রেড লাইসেন্স	৩,০০০-৬,০০০

ভূমিসেবা : জলমহাল ইজারায় দুর্নীতি লক্ষণীয়। প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার যোগসাজশে আদিবাসী ও দলিত মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা না দিয়ে ভুয়া সমিতিকে প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে নিয়মের অপব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে। যেমন আদিবাসীদের জমি বিক্রিতে জেলা প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণের নিয়ম বিদ্যমান। এই অতিরিক্ত ধাপের কারণে তাদের বেশি হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের জমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যদের নামে রেকর্ড করা এবং সংশোধনের নামে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ বিদ্যমান। অন্যদিকে প্রভাবশালীদের জমি দখলে সহায়তা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে আদিবাসীদের জমির দলিল প্রভাবশালীদের প্রদান করে ভুয়া দলিল বানাতে সহায়তা করা হয়।

সারণি ৪ : ভূমিসেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
নিবন্ধন	৪,০০০-৪০,০০০	রেকর্ড	১০০-১০,০০০
মিউটেশন	৪,০০০-৫,৮৫০	নথি উত্তোলন	৫০০-১,৮০০

অন্যান্য সেবা : চাকরি প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে না পারায় চাকরি না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও প্রভাবশালীদের বাধায় চাকরি না পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ছাড়া চাকরি প্রাপ্তিতে আদিবাসী কোটার সুফল না পাওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গ

করে মূলধারা থেকে ২০ শতাংশের অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগর দৃষ্টান্তও রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ-সংযোগে দুর্নীতির উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে বিদ্যুৎ-সংযোগের জন্য মূলধারার গ্রাহকদের তুলনায় বেশি পরিমাণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও সংযোগ না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের মামলা গ্রহণ না করা এবং তাদের ধর্মীয় উৎসবে পুলিশি নিরাপত্তা না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

সারণি ৫ : অন্যান্য সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা
বিদ্যুৎ সংযোগ	১,৫০০-১৩,০০০
চাকরি	২০,০০০-৬,০০,০০০

আদিবাসী ও দলিতদের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও অনিয়ম

সেবাপ্রদানকারীদের অংশ হিসেবে ক্ষমতায়িত আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতির কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। যেমন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকাভুক্তিতে নিজ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় এবং শিক্ষাবৃত্তির উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষক কর্তৃক স্বজনপ্রীতির উদাহরণ রয়েছে। আবার সেবাপ্রদানকারীদের একাংশের যোগসাজশে আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন গোত্রপ্রধান কর্তৃক উপকারভোগী নির্বাচনকারীদের সাথে যোগসাজশ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে নিজেদেরই উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে আদিবাসী ও দলিতদের প্রভাবশালী অংশ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগসাজশ করে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বরাদ্দকৃত সহায়তা বণ্টনে প্রভাবিত করা, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সেবাপ্রদানকারীদের অনিয়ম-দুর্নীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করার বিষয়টিও লক্ষ করা গেছে। আবার মূলধারার প্রভাবশালী ও দুর্নীতিপ্রবণ সেবাপ্রদানকারীদের প্রলোভনে পড়ে নিজ জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে যাওয়ার বিষয়টিও লক্ষ করা যায়। যেমন অর্থের বিনিময়ে ভুয়া মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিকে সমর্থন দিয়ে জলমহাল ইজারা পেতে সহায়তা করা এবং ব্যক্তিগত শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে হয়রানি করতে সহায়তা করার অভিযোগ উল্লেখ করা যায়।

আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি অধিকার বঞ্চনা, বৈষম্য ও শুদ্ধাচারের ঘাটতির প্রভাব

আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি অধিকার বঞ্চনা, বৈষম্য ও শুদ্ধাচারের ঘাটতির কারণে আদিবাসী ও দলিতদের ওপর নানা প্রভাব বিদ্যমান।

শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া : ভাষার প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণ, বাড়ি থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের দূরত্ব, শিক্ষা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে জবাবদিহির ঘাটতির কারণে আদিবাসী ও দলিত পরিবারের শিশুরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে।

অবিশ্বাস ও সরকারি সেবার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি : সরকারি সেবা নিতে গিয়ে নানা ধরনের বৈষম্য ও অনিয়মের শিকার হওয়ায় আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেবা নেওয়ার ব্যাপারে একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এ অবিশ্বাস থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের বা বিকল্প পন্থায় করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে গ্রাম্য ডাক্তার ও ওঝাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বেড়ে গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিও তাদের একধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে সালিসের ব্যাপারে। কারণ তাদের ভাষায় চেয়ারম্যান-মেম্বাররা সালিস থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়া : আদিবাসী ও দলিতরা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া এমনকি ভোটদান থেকেও বিরত থাকে।

আত্মপরিচয়, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি : আদিবাসী ও দলিতদের বিদ্যালয়সহ নানা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এতে পরিবারপর্যায়েও বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। এ ছাড়া বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব এবং আদিবাসী ও দলিতদের আত্মপরিচয়, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এগুলোর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে।

প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনের ঝুঁকি : অধিকার থেকে বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুর্নীতির কারণে আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। তারা সম্পদের অভিগম্যতা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। আবার সেবা ও সম্পদ থেকে বঞ্চনার প্রভাবে তাদের মধ্যে প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে না। ফলে আদিবাসী ও দলিতদের প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

উপসংহার

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিতে আদিবাসী ও দলিতদের জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়, ঐতিহাসিক বঞ্চনার বিষয় ও অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত ও স্বীকৃত নয়। এ ছাড়া সমাজে প্রবহমান 'অস্পৃশ্যতা' ও বৈষম্যের সংস্কৃতি স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিফলিত হয়। ফলে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকাশ পায়। আবার অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে আদিবাসী ও দলিতরা তাদের পৃথক জাতিসত্তা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয় এবং তাদের এ অভিজ্ঞতা মূলধারার জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার তুলনায় নেতিবাচক। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অধিকার পূরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিতে বৈষম্যমূলক চর্চা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। আর এ প্রতিবন্ধকতা সেবা প্রদান করতে অস্বীকার করা, সময়ক্ষেপণ, হয়রানি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করা, প্রভাবশালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতায় বাধা ইত্যাদির

মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার বিদ্যমান পদক্ষেপ বাস্তবায়নে জন-অংশগ্রহণ, চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যথেষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান। পরিশেষে বলা যায় যে আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবাপ্রাপ্তিতে অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ দূরীভূত না হলে তাদের প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন অবশ্যম্ভাবী। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য অনার্জিতই থেকে যাওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান।

সুপারিশ

১. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিসত্তা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসীবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

২. যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীগুলো চিহ্নিত করে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বিদ্যমান আইন ও নীতিকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

৪. খসড়া বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫. সব আদিবাসী ও অবাঙালি দলিত শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা।

৬. সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং তাদের জমির মালিকানা সমস্যার কার্যকর নিষ্পত্তি।

৮. জলমহাল, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে আদিবাসী ও দলিতদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯. সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আদিবাসীদের পাশাপাশি দলিতদের জন্যও কোটা সুবিধার বিধান করা– প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে 'উপজাতি' কোটা পুনর্বহাল করা এবং বিদ্যমান কোটার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১০. স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতাকাঠামোয় আদিবাসী ও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান।

১১. আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার উন্নয়নে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেই পদক্ষেপ কার্যকর করতে জন-অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকাঠামো তৈরি ও সেগুলোর চর্চা নিশ্চিত করা।

১২. দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক সেবাগুলো নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পৃথক তদারকি ব্যবস্থা তৈরি।

১৩. আদিবাসী ও দলিতদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার কমিশনসহ গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সোচ্চার ভূমিকা পালন করা।

সহায়ক গ্রন্থ

আলী, কে এস (২০১৪) বাংলাদেশ পোস্ট ২০১৫ : অ্যাড্রেসিং সোশ্যাল এক্সক্লুশন, ঢাকা।

আলী, এম এ (২০১৩) '*সোশ্যাল এক্সক্লুশন অ্যান্ড পোভার্টি ইন বাংলাদেশ*', তিতুমীর, আর এ এম (সম্পাদিত), মেজারিং মাল্টি ডাইমেনশনালিটি স্টেট অব পোভার্টি ইন বাংলাদেশ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

গোস্বামী, এইচ (২০০৪) '*এভরিডে ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন এক্সপেরিয়েন্সড বাই দ্য মাইনরিটি : এন এক্সপ্লরেটরি স্টাডি ইন এ ভিলেজ ইন বাংলাদেশ*', জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন, ভলিউম ১০, নম্বর ২, পৃষ্ঠা ১২১-১৫০।

চৌধুরী, আই ইউ (২০০৯) কাস্ট বেজড ডিসক্রিমিনেশন ইন সাউথ এশিয়া : এ স্টাডি অব বাংলাদেশ, ওয়ার্কিং পেপার সিরিজ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব দলিত স্টাডিজ, নিউ দিল্লী।

বিল, জে এবং পিরন, এল (২০০৫) ডিএফআইডি সোশ্যাল এক্সক্লুশন রিভিউ, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, লন্ডন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (২০১৬) স্টেট অব দ্য মারজিনালাইজড কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

মোসে, ডি (২০১০) '*এ রিলেশনাল অ্যাপ্রোচ টু ডিওর‍্যাবল পোভার্টি, ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড পাওয়ার*', জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ৪৬(৭) : ১১৫৬-১১৭৮।

ডারহাজেন, জি এবং ইসলাম, এম (২০০৬) কনসালটেটিভ মিটিং অন দ্য সিচুয়েশন অব দলিত ইন বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক/ বাংলাদেশ দলিত হিউম্যান রাইটস।

নাসরীন, এম এবং তাতে, এস (২০০৭) সোশ্যাল ইনক্লুশন : জেন্ডার অ্যান্ড ইকুইটি অ্যান্ড এডুকেশন ইন সাউথ এশিয়া– বাংলাদেশ কেস স্টাডি, ইউনিসেফ রিজিওনাল অফিস ফর সাউথ এশিয়া, কাঠমান্ডু।

সরকার, পি এবং ড্যাবেই (২০০৭) '*এক্সক্লুশন অব ইনডিজেনাস চিলড্রেন ফ্রম প্রাইমারি এডুকেশন ইন দ্য রাজশাহী ডিভিশন অব নর্থওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ*', ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনক্লুসিভ এডুকেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭

সেন, এ (২০০০) ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী।

শফি, এইচ এবং কিলবি, পি (২০০৩) '*ইনক্লুডিং দ্য এক্সক্লুডেড : এথনিক ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থওয়েস্ট বাংলাদেশ*', লেবার অ্যান্ড মানেজমেন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট জার্নাল, ভলিউম ৪, নম্বর ৩।

সিলভার, এইচ (২০০৭) দ্য প্রসেস অব সোশ্যাল এক্সক্লুশন : দ্য ডিনামিকস অব অ্যান্ড এভোলভিং কনসেপ্ট, ক্রনিক পোভার্টি রিসার্চ সেন্টার, রোড আইল্যান্ড।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত

চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

দিপু রায়, মো. গোলাম মোস্তফা ও মো. রবিউল ইসলাম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা-শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছে ৭৮ দশমিক ৯৫ মিলিয়ন কেজি এবং জিডিপিতে চা-শিল্পের মোট অবদান ১ হাজার ৮২৫ দশমিক ২৫ কোটি টাকা। চা-শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় পাঁচ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত মোট চা-বাগানের সংখ্যা ১৬৪টি, যার মধ্যে মূলধারার চা-বাগান রয়েছে ১৫৬টি; যেখানে আবাসিক শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব প্রথাগত চা-বাগান প্রধানত মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত, যেখানে ১ লাখ ২২ হাজার ৮৪০ জন শ্রমিক রয়েছে, যাদের মধ্যে ২১ হাজার ৯৯৭ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করছেন। এসব চা-বাগান ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক এনে কাজ করানো হয়। এসব বাগানে শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করছেন, তাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার রক্ষা ও তাদের সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তিদানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যা চা-শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য। এ ছাড়া চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে আইনকানুন প্রণয়ন ও সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন শ্রমনীতি, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও শ্রমিক-মালিকের দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, রেশন, ভবিষ্য তহবিলসহ বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চা-শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; যার ফলে চা-শ্রমিকদের জীবনমানে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি, নলকূপের পানি পান করা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, আগের তুলনায় মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি। তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, সভা সেমিনার ও গণমাধ্যমে এখনো তাদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে

* ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

পিছিয়ে থাকার তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে চা-শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। টিআইবি প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), শ্রীমঙ্গলের (যেখানে দেশের বেশির ভাগ চা উৎপাদন হয়) পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে চা-শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও অধিকার প্রাপ্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও এর থেকে উত্তরণের মাধ্যমে চা-শিল্পের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; চা-শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

এই গবেষণায় শুধু প্রথাগত চা-শ্রমিকদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা বাগানে স্থায়ীভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানে বসবাস করেন, যাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও মজুরি বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়ার নিয়ম রয়েছে এবং যারা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলায় বসবাস করেন। চা-শ্রমিকদের অধিকার ও কর্ম পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য মজুরি, বাসস্থান, চাকরি প্রাপ্তি, ভাতা, রেশন, সঞ্চয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, শিশুসদন ও বিনোদনব্যবস্থা ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই গবেষণায় চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকারসংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সীমাবদ্ধতা দেখার জন্য চা-বাগানের শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিল অফিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, চা-বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়, চা-বাগানের হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ, দলীয় আলোচনা, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল চা-শ্রমিক ও চা-শিল্পসংশ্লিষ্ট অংশীজন। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ও বিভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে

বাংলাদেশের ২২৯টি বাগানের মধ্যে ৬৪টি বাগানের ১ হাজার ৯১১ জন স্থায়ী শ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টারি ও ওয়েবসাইট।

গবেষণার ধারণাপত্র প্রণয়নের সময়ে চা-বাগান মালিকদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি চা সংসদের প্রতিনিধিদের সাথে দুইবার মতবিনিময় করা হয়। পরবর্তীকালে গবেষণার প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার আগে তাদের সাথে ফলাফল নিয়েও মতবিনিময় করা হয় এবং তাদের মতামত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইভাবে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথেও গবেষণার ফলাফল নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। এ ছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

আইনগত সীমাবদ্ধতা

চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩ ও ২০১৮), শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আইন ও বিধিমালায় চা-শ্রমিকদের দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রম আইনের ধারা ১১৫তে ছুটি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে 'প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন', যা চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে উল্লেখ করায় তারা এ ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১১৭ (১) অনুযায়ী কোনো দোকান বা বাণিজ্য বা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, সড়ক পরিবহন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা প্রতি ১৮ দিন কাজের জন্য এক দিন অর্জিত ছুটি পেলেও চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি ২২ দিন। আবার শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ধারা ২৬৩ (২) অনুযায়ী শ্রমিকরা তাদের চাকরি দুই বছর সম্পন্ন করে যেকোনো উপায়ে অবসর নিলে তার জমানো ভবিষ্য তহবিলের টাকার সাথে মালিকের অংশও সম্পূর্ণ পাবে, কিন্তু চা-শ্রমিকদের এর জন্য পুরো ১০ বছর কাজ করতে হবে (ধারা ২৯৩ (৩) অনুযায়ী)।

আইন ও বিধিমালায় কিছু সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে। যেমন শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৩২ (১) অনুযায়ী যেকোনো উপায়ে চাকরির অবসান ঘটলে ৬০ দিনের মধ্যে আবাসন ছেড়ে দিতে হবে, কিন্তু শ্রম বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যেকোনো শ্রমিক ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত হলে এক মাসের মধ্যে আবাসন ছেড়ে দিতে হবে। আবার বিধিমালায় আবাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রতি বৎসর বসবাসকারী শ্রমিকের শতকরা অন্তত দশ ভাগ শ্রমিকের জন্য অনুরূপ 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে'। কিন্তু 'মির্তিঙ্গা টাইপ'-এর কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় শ্রমিকরা কোন ধরনের ঘর পাওয়ার অধিকারী হবে তা জানতে পারেন না। ফলে তারা অনেক সময় প্লাস্টিকের চালাযুক্ত ঘর নিতেও বাধ্য হন। বিধিমালায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, 'লিখিতভাবে রেকর্ডকৃত সন্তোষজনক

কারণে মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিকদের জন্য "মির্তিঙ্গা টাইপ" গৃহ নির্মাণের বিধান শিথিল করিতে পারিবে।' এ ক্ষেত্রে 'সন্তোষজনক কারণ' কথাটির কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ না থাকা এবং 'মহাপরিদর্শকের মতামতের ভিত্তি'তে কথাটি উল্লেখের মাধ্যমে মালিকদের 'নির্দিষ্টসংখ্যক' ও 'মির্তিঙ্গা টাইপ' গৃহ নির্মাণ উভয় ধরনের বিষয়গুলোকে শিথিল করা হয়েছে।

শ্রম আইনে প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে ৮০ শতাংশ ও কল্যাণ তহবিলে ২০ শতাংশ হারে প্রদান করবে উল্লেখ থাকলেও কোনো বাগানেই তা করা হচ্ছে না। একইভাবে শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বিমা ও গ্র্যাচুইটির কথা শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও এখনো তারা তা পাচ্ছেন না। শ্রম বিধিমালায় চা-শ্রমিকদের ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসার সুযোগ থাকতে হবে বলে উল্লেখ থাকলেও [তফসিল ৫-এর বিধি ৬ (১ ও ২)] কোন কোন সেবা ও কতটুকু প্রদান করা হবে তার সীমা উল্লেখ না থাকায় শ্রমিকরা অনেক রোগের চিকিৎসা পাচ্ছেন না। আবার বিধিমালায় চা-বাগানে চিকিৎসাকেন্দ্র মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নির্দিষ্টসংখ্যক শয্যা, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, এক্স-রে বিভাগ ও ফিজিক্যাল থেরাপি বিভাগ থাকতে হবে উল্লেখ থাকলেও মহাপরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে এসব সুবিধা না থাকলেও চলবে উল্লেখ করে তা প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে। বিধিমালায় তফসিলে বর্ণিত বিধান কার্যকরকরণে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে মালিক লিখিতভাবে মহাপরিদর্শককে অবহিত করবেন উল্লেখ থাকলেও শ্রমিকদের মহাপরিদর্শকের কাছে অভিযোগ করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। আবার কুয়ার পানি বিশুদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও বিধিমালায় মালিক কর্তৃক পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে টিউবওয়েলের বিকল্প হিসেবে ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়া স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকারসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

চা-শ্রমিকরা দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা ভোগ করেন। কোনো শ্রমিক অবসরে গেলে কিংবা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লে তার পরিবারের একজন অস্থায়ী শ্রমিককে স্থায়ী হিসেবে চাকরি দেওয়া, বাগানের হাসপাতাল কিংবা ডিসপেনসারি থেকে কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ও তাদের পোষ্যদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সাপ্তাহিক অবসর ভাতা পাওয়া, স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির ৭ দশমিক ৫ শতাংশ হিসেবে ভবিষ্য তহবিল পাওয়া, ২০ দিন অসুস্থতাজনিত ছুটি পাওয়া যা শ্রম আইনে ১৪ দিন এবং ১৪ দিন উৎসব ছুটি পাওয়া; যা শ্রম আইনে ১১ দিন, ২ টাকা কেজি দরে রেশন পাওয়া ও একজন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য সর্বোচ্চ তিনজন পোষ্যর রেশন পাওয়া ও পাঁচটি বাগানে বিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে এসব ইতিবাচক দিক থাকলেও চা-বাগানের শ্রমিকরা এখন বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন, যা নিচে উল্লেখ করা হলো।

চাকরি স্থায়ীকরণ

শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিকের তিন মাস সন্তোষজনক শিক্ষানবিশকাল পার করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের কোনোটিতেই তা মানা হচ্ছে না। মাত্র ১৪টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্য থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ জনকে সরাসরি স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার জন্যও শ্রমিকদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত স্থায়ী শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ সরাসরি ও ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশকে পরিবারের অন্য সদস্যের পরিবর্তে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় যার মধ্যে ৯৪ দশমিক ৪ শতাংশকে গড়ে ছয় বছর অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরে স্থায়ী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জরিপে দেখা গেছে, ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতার খানায় অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত ছিল যারা ছয় মাস থেকে ৪০ বছর ধরে অস্থায়ী হিসেবে কর্মরত। মজুরিসহ বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে বলে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী করা হয় না। শ্রম আইনে শ্রমিকদের স্থায়ী করার সময়ে নিয়োগপত্র ও আইডি কার্ড দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না। নিয়োগপত্রের বিকল্প হিসেবে সি-ফরম দেওয়ার কথা মালিক-শ্রমিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও ৯২ দশমিক ৯ শতাংশকে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি।

মজুরি

চা-বাগানের শ্রমিকদের সর্বশেষ চুক্তিতে দৈনিক মজুরি মাত্র ১০২ টাকা ধরা হয়েছে যা দেশের অন্য খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কম। গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী চা-শ্রমিকরা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ মাসিক সর্বোচ্চ ৫ হাজার ২৩১ টাকা পান, যা বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙা (১৬ হাজার টাকা), ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ (১২ হাজার ৮০০ টাকা), অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড এনামেল (৮ হাজার ৭০০ টাকা), ফার্মাসিউটিক্যালস (৮ হাজার ৫০ টাকা), তৈরি পোশাক (৮ হাজার টাকা), স মিলস (৬ হাজার ৮৫০ টাকা), অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (৫ হাজার ৯৩০ টাকা) ও কটন ইন্ডাস্ট্রিতে (৫ হাজার ৭১০ টাকা) কর্মরত শ্রমিকের বেতনের তুলনায় কম। আবার ক্যাশ প্লাকিং, নিরিখের অতিরিক্ত পাতা তোলা ও অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো বাগানেই তা দেওয়া হয় না। এ ছাড়া ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২৮টি বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীদের সমান মজুরি দেওয়া হয় না যা শ্রম আইনের লঙ্ঘন।

পাতার ওজনকরণ ও কর্মঘণ্টা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৪টি বাগানের মধ্যে অধিকাংশ (৫৬টি) বাগানে অ্যানালগ কাটার মেশিনে পাতার ওজন করা হয়। মেশিনের ওজন পরিমাপের নির্দেশক একমুখী হওয়ায় তা শ্রমিকদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না। তবে আটটি বাগানে পাতার ওজন করার সময়ে ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করা এবং ওজনের পরিমাণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। কোনো শ্রমিক ওজনের পরিমাপ

নির্দেশক কাঁটা দেখার চেষ্টা করলে বাগানের বাবু তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন এবং কেউ কাঁটা দেখতে একটু জোর করলে তাকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপায়ে অলিখিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন সবচেয়ে দূরে কাজে পাঠানো, নজরদারি বাড়ানো, সামান্য ভুলে বকা দেওয়া ইত্যাদি। জরিপের সময় থেকে আগের এক সপ্তাহের পাতা উত্তোলনের হিসাব যারা বলতে পেরেছেন (৬০ দশমিক ৩ শতাংশ) তাদের মধ্যে ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক বিভিন্ন অজুহাতে পাতার ওজন কম দেখানোর কথা বলেন। এদের মধ্যে ৯২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক গামছার ওজনের অজুহাতে দৈনিক গড়ে ২ দশমিক ৯ কেজি, পরিবহনের সময় পাতা পড়ে যাওয়ার অজুহাতে ৮ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক গড়ে ২ দশমিক ৪ কেজি, বৃষ্টি হলে পাতার ওজন বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক গড়ে ৪ দশমিক ১ কেজি এবং কোনো কারণ ছাড়াই ১৮ দশমিক শূন্য শতাংশ শ্রমিক দৈনিক গড়ে ২ দশমিক শূন্য কেজি চা পাতা কেটে রাখা হয়েছে বলে জানান। এই হিসাবে জরিপের সময় থেকে বিগত এক সপ্তাহে সব চা-বাগানের মোট শ্রমিকদের (১ লাখ ৮৪৩ জন) পাতা উত্তোলনের ভরা মৌসুমে দৈনিক ১০২ টাকা হিসাবে ৩১ লাখ ২ হাজার ৪৩৫ টাকার সমমানের পাতা কেটে রাখা হয়।

কাজের পরিবেশ

শ্রম বিধিমালায় প্রতিটি চা-বাগানের কাজের জায়গায় (যাকে 'সেকশন' বলা হয় যেখানে শ্রমিকরা পাতা উত্তোলন ও অন্যান্য কাজ করেন) পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই স্থায়ী ব্যবস্থা যেমন নলকূপ বা কুয়ার ব্যবস্থা নেই। ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৪৪টি বাগানে একজন করে শ্রমিককে কাজের জায়গায় পানি সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। তবে ২১টি বাগানে নলকূপের পানি সরবরাহ করা হয় এবং ২৩টি বাগানে প্রবহমান ছড়া, ঝরনা, কুয়া, নদী বা খাল থেকে অস্বাস্থ্যকর পাত্রে পানি সংগ্রহ করে শ্রমিকদের দেওয়া হয়। তাদের পানি পানের জন্য কোনো পাত্র দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের কাজের স্থান বিশুদ্ধ পানির উৎস থেকে অনেক দূরে হওয়ায় ঘাড়ে করে পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা নিকটস্থ ছড়া বা খাল থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। শ্রম বিধিমালায় শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য প্রতি সেকশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও কোনো বাগানেই তা নেই। শ্রমিকদের কাজের জায়গায় বিশ্রামাগার থাকার বাধ্যবাধকতা বিধিমালায় উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগ বাগানেই তার ব্যবস্থা নেই, ফলে বৃষ্টির সময়ে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে হলেও বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রমিক নিরাপত্তা

বাগানে কাজ করার সময় সাপ, জোঁক ও বিষাক্ত পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে চা-বাগানে ওষুধ বা চুন ছিটানোর জন্য বারবার অনুরোধ করলেও অধিকাংশ বাগান কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। যেসব সেকশনে সাপ, জোঁক ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব খুব বেশি, সেসব সেকশনে কাজ করতে যাওয়ার সময় শ্রমিকরা নিজ উদ্যোগে শরীরে কেরোসিন মেখে যান। আবার কীটনাশক ছিটানোর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের (১৯ দশমিক ৮ শতাংশ) স্বাস্থ্যগত ক্ষতি থেকে

রক্ষার জন্য মাস্ক, গ্লাভস বা জুতা, চশমা, টুপি ইত্যাদি বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়ার নিয়ম থাকলে ৫৭ দশমিক শূন্য শতাংশ শ্রমিকদের বাগান থেকে কিছুই দেওয়া হয় না। ফলে এই কীটনাশক ও অন্যান্য ওষুধ শরীরে সরাসরি লাগানোর কারণে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ভুগতে হয়।

ছুটি

অধিকাংশ চা-বাগানের শ্রমিকরা বছরে সর্বোচ্চ ২০ দিন পর্যন্ত অসুস্থতাজনিত ছুটি নিতে পারেন। তবে এই ছুটি নেওয়ার জন্য বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রের দায়িত্বরত ব্যক্তির কাছ থেকে অসুস্থতাজনিত প্রতিবেদন নিতে হয়। এই প্রতিবেদন নেওয়ার জন্য অনেক সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে দায়িত্বরত ব্যক্তির জন্য চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়, যা কষ্টসাধ্য ও অমানবিক। জরিপ চলাকালে গত পাঁচ বছরে ১২ দশমিক শূন্য শতাংশ খানায় কমপক্ষে একজন স্থায়ী নারী শ্রমিক গর্ভধারণ করেছেন, যার মধ্যে ১০ দশমিক শূন্য শতাংশ খানার শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি পাননি এবং যারা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে ১০ দশমিক শূন্য শতাংশ খানার শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে মজুরি পাননি। মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগের তিন মাসে প্রাপ্ত মজুরির গড় হিসেবে মাতৃত্বকালীন মজুরি পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক বাগানেই ওই সময়ের হাজিরা (৮৫ টাকা) হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়।

উৎসব ভাতা

চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বিগত বছরে কমপক্ষে ২৫০ দিন কাজ করলেই কেবল শত ভাগ উৎসব ভাতা পাবেন। এর অন্যথা হলে বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কেটে রাখা হয়। জরিপে দেখা যায় যারা উৎসব ভাতা পেয়েছেন (৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ) তাদের মধ্যে ৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ শ্রমিক অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন হারে উৎসব ভাতা কম পেয়েছেন। দেখা যায় বাবুদের ঠিকমতো হাজিরা না তোলা, শ্রমিকদের জন্য কোনো সার্ভিসবুক চালু না থাকা এবং শ্রমিকদের কাজের দিনের হিসাব ঠিকমতো রাখতে না পারায় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অনুপস্থিত দেখিয়ে তাদের উৎসব ভাতা কম দেয়।

রেশন

শ্রমিকদের সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী পরিবারের সর্বোচ্চ তিনজন পোষ্য বাবদ রেশন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৬১টি বাগানের মধ্যে ৬টি বাগানে পোষ্যদের রেশন দেওয়া হয় না। জরিপে দেখা যায়, যারা রেশন পান (৮৫ দশমিক ৮ শতাংশ) তাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা সব সময় এবং ২৬ শতাংশ উত্তরদাতা মাঝে মাঝে ওজনে কম (গড়ে ৬২৯ গ্রাম) দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। রেশন কম দেওয়ার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০০ গ্রাম থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে যে যাদের নামে জমি বরাদ্দ আছে তাদের বিভিন্ন হারে রেশন কম দেওয়া হবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি কিয়ার (৩০ শতাংশ) জমির জন্য বছরে একজন শ্রমিকের ১৫০ কেজি রেশন কেটে নেওয়া হয়। প্রতি কেজি রেশনের (আটা) সর্বনিম্ন দাম ১৬ টাকা হলে বছরে ২ হাজার ৪০০ টাকা বাগান কর্তৃপক্ষ কেটে নেয়। কিন্তু

বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারকে বছরে ১ কিয়ার জমির জন্য খাজনা দিচ্ছে মাত্র ৯০ টাকা। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ শ্রমিক জানান, বাগান থেকে যে রেশন দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটে না। রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে একটি বৈষম্য বিদ্যমান। নারী স্থায়ী শ্রমিক হলে স্বামীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয় না কিন্তু পুরুষ স্থায়ী শ্রমিক হলে স্ত্রীকে পোষ্য হিসেবে রেশন দেওয়া হয়।

আবাসন

শ্রম বিধিমালায় বাগান মালিক কর্তৃক সব শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য বিনা মূল্যে বাসগৃহের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ৩২ হাজার ২৯৯ জন স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আলাদা কোনো আবাসন বরাদ্দ করা হয়নি। এ ছাড়া অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্যও কোনো আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। জরিপে দেখা গেছে, ৬৮ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিকের আবাসন বাগান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ প্রদান করেছে। ২১ দশমিক ৭ শতাংশ শ্রমিক তাদের আবাসন এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ বা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছেন, যেখানে বাগান মালিকের কোনো অবদান নেই। আর ১০ দশমিক ১ শতাংশ শ্রমিকের আবাসন আংশিক মালিক দিয়েছে এবং আংশিক শ্রমিকরা নিজ খরচে তৈরি করেছেন। বেশির ভাগ বাগানে যে নতুন ঘর দেওয়া হচ্ছে তাতে বাগান কর্তৃপক্ষ থেকে ঘরের চালের জন্য শুধু টিন আর কাঠ দিলেও বেড়া ও দরজা-জানালা দেওয়া হচ্ছে না, যদিও বেড়া ও দরজা-জানালা বাবদ ৫ হাজার টাকা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ৯০ দশমিক ৬ শতাংশ আবাসন একটিমাত্র কক্ষসম্পন্ন, যার মাঝ বরাবর কোনো বেড়া নেই, যেখানে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউসহ গরু-ছাগল নিয়েও বসবাস করতে হয়। তবে তিনটি বাগানে কর্তৃপক্ষ কলোনির আদলে দুই কক্ষবিশিষ্ট কিছু নতুন আবাসন তৈরি করেছে, যেখানে শৌচাগারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আবার বিধিমালায় বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও অধিকাংশ বাগানে দীর্ঘদিন পুরোনো ঘর প্রয়োজন হলেও মেরামত করা হচ্ছে না। বছরে মেরামতের প্রয়োজনযোগ্য সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২৫ শতাংশ ঘর মেরামত করা হয়। জরিপে দেখা গেছে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ শ্রমিকের ঘর বাগান কর্তৃপক্ষ মেরামত করে দেয় এবং ২২ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক নিজ খরচে মেরামত করে নেন এবং বাকি ৪ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক জানান কর্তৃপক্ষ টাকা দিলে তারা নিজেরা মেরামত করিয়ে নেন। তবে বাগান কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ঘর মেরামত করানোর জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘদিন– কমপক্ষে এক মাস থেকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিজেরাই ঘর মেরামত করেন। একজন শ্রমিকের ভাষায়, 'বছর পার হয়ে গেল টিন ফুটো হইছে, বৃষ্টিতে দেয়াল ভিজে ফাটল ধরছে, পঞ্চায়েতকে বললাম, ছোট সাহেবকে বললাম, বড় সাহেবকে বললাম, কেউ আমলে নেয়নি। দেয়াল ভেঙে পড়ে মারা গেলে তারপর সাহেবরা এসে ঘর মেরামত করে দেবে।'

আবাসস্থলে আলোর ব্যবস্থা

জরিপে দেখা গেছে, চা-বাগানের শ্রমিকদের ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ, ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ কেরোসিন ও ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ সোলারের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করেন। বিধিমালায় মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের বাসগৃহ ও আবাসিক এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার কথা উল্লেখ থাকলেও অনেক বাগানে বিদ্যুতের লাইন স্থাপনের জন্য সরকারকে প্রদেয় ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করে না। কোনো কোনো বাগানে থাম থেকে বাগান পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইন স্থাপন করার ব্যয় বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করলেও শ্রমিকদের আবাসনে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল শ্রমিককেই দিতে হয়। বাগানে শ্রমিকরা নিজ নামে মিটার আনতে পারেন না। বিদ্যুৎ বিল বাগানের মূল মিটারের নামে আসে যা শ্রমিকরা দেখতে পারেন না। কোনো কোনো বাগানে শ্রমিকদের নামে সাব মিটার দেওয়া হলেও সে মিটার অনুসারে বিল নেওয়া হয় না, প্রকৃত বিলের তুলনায় বেশি নেওয়া হয়। সাধারণত একটি বাতি জ্বালিয়ে ৩০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করতে হয়। যেসব বাগানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে শ্রমিকদের নিজ খরচে বা এনজিও কর্তৃক সোলার ও কেরোসিনের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করতে হয়, যেখানে মালিকদের কোনো ভূমিকা নেই।

আবাসস্থলে খাবার পানি সরবরাহ

জরিপে দেখা গেছে শ্রমিকদের ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ টিউবওয়েল, ১৬ দশমিক ১ শতাংশ কুয়া ও ৯ দশমিক ৫ শতাংশ সাপ্লাইয়ের পানি পান করে। নিয়ম অনুসারে বাগান কর্তৃপক্ষকে কমপক্ষে ২৫টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ বা ঢাকনাযুক্ত পাকা কুয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৫টি বাগানে কোনো নলকূপ নেই। কোনো কোনো বাগানে প্রায় ১৫০টি পরিবারের জন্য একটি নলকূপ রয়েছে। কোনো কোনো বাগানের আবাসনে বাগান কর্তৃপক্ষ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা করেনি। তারা শুধুই কুয়ার পানির ওপরে নির্ভরশীল। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কুয়ার পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর, ঘোলাটে, এগুলোর কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা বা ঢাকনা নেই, কুয়াগুলো এমন নিম্ন জায়গায় অবস্থিত যে তার পানি সুরক্ষা করাও সম্ভব নয়, বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন ময়লা কুয়ার পানিতে ঢুকে যায়, কোনো কোনো কুয়ার মধ্যে ব্যাঙসহ বিভিন্ন পোকা-মাকড় বাস করে। অন্যদিকে যেসব বাগানে সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহার করা হয় তার কোনো কোনোটিতে সব সময় পানি সরবরাহ করা হয় না; সকালে এক ঘণ্টা ও বিকেলে এক ঘণ্টা মাত্র পানি দেওয়া হয়। কোনো কোনো বাগানে দিনের পর দিন পানি সরবরাহ থাকে না।

আবাসনে শৌচাগারের ব্যবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে, প্রতিটি বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আবাসিক সুবিধার সাথে সাথে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শৌচাগারের ব্যবস্থা করবে। তথ্যদাতাদের মতে, ৪৬টি বাগানে বাগান মালিক কখনো কোনো শৌচাগারের ব্যবস্থা করেনি। জরিপে দেখা গেছে ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা শৌচাগার ব্যবহার করলেও তাদের ৫৫ দশমিক ৪ শতাংশ স্বাস্থ্যসম্মত

শৌচাগার ব্যবহার করে না। যারা শৌচাগার ব্যবহার করে, তাদের ৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ শৌচাগার নিজে তৈরি করেছেন বলে জানান। মাত্র ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ শৌচাগার বাগান কর্তৃপক্ষ তৈরি করে দিয়েছে এবং বাকি ৭ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমিকের শৌচাগার এনজিও বা ইউনিয়ন পরিষদ বা প্রতিবেশী তৈরি করে দিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। শৌচাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চা-শ্রমিকদের আগের অনীহা দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার চা-বাগান এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে।

চিকিৎসা

প্রতিটি বাগানে একটি করে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম থাকলেও জরিপকৃত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৫৩টি বাগানে চিকিৎসাকেন্দ্র বা ডিসপেনসারি আছে। একইভাবে এসব চিকিৎসাকেন্দ্র বা ডিসপেনসারিতে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ দুই ধরনের চিকিৎসাসেবা থাকার কথা বিধিমালায় উল্লেখ থাকলেও ৪১টি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা নেই। এই ৫৩টি চিকিৎসাকেন্দ্রের মধ্যে খণ্ডকালীন এমবিবিএস ডাক্তার রয়েছে ১৭টিতে, ৭টিতে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ৪৫টিতে ড্রেসার, ৪২টিতে কম্পাউন্ডার, মিডওয়াইফ ৩১টিতে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী রয়েছে ৪১টিতে। কোনো কোনো বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্র বলতে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, যেখানে মাঝে মাঝে কম্পাউন্ডার এসে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। যেসব বাগানে চিকিৎসাকেন্দ্র আছে তাদের ৩২টিতে শয্যা আছে, যাদের বেশির ভাগের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বেশির ভাগ শয্যা নোংরা, কোনো কোনো শয্যায় কভার নেই, অধিকাংশই ভাঙা যেখানে রোগীদের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাখা হয় কিন্তু ভর্তি করানো হয় না।

বেশির ভাগ চা-বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যসেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ডেলিভারি বা গুরুতর চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদের অন্য হাসপাতালে রেফার করলে তার খরচ বাগান কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে বলে পার্শ্ববর্তী কোনো সরকারি হাসপাতাল বা থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার মৌখিক পরামর্শ দেওয়া হয়। বাগানের ডিসপেনসারি থেকে ঘুরে-ফিরে সব রোগের জন্য নাপা বা প্যারাসিটামল-জাতীয় একই ওষুধ দেওয়া হয়। আবার হাসপাতালের কম্পাউন্ডার বা চিকিৎসক বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে যে পরিমাণ ও মানের ওষুধের চাহিদা দেয় কর্তৃপক্ষ তার তুলনায় কম ও নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করে।

জরিপের তথ্য অনুসারে ৭৫ দশমিক ৪ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন যাদের ২১ দশমিক ৯ শতাংশ ডাক্তার, ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ কম্পাউন্ডার, ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ নার্স বা ধাত্রী এবং ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ অন্যদের কাছ থেকে সেবা নিয়েছেন। বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে যারা সেবা নিয়েছেন তাদের ৩৮ দশমিক ৩ শতাংশ প্রয়োজনীয় সব ওষুধ পেয়েছেন, ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ আংশিক পেয়েছেন ও ৯ দশমিক ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা কোনো ওষুধ পাননি। শ্রমিকদের ৬১ দশমিক ৭ শতাংশকে বাইরে

থেকে ওষুধ কিনতে হয়েছে, যাদের ৭৯ দশমিক ১ শতাংশের কোনো খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করেনি। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বাগানের ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল থেকে নিযুক্ত চিকিৎসককে বাড়িতে এসে চিকিৎসা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক জরুরি প্রয়োজনে তা পাননি। আবার যারা (৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ) বাগানের বাইরের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ২৭ দশমিক ১ শতাংশকে বাগানের চিকিৎসা প্রদানকারী রেফার করেছিলেন বলে বাইরের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন; বাকি ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রের চিকিৎসায় ভালো না হওয়া, ডাক্তার না থাকা, ভালো ওষুধ না পাওয়া ও বাগানে চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকার কারণে বাইরের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। আর যারা বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন তাদের ৭০ শতাংশ বাগান থেকে কোনো চিকিৎসা খরচ পাননি, ১১ দশমিক ৫ শতাংশ আংশিক ও ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক পুরো খরচ বাগান থেকে পেয়েছিলেন। তবে চারটি বাগানের শ্রমিকদের বাগানের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণের সময় বাগানের পক্ষ থেকে কম্পাউন্ডার বা ড্রেসার নিজে তাদের সাথে থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং চিকিৎসার সামগ্রিক খরচ বাগান কর্তৃপক্ষ বহন করেন। যারা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে সেবা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ উত্তরদাতা বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রের সেবায় অসন্তুষ্ট।

শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা

বিধিমালা অনুসারে চা-শ্রমিকদের সন্তানদের বিনা মূল্যে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি বাগানে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে ২৪টি বাগানে কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, ৩২টি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩০টি বাগানে এনজিওর বিদ্যালয় রয়েছে। ৬টি বাগানে কোনো বিদ্যালয়ই নেই। জরিপে দেখা গেছে ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ পরিবারে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদের ৮৪ দশমিক ২ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায়। যারা বিদ্যালয়ে যায় তাদের ২১ দশমিক ৫ শতাংশ বাগানের বিদ্যালয়ে যায়, বাকি ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে যায়।

বাগানের বিদ্যালয়গুলোতে এক বা দুটি কক্ষে পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ দেন একজন শিক্ষক। বেশির ভাগ শিক্ষককে অস্থায়ী শ্রমিকদের মতো দৈনিক ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হয়। এসব বিদ্যালয়ে বসার পর্যাপ্ত বেঞ্চ, বিদ্যুৎ, আলমিরা বা কোনো আসবাব ও খেলার মাঠ নেই, সরকার প্রদত্ত বই ছাড়া কোনো শিক্ষা উপকরণও নেই। পড়ালেখার মান ভালো না হওয়ায় অভিভাবকরা শিশুদের সরকারি কিংবা এনজিও বিদ্যালয়ে পাঠায়। তবে পাঁচটি বাগানে কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যারা নির্দিষ্ট বেতন স্কেলে বেতন পান। সম্প্রতি সরকার কিছু বাগানের স্কুলকে সরকারীকরণ ঘোষণা করলেও এসব বিদ্যালয়ের অবকাঠামোতে তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বাগানের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারের উপবৃত্তি পায় না।

ভবিষ্য তহবিল ও অবসর ভাতা

শ্রম বিধিমালায় চাকরিতে এক বছর পূর্ণ করেছে এমন প্রত্যেক শ্রমিককে ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১১ দশমিক ৬ শতাংশ কর্মরত স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলের অন্তর্ভুক্ত নন বলে উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশ জানান যে তাদের বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা নেই, ১০ দশমিক ৪ শতাংশ মালিকের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে ও ৮ দশমিক ৬ শতাংশ বাবুদের গাফিলতির কারণে শ্রমিকের ভবিষ্য তহবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত করেনি বলে উল্লেখ করেন। আবার যেসব স্থায়ী শ্রমিক ভবিষ্য তহবিলে অন্তর্ভুক্ত তাদের ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ জানেন না যে তাদের টাকা নিয়মিত জমা হয় কি না। আবার বিধিমালায় শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের অর্থ জমানোর একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত বিবরণী বছর শেষে শ্রমিকদের কাছে সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ তথ্যদাতাকে কোনো নথি সরবরাহ করা হয়নি। যাদের নথি সরবরাহ করা হয় তাদের ৮৬ দশমিক ৬ শতাংশকে এক বছর পর পর নথি সরবরাহ করা হয়, যেখানে বাকিদের দুই অথবা তিন বছর পরপর নথি সরবরাহ করা হয়। শ্রমিকদের মতে বছর শেষে বা দুই-তিন বছর পরে নথি সরবরাহ করার কারণে তাদের পক্ষে হিসাব রাখা বা জানা সম্ভব হয় না যে তাদের ভবিষ্য তহবিলের টাকা সঠিকভাবে জমা হয় কি না।

অন্যদিকে ভবিষ্য তহবিল কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে ভবিষ্য তহবিলের টাকা সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে বাগান কর্তৃপক্ষের জমা দেওয়ার কথা থাকলেও সব বাগানের মধ্যে ২৭টি বাগানের টাকা দীর্ঘদিন ধরে ভবিষ্য তহবিল অফিসে জমা দেওয়া হয়নি। এ রকম দুটি বাগানে ভবিষ্য তহবিলের ১ দশমিক ৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আবার জরিপে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যাদের খানায় অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক আছে (১৭ দশমিক ১ শতাংশ) তাদের ৯০ দশমিক ৫ শতাংশ ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ পেয়েছিল যাদের প্রায় সবাইকে গড়ে ১ দশমিক ৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ১৫ বছর স্থায়ী হিসেবে কাজ করলে অবসরের পরের সপ্তাহে মাসিকভিত্তিক শ্রমিকরা ১০০ টাকা এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকরা ৬০ টাকা হিসেবে অবসর ভাতা পাবেন। কিন্তু জরিপে দেখা গেছে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক অবসর ভাতা পাননি।

বিনোদনের ব্যবস্থা

বিধিমালা অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে বিনোদন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩১টি বাগানে বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। তবে এই বিনোদন কেন্দ্র বলতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা নাচঘর, যা মূলত পূজামণ্ডপ হিসেবে বা কীর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। টিনের চালবিশিষ্ট কোনো বেষ্টনী ছাড়া এ নাচঘরে মূলত বিভিন্ন পূজা-পার্বণে আগে যাত্রাপালার আয়োজন করা হতো। বর্তমানে দু-একটি বাগানে তা চালু থাকলেও বেশির ভাগ বাগানে এ ব্যবস্থা নেই। এসব নাচঘরে কোনো অভ্যন্তরীণ বিনোদনের সরঞ্জাম নেই। তবে নয়টি বাগানের নাচঘরে ক্যারাম বোর্ড ও টিভি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। খেলার মাঠ রয়েছে ৪৮টি বাগানে, আর ২৭টি বাগানে কিছু কিছু বহিঃস্থ বিনোদনব্যবস্থা থাকার তথ্য পাওয়া

গেছে। তবে পাঁচটি বাগানে ১৬ ডিসেম্বর ও ২৬ মার্চ (বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস) উদযাপনের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ অল্প কিছু অর্থ দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বিজয়ী হয় তাদের বাগান কর্তৃপক্ষ পুরস্কার হিসেবে সস্তা বাটি ও গ্লাস বা অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করে।

ক্ষতিপূরণ

চাকরি চলাকালে তা থেকে উদ্ভূত দুর্ঘটনার ফলে কোনো শ্রমিক শরীরে জখমপ্রাপ্ত হলে বা মৃত্যুবরণ করলে মালিক তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু বেশির ভাগ বাগানে তা দেওয়া হয় না। কখনো কখনো ক্ষতিপূরণ হিসেবে সামান্য অর্থ প্রদান করে থাকে যা আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের তুলনায় অনেক কম। কখনো কখনো ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ কম দেখাতে চায়। একজন শ্রমিকের হাত কাটা পড়লেও তার এই অঙ্গহানির জন্য আইনে উল্লিখিত ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি, কারখানায় কর্মকালীন এক শ্রমিকের হাতের আঙুল কাটা পড়লেও কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি এবং একজন নারী শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখ নষ্ট হলেও তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

শিশুসদন

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী বাগান কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের জন্য শিশুসদন, শিশুদের দেখাশোনার জন্য একজন মহিলা, বাচ্চাদের জন্য দুধ বা নাশতা এবং উপযুক্ত খেলনা ও আসবাবের ব্যবস্থা করার নিয়ম থাকলেও ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৭টিতে শিশুসদন রয়েছে, আর ১০টিতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি জরাজীর্ণ ঘর থাকলেও কোনো কার্যক্রম নেই। যেসব বাগানে শিশুসদন চালু রয়েছে তার মধ্যে শৌচাগার রয়েছে ২টিতে, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রয়েছে ৬টিতে, দুধ ও নাশতা দেওয়া হয় ৬টিতে, খেলনা রয়েছে ৪টিতে। শিশুসদন না থাকায় যেসব নারী শ্রমিকের শিশু দেখাশোনার মতো বাড়িতে কেউ নেই তারা কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন কিংবা তাদের দীর্ঘ সময় কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এমন অনেক নারী শ্রমিক রয়েছেন যারা শিশু জন্ম দেওয়ার জন্য দীর্ঘসময় কাজে যেতে পারেননি বলে তাদের স্থায়ী শ্রমিক থেকে অস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা

বেশির ভাগ চা-বাগানের অবস্থান প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় এর যোগাযোগব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রেই ভালো নয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৪টি বাগানের মধ্যে ৩৯টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা ভালো, ৮টি বাগানে পৌঁছানোর রাস্তা মোটামুটি এবং ১৭টি বাগানে যাওয়ার রাস্তা খুবই খারাপ। আবার শ্রমিকদের কলোনি বা বাড়িঘরে যাওয়া-আসার রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশির ভাগ বাগানে খুবই শোচনীয়, যেমন ২৫টি বাগানের ভেতরে প্রকৃত অর্থে কোনো রাস্তা নেই। এসব বাগানের ঘরগুলো টিলার ওপরে অবস্থিত– এক টিলা থেকে আরেক টিলায় যেতে কখনো কখনো পানিও পার হতে হয়। তবে ৭টি বাগানের ভেতরের রাস্তা পাকা।

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা ও সমাধান

সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকরা সঠিকভাবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পেলে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তা পঞ্চায়েত অথবা ভ্যালি সভাপতি সংশ্লিষ্ট বাগানের ব্যবস্থাপকের সহযোগিতায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ তা সমাধানের চেষ্টা করবে। জরিপের সময় থেকে এক বছরে ১৯ দশমিক ২ শতাংশ শ্রমিক বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করেছেন যার ৩৮ দশমিক শূন্য শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে, ৫৮ দশমিক ২ শতাংশ অভিযোগের সমাধান হয়নি এবং ৩ দশমিক ৮ শতাংশ অভিযোগ চলমান রয়েছে। তবে অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি, অভিযোগ করে সমাধান না পাওয়া এবং শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা অভিযোগ করেন না বা করতে আগ্রহবোধ করেন না।

সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

দেশের বঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চা-শ্রমিকরাও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। জরিপের তথ্যমতে, ১১ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবারের কোনো না কোনো সদস্যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বয়স্ক ভাতা (৭২ দশমিক ৫ শতাংশ) ও বিধবা ভাতা (১১ দশমিক ৯ শতাংশ)। ব্যাংকের মাধ্যমে এসব ভাতার টাকা দেওয়া হয় বলে ভাতার টাকা প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে যাদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানের সম্পর্ক ভালো তাদের এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ। এ ছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চা-শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন' নামক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পাঁচ হাজার টাকা সমমূল্যের খাদ্য ও বস্ত্রসামগ্রী বিতরণের প্রকল্প চালু রয়েছে, যার আওতায় ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশ তথ্যদাতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে বিতরণকৃত খাদ্য ও বস্ত্রসামগ্রীর মান খারাপ ছিল এবং যে পরিমাণ দ্রব্য দেওয়ার কথা ছিল তার থেকে কম দেওয়া হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রমিক নির্যাতন ও তাদের সাথে অবমাননাকর আচরণ

নারী শ্রমিকরা কোনো ধরনের শারীরিক বা যৌন হয়রানিমূলক আচরণের শিকার হন কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাদের প্রায় ১ শতাংশ জানান যে নারী শ্রমিকদের সাথে বাবুরা খারাপ ব্যবহার করেন, খারাপ ভাষায় কথা বলেন, এলাকার অন্যান্য পুরুষ শ্রমিক যৌন নির্যাতন করেন, তাদের বিভিন্নভাবে বিরক্ত করেন ও স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, বিভিন্ন সময়ে নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলেও সামাজিক অবস্থা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা প্রকাশ করা হয় না। এ ছাড়া বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন অবমাননাকর আচরণ করে থাকে বলেও গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাগানের ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজারের সামনে কোনো শ্রমিক বা পঞ্চায়েত সভাপতির চেয়ারে বসতে না পারা, তাদের সামনে টুপি পরতে না পারা এবং ম্যানেজার কর্তৃক তুই করে কথা বলা ও শ্রমিক কর্তৃক জুতা পরানো ও খোলা উল্লেখযোগ্য।

মাদকাসক্তি

বর্তমানে বাগানে মদের ব্যবহারের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যবহার কিছুটা কমলেও এর পুরোপুরি অবসান হয়নি। প্রায় প্রতিটি বাগানে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান (পাট্টা) রয়েছে, যাকে ঘিরে বাগানে আরও অনেক অবৈধ মদের দোকান গড়ে উঠেছে। বাগানসংলগ্ন বাঙালি, এমনকি বাগানের শ্রমিকরা এসব অবৈধ ও ক্ষতিকর মদের ব্যবসার সাথে জড়িত। পুরুষ শ্রমিকরা তলব পাওয়ার দিনেই তাদের মজুরির একটি বড় অংশ মদ খাওয়ার পেছনে ব্যয় করেন। ফলে তাদের যেমন আর্থিক সচ্ছলতা ব্যাহত হয়, তেমনি তাদের পরিবারের ওপরেও একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

তদারকি প্রতিষ্ঠান : উপশ্রম পরিচালক, মৌলভীবাজার ও উপমহাপরিদর্শক, শ্রীমঙ্গল কার্যালয়

তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জনবলসংকট অন্যতম। উপশ্রম পরিচালক, মৌলভীবাজার কার্যালয়ে ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদের মধ্যে ১০টি এবং উপমহাপরিদর্শক (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল-ডিআইজি), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল শাখার মোট ১৭টি পদের মধ্যে ৫টি পদ শূন্য। জনবলের অভাবে এই কার্যালয়গুলো সঠিকভাবে বাগান পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আবার বেশির ভাগ বাগান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাবান এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের খুব কাছাকাছি থাকায় তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা তাদের চাপে সঠিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে ভয় পান।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকের ওপরে চা-বাগানের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বাগান পরিদর্শনের দায়িত্ব থাকলেও তাদের বেশির ভাগই তা সঠিকভাবে পালন করে না। বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে তাদের অনেকেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে। প্রতি পরিদর্শনে তারা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে। কোনো কোনো বাগানে যেতেও হয় না, তাদের কাছে সরাসরি টাকা পৌঁছে যায়। কখনো কখনো পরিদর্শনে গেলেও তারা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে কোনো প্রশ্ন তোলে না বা বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না। পরিদর্শনে আসার বিষয়ে বাগান ম্যানেজারদের জানানো হলেও শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষের কাউকে জানানো হয় না এবং শ্রমিকদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চায় না।

শ্রম আদালত ও ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়

বেশির ভাগ চা-বাগান সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এই অঞ্চলে চা-শ্রমিকদের অভিযোগ করার জন্য কোনো শ্রম আদালত নেই। তাদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালতটি চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায়

স্বল্প আয়ের চা-শ্রমিকদের পক্ষে চট্টগ্রামের শ্রম আদালতে গিয়ে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয় না। আবার ভবিষ্য তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডটি মালিকপক্ষের তিনজন, শ্রমিকপক্ষের তিনজন (যার একজন কর্মকর্তা পর্যায়ের ও দুজন নিরপেক্ষ) সদস্যসহ মোট আটজন সদস্য নিয়ে গঠিত। এখানে নিরপেক্ষ সদস্যরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীরব থাকেন এবং শ্রমিকপক্ষের কর্মকর্তা বেশির ভাগ সময় মালিকপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণে শ্রমিকপক্ষের তুলনায় মালিকপক্ষের ভোট বেশি হয় যা বিভিন্ন সময় শ্রমিকদের স্বার্থ ব্যাহত করে। এ ছাড়া ভবিষ্য তহবিল কার্যালয়ের কার্যক্রম ডিজিটালাইজ না হওয়া এবং শ্রমিকদের জন্য হাতে লেখা নথি সরবরাহ করায় সে হিসাব সঠিক আছে কি না, তা শ্রমিকদের বোঝার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন চা-শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে দর-কষাকষি করাসহ তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে। তবে এই ইউনিয়নের নেতাদের বেশির ভাগেরই শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালাসহ শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় বাগান কর্তৃপক্ষের মতো প্রভাবশালীদের সাথে দর-কষাকষিতে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সফল হয় না। দ্বিপক্ষীয় চুক্তি চূড়ান্তকরণে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের অসংখ্যবার ঢাকায় এসে সভা করতে হয় যা তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সর্বশেষ চুক্তির জন্য ইউনিয়নের নেতাদের ২২ বার ঢাকায় আসতে হয়েছে। চুক্তি করার জন্য একটানা কোনো সময় বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিতে চায় না। অন্য কাজ আছে বলে প্রতিবারে ১ থেকে ২ ঘণ্টা সময়ের বেশি সভায় বসতে চায় না। সভা করার জন্য বাগান মালিকরা নিজেরা না বসে তাদের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করতে বসান। বিভিন্ন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়ে মালিকদের কাছ থেকে সিদ্ধান্তের জন্য সময়ক্ষেপণ করেন। একইভাবে বাগান কর্তৃপক্ষের মতে চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায়ও চুক্তি স্বাক্ষরে দেরি হয়ে থাকে।

অন্যান্য সীমাবদ্ধতা

চা-বাগানের শ্রমিকদের বাগানে কিংবা চা কারখানায় কাজ করার জন্য কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না; বিশেষ করে যেসব শ্রমিক চা কারখানায় কাজ করেন তাদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চালিয়ে কাজ করতে হয়। এসব যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ছাড়া কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকেন। একইভাবে শ্রমিকদের মধ্যে তথ্য না জানার কারণে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হতে পারছেন না। ফলে তারা তাদের অধিকার আদায়েও দাবি উত্থাপন করতে পারেন না।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গত এক দশকে চা-শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা, শৌচাগার ব্যবহারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতির কারণে সামগ্রিকভাবে তারা এখনো দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাদের আইনগতভাবেই বঞ্চিত করে রাখা

হয়েছে। ফলে তাদের মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায্যতাই তৈরি হয় না যা তারা দাবি করতে পারেন। তা ছাড়া আইনগতভাবে প্রাপ্য অধিকার থেকেও চা-শ্রমিকরা রয়েছেন বঞ্চিত। সব সুবিধা দেওয়ার নামে তাদের দৈনিক যে মজুরি দেওয়া হয় তা দেশের অন্যান্য খাতের মজুরির তুলনা অনেক কম। ফলে শত বছর ধরে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছেন না। তাদের নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকা ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতির কারণে দিনের পর দিন বাধ্য হচ্ছের চা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করার চক্রের মধ্যে। তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে তারা জনবল স্বল্পতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বাগান কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাবে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে অধিকার আদায়ে দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দর-কষাকষি করতে পারছেন না। সর্বোপরি চা-শ্রমিকদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতসহ সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাগান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আরও আন্তরিক হলে চা-শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি চা-শিল্প আরও লাভজনক অবস্থানে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

সুপারিশ

চা-বাগানের শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য টিআইবির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. সরকার ও বাগান মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের অনুমতি সাপেক্ষে একটি যৌক্তিক, ন্যায্য এবং অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতি দুই বছর পর তা বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ করতে হবে। যেসব শ্রমিক কারখানায় ও কীটনাশক ছিটানোসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকবেন তাদের জন্য ন্যায়সংগত বাড়তি মজুরি ও ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া তাদের এসব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পোশাক, গ্লাভস ও নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. আইন, বিধিমালা ও সমঝোতা স্মারকের প্রয়োগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে নিশ্চিত করতে হবে–

- অস্থায়ী শ্রমিকদেরও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় সমান মজুরি প্রদান;
- সব শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গের জন্য বিধিমালায় নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা; বাগানের বাইরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ ও তা শ্রমিককে প্রদানসংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা শ্রমিকের চিকিৎসাসংক্রান্ত সব ধরনের খরচ করা;
- প্রতিটি চা-বাগানে শিশুদের জন্য শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধাসংবলিত শিশুসদন;

- সব স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা, দীর্ঘ দিনের পুরোনো ও জরাজীর্ণ ঘর অপসারণ করে দ্রুত নতুন ঘর নির্মাণ করা; প্রদেয় ঘরের ধরন (পাকা দেয়াল ও টিনের চাল) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিধিমালায় উল্লেখ ও তা কার্যকর করা;
- মালিক কর্তৃক বিদ্যুৎ-সংযোগ ব্যয় নিশ্চিত করা। প্রতিটি পরিবারের জন্য নিজস্ব মিটারের ব্যবস্থা করা ও দেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় শ্রমিকের নামে আলাদা বিল প্রেরণ;
- প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার;
- ক্ষতিপূরণ প্রদান;
- মর্নিং ও ক্যাস প্লাকিং তথা অতিরিক্ত পাতা তোলা বা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী মূল মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান;
- প্রতিটি সেকশন, আবাসন ও কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- প্রত্যেক স্থায়ী শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া এবং নিয়ম অনুসারে সার্ভিস বুক সংরক্ষণ করা;
- অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী করা; দীর্ঘকাল অস্থায়ী হিসেবে কাজ করার পরও একই কাজে আরও এক বছর শিক্ষানবিশকাল রাখা বন্ধ করা;
- নম্বরগুলোতে জোঁক ও পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- গর্ভধারণ মাসের আগের তিন মাসের গড় মজুরি হিসাব করে মাতৃত্বকালীন মজুরি প্রদান;
- গ্রুপ বিমা চালুকরণ;
- চা-শ্রমিকদের জন্য দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটির কাঠামো ঘোষণা করা।

৩. সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে শ্রমিক ও বাগান কর্তৃপক্ষের আলোচনা শেষ করতে হবে এবং চুক্তি নবায়নপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর করা যায়।

৪. উত্তোলনকৃত পাতার ওজন কম দেখানো বন্ধ করতে প্রতিটি বাগানের প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উভয়মুখী ডিসপ্লেসমৃদ্ধ ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে শ্রমিকরাও পাতা মাপার সময়ে পরিমাণ দেখতে পারেন। তা ছাড়া চাপাতা ওজন এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। পাশাপাশি সব বাগানের জন্য গামছা, পরিবহন ও বৃষ্টিজনিত কারণে পাতা কেটে রাখা বন্ধ করতে হবে।

৫. ভবিষ্য তহবিল অফিসের সব কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করতে হবে এবং প্রতি মাসে শ্রমিকের টাকা জমার বিষয়ে মুঠোফোন বা এজাতীয় সহজলভ্য কোনো মাধ্যমে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে নিয়ম অনুসারে অবসর গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বাগানগুলোতে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যকর পরিদর্শন বাড়াতে হবে। পরিদর্শনের প্রতিবেদনের অনুলিপি বাগান কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নকেও প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত আইনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি অনুযায়ী সব চা-শ্রমিকের সন্তানের জন্য বিনা মূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে। বাগান পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।

৮. ইতিমধ্যে স্থাপিত হাসপাতালের অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতসহ আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে। প্রতিটি বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে পৃথক প্রসবকক্ষ রাখতে হবে এবং শ্রমিকদের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসব করানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। চিকিৎসাকেন্দ্রে বিদ্যমান সব ওষুধের একটি হালনাগাদ তালিকা, চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার সময়সূচি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

৯. জমি লিজ দেওয়ার একটি নিয়ম বা আইন তৈরি করতে হবে। শ্রমিকদের রেশনের পরিবর্তে জমি দেওয়া বা জমি বরাদ্দের বিপরীতে রেশন কেটে রাখার নিয়মটি বন্ধ করতে হবে।

১০. শ্রমিকদের সহজ অভিগম্যতার জন্য সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানসংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে একটি শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে।

১১. চা-শ্রমিকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং আইন সম্পর্কে সচেতন করতে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত সদস্য ও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. প্রতিটি চা-বাগানে ডিডিএল কার্যালয় কর্তৃক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে একজন অভিযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তি নির্ধারণ এবং তার নাম দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন, একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন এবং অভিযোগ নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. প্রতিটি বাগানের শ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার, শ্রমিক ইউনিয়ন ও বিটিএকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠানে সরকারকে যথাসময়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪. মৃত শ্রমিকের সৎকারের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের একটি বরাদ্দ থাকতে হবে এবং তা সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ করতে হবে।

১৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন নামক প্রকল্পের মতো আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব প্রকল্পে খাদ্য ও বস্ত্রসামগ্রী বিতরণের পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। চলমান প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. মালিক কর্তৃক শ্রমিক কলোনিতে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের উন্নতি করতে হবে। সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে তাদের আবাসস্থল সহজ যোগাযোগ উপযোগী স্থানে নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

১৭. বাগানগুলোতে মদের দোকান বন্ধ করতে হবে এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার অভিযান চালাতে হবে।

১৮. প্রতিটি বাগানে পুরুষ সরদার নিয়োগের পাশাপাশি নারী সরদার নিয়োগ করতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন : অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ*

নাজমুল হুদা মিনা ও মো. মোস্তফা কামাল

প্রেক্ষাপট

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত, যা মোট দেশজ রপ্তানির ৮৩ দশমিক ৫১ শতাংশ[১] (২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৩০ দশমিক ৬১ মিলিয়ন ডলার[২]) এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১১ দশমিক ১৭ শতাংশ। এটি একটি শ্রমঘন প্রাতিষ্ঠানিক খাত। এ খাতে কর্মরত শ্রমিক ৪৪ লাখ। কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৬০ শতাংশ[৩] (তবে এটি ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৬৪ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশ) এবং দেশের মোট কর্মরত নারী শ্রমিকের ৬৪ শতাংশ তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত।

টিআইবির ২০১৩ সালে পরিচালিত গবেষণায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনাকে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণাটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, কারখানা নিরাপত্তা, শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণে টিআইবি কর্তৃক ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতের সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান ফলোআপ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তীকালে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

গবেষণাপদ্ধতি

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়,

---

* ২০১৯ সালের ২৩ এপ্রিল ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানার মালিক, পোশাকশ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির কাছ থেকে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময় ছিল এপ্রিল ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৯ এবং তথ্য সংগ্রহের সময়কাল মে ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০১৯।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি

২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এসব উদ্যোগের ৩৯ শতাংশের অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে, ৪৯ শতাংশের অগ্রগতি চলমান এবং বাকি ১২ শতাংশের বাস্তবায়ন ধীর বা স্থবির।

চিত্র ১ : বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের পর্যালোচনা

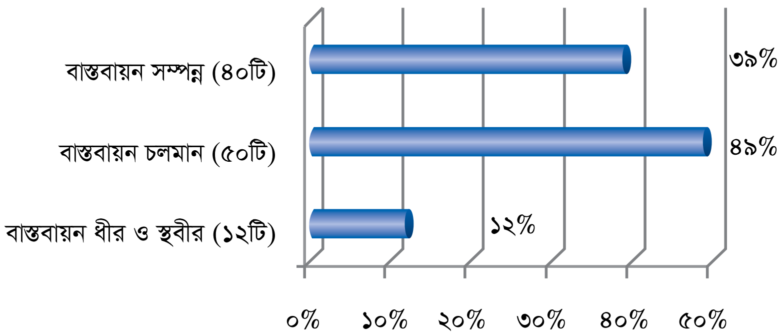

আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধন ২০১৩) সংশোধন করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থনের স্থলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থনের বিধান করা হয়েছে। আবার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথাক্রমে ২ লাখ টাকা এবং ২ লাখ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালাটিতে শ্রমিকদের জন্য বছরে দুটি উৎসব ভাতা এবং ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে। এ ছাড়া ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা বাস্তবায়নযোগ্য না হওয়া, মালগুদাম মাশুল অতিরিক্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মালিকপক্ষের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী আদেশে অগ্নিনির্বাপণ

বিধিমালা, ২০১৪ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় ও বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সিআইডি দায়েরকৃত মামলায় ২০১৫ সালে দণ্ডবিধি আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি ইমারত আইনের মামলায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় দুদকের দায়ের করা তিনটি মামলায় একটির চার্জশিট প্রদান, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় মার্চ ২০১৮ সালে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার তিন বছর এবং তার মায়ের ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৪] এর পাশাপাশি তাজরীন ফ্যাশনসের মালিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় ২০১৫ সালে তাজরীন ফ্যাশনস মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়।[৫] স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন মিলে ২০০৫ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে।

ব্যবসাবান্ধব নীতিসহায়তা

ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতিসহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই সহায়তার আওতায় তৈরি পোশাক ব্যবসায় নীতিসহায়তা বৃদ্ধি, যেমন করপোরেট ট্যাক্স ১৫ থেকে ১২ শতাংশ এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ১০ শতাংশ করা হয়।[৬] উল্লেখ্য, অন্যান্য খাতে করপোরেট ট্যাক্স ১৫ থেকে ৪৫ শতাংশ। এর পাশাপাশি প্রস্তাবিত উৎস কর শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ, অগ্নিনিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫ শতাংশ ডিউটি নির্ধারণ, বন্দরসেবা গ্রহণে নির্ধারিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট মওকুফ ও নতুন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ নগদ সহায়তাসহ তিন ক্ষেত্রে মোট নগদ সহায়তা ১০ থেকে ১২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।[৭] এ ছাড়া বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট সুবিধার ৪৪ হাজার ৮১০ কোটি টাকার ৯৬ শতাংশ (৪৩ হাজার ১৮ কোটি) তৈরি পোশাক খাতকে প্রদান এবং অতিরিক্ত আমদানির ক্ষেত্রে নিয়মে শিথিলতা আনয়ন করা হয়েছে।[৮] অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার সীমা বৃদ্ধি (২ কোটি ডলার) করা হয়েছে। এ ছাড়া তৈরি পোশাক খাতের পরিবহন ব্যয়, ল্যাবরেটরি টেস্ট, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যয় ও শ্রমিককল্যাণ ব্যয় সম্পূর্ণ ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে ২০১৪ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে এবং এর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ৮টি বিভাগীয় ও ২৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালনায় আইএলওর সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম পরিচালনা, জোনপর্যায়ে ভবন তৈরির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও

প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে ৩১২ জন পরিদর্শক, ফায়ার সার্ভিসের ২১৮ জন ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর, রাজউকের ৪৮ জন পরিদর্শক ও ১৫৩ জন সহকারী পরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তরে ৪ জন শ্রম কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ৬৪০ জনকে ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ, ৩৬০ জনকে আইন ও সেফটিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও ৪০ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ, শ্রম অধিদপ্তরের ৯ জনকে বিদেশে ও আইএলওর সহযোগিতায় ৬৭ জনকে দেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহী গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার উদ্যোগের অংশ হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ-LIMA)' প্রবর্তন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং, কারখানা লাইসেন্স ও নবায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন গ্রহণে অনলাইন সেবা, রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। এ ছাড়া ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা গ্রহণে অগ্রগতি হয়েছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ৬ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এই কাউন্সিলে পর্যবেক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে আইএলও। উল্লেখ্য, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিলের এ পর্যন্ত পাঁচটি সভা সম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক প্রতিনিধিসংবলিত '৩+৩+২' নামক একটি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পর্যায়ের খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় উদ্যোগ, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তালিকাভুক্ত ৪ হাজার ৩৪৬টি কারখানায় প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। সমন্বিত উদ্যোগের অধীনে ২ হাজার ২০৭টি (৭৩ শতাংশ) কারখানার সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে– এর মধ্যে অ্যাকর্ডভুক্ত ৯২ শতাংশ, অ্যালায়েন্সভুক্ত ৯৮ শতাংশ, জাতীয় উদ্যোগের ৪ দশমিক ৫ শতাংশ কারখানার ৭০ থেকে ১০০ ভাগ সংস্কার বাস্তবায়ন হয়েছে। অন্যদিকে জাতীয়

উদ্যোগভুক্ত ২৬ শতাংশ কারখানার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আবার জাইকা কর্তৃক কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার, সবুজ ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন ডলার, আইএফসির ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং সরকারের ৪০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাকর্ড কর্তৃক পাঁচটি কারখানায় প্রায় ৫ লাখ ডলারের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৭টি কারখানা সনদ পেয়েছে এবং ২২৭টি কারখানা সনদের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

পোশাকপল্লি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ৫০০ একর জমিতে পোশাকপল্লি নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক এই ভূমির মূল্য বাবদ মোট ১০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটিকে (বেজা) প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৪১ একর জমির জন্য ৭০টি কোম্পানির টাকা জমা নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত পোশাকপল্লিতে অল্প খরচে ও সহজ কিস্তিতে প্লট বরাদ্দের সুযোগ রাখা হয়েছে।

বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ-পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরসিসির প্রাথমিক কার্যক্রম ১৪ মে ২০১৭ সালে শুরু হয়েছে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর– কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এবং তিনটি টাস্কফোর্সের সমন্বয়ে আরসিসির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আরসিসির কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক ৮৩ প্রকৌশলীসহ মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আইএলও কর্তৃক আরসিসির কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য তহবিল গঠন ও ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরসিসিতে অ্যাকর্ডের ১০০ ভাগ সংস্কারকাজ সম্পন্ন এবং নন-ব্র্যান্ড ২০টি কারখানা হস্তান্তর করা হয়েছে।

জবাবদিহি নিশ্চিত করা

তৈরি পোশাক শিল্পসংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শনে জবাবদিহি আনার জন্য অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। ডিজিটাল মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন হয়েছে ৩ হাজার ৪৬৮টি ও মামলা দায়ের হয়েছে ৫২ এবং অধিদপ্তর পরিচালিত হেল্পলাইনে ২ হাজার ৯৮৫টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২ হাজার ৮৮টি (৭০ শতাংশ) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রম অধিদপ্তরে ১৯টি অভিযোগের মধ্যে ১২টির (৬৩ শতাংশ) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরে ৪৫টি শ্রম বিরোধের মধ্যে ৩২টি (৭১ শতাংশ) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে বিজিএমইএর আরবিট্রেশন সেলে ১ হাজার ৩৫৭টি অভিযোগের মধ্যে

১ হাজার ২৫২টি অভিযোগের (৯২ শতাংশ) নিষ্পত্তি করে ২ হাজার ৭৪১ জন শ্রমিকের ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকার পাওনা আদায় করা হয়েছে। বায়িং হাউসগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি খসড়া নীতি তৈরি করেছে। এ ছাড়া কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলোতে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পরিদর্শনকৃত কারখানার ডেটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। এসব কারখানার সব ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করার জন্য 'ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং ৩১টি বায়ার সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন প্রায় ২ হাজার ৫০০ কারখানার তথ্য প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া শ্রম অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের ডেটাবেইজ তৈরিসহ সাধারণের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য ডেটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিএমইএর অর্থায়নে তৈরি ডেটাবেইজে এখন পর্যন্ত ৩৭ লাখ ৬৬ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর বায়োমেট্রিক তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনা এবং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে ২০১৩ সালে ৭৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছয়টি গ্রেডে পুনরায় মূল মজুরি বাড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য,অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় সরকারনির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিদিন শ্রমিকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে দুই ঘণ্টা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে এবং অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার পাওনা নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করা হচ্ছে। আইনে মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি ও উৎসবকালীন ছুটির বিধান করা হয়েছে এবং অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় শ্রমিকের অর্জিত ছুটির বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। প্রসূতিকালীন সুবিধায় প্রাপ্ত ছুটি প্রদানে উদ্যোগের আওতায় অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসবপূর্ব আট সপ্তাহ আগে প্রাপ্ত সুবিধাসহ প্রসূতিকালীন সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা' নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিজিএমইএ ও কলকারখানা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে যেসব কারখানায় ৫ হাজারের বেশি শ্রমিক রয়েছে এমন ৮০ শতাংশ কারখানায় স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ শ্রমিকের কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় সেবার প্রতি শ্রমিকদের ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে।

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে ২০১৮ সালে নিবন্ধিত ১০২টিসহ বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৫৩টি। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল

গঠন করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ ছয় মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের মধ্যে ২ হাজার ৩৮৬টি (প্রায় ৭৫ শতাংশ) কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে ২০১৮ সালে মাত্র ৯০৯টি (১৬ শতাংশ) কারখানায় এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ অনুযায়ী কারখানাগুলোতে নির্বাচনের মাধ্যমে ১ হাজার ২১০টি (৪০ শতাংশ) 'পার্টিসিপেটরি কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের শূন্য দশমিক ০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মার্চে স্থিতি এফডিআরসহ তহবিলে ছিল ৯১ কোটি টাকা। সরকার কেন্দ্রীয় তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বিমার সমন্বয়ে দুর্ঘটনাকবলিত প্রত্যেক শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ২ হাজার ৮৪২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে, বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ তিনটি কারখানার শ্রমিদের পাওনা বেতন, ১৫৯ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা ও ১৫৯ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ মোট ৫৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নতুন অ্যাকর্ডে চাকরিচ্যুত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। অন্যদিকে শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ গ্রুপ বিমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চায় অগ্রগতি

তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুদ্ধাচার চর্চায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের সব কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের শাখা অফিসগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় রাজউকের সব সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া শুদ্ধাচার চর্চার প্রণোদনার জন্য রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পদক্ষেপ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন (২০১৩, ২০১৮)-এর ২(৪৯) ও ২(৬৫) ধারায় আগে যাদের নিয়োগ ও বহিষ্কার করার ক্ষমতা আছে তারাই মালিক হিসেবে গণ্য হতো, কিন্তু সংশোধনীতে মালিকের সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রমিকের সংকুচিত সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' বাদ দেওয়ায় তাদের শ্রমিক হিসেবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছে। ধারা ১০৮(২)-এর ব্যবহার করে অধিকাল কর্মের ক্ষেত্রে পিস রেট ভিত্তিতে মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ধারা ১১৮ অনুসারে উৎসব দিনে কাজ করার বিধানের মাধ্যমে শ্রমিকের প্রাপ্য উৎসব ছুটি প্রাপ্তির অধিকার

হরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১১ সালে সরকারি কর্মচারীদের প্রসূতিকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ করা হলেও শ্রমিকের জন্য তা ১৬ সপ্তাহই রয়ে গেছে, যা রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণের শামিল। আবার শ্রমিকের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হলেও মালিকের শাস্তি কমানো (ধারা, ২৯৬, ২৯৯,৩০০ ইত্যাদি) হয়েছে। এ ছাড়া আইনের বিভিন্ন ধারার (ধারা-২৩(৪)(খ)(ছ), ২৭, ১৭৯(৫), ২৯১ ইত্যাদি) অপপ্রয়োগের সুযোগ বিদ্যমান।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা শ্রমিকদের যৌথ দর-কষাকষির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা মালিক কর্তৃক যৌথ দর-কষাকষিতে প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এই বিধিমালায় কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে।

ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯-এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে শ্রমিককল্যাণ সমিতি গঠন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের ভোটের বিধানের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া জটিল করা হয়েছে। এ ছাড়া চাকরিচ্যুতি হলে প্রাপ্য অর্থ না পেলে শ্রম আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান না থাকা, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আইনে অগ্রগতি হলেও শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি না হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আবার অগ্নিনির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হলেও মালিকপক্ষের চাপে বিধিমালা এখনো অনুমোদন করা হয়নি, যা অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি অব্যাহত রেখেছে। এ বিধিমালায় মাশুল হালনাগাদ না হওয়ায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করা হলেও আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নেওয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনা মামলায় আসামিদের ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা দায়ের এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ না হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। আবার তাজরীন ফ্যাশনস মালিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় ২০১৬ থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুনানির জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমাণ এবং আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতির ঘাটতি বিদ্যমান।

ব্যবসাবান্ধব নীতিসহায়তার চ্যালেঞ্জ

ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতিসহায়তা প্রদান করা হলেও উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তে কার্যাদেশের ওপর কর কর্তনের বিষয়টি মালিকপক্ষ নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করছে। সংসদে প্রকাশিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ২৬টি প্রতিষ্ঠান এ খাতভুক্ত এবং পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ ১০ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা। এ ছাড়া সম্পূরক শিল্পে নীতিসহায়তায় ঘাটতি রয়েছে, যেমন দেশি কাপড় ব্যবহারে রপ্তানির ৪ শতাংশ নগদ সহায়তার অর্থপ্রাপ্তিতে ৩-৪ বছরের দীর্ঘসূত্রতা এবং অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা কাপড় ও সুতা দেশীয় বাজারে বিক্রির ফলে সম্পূরক শিল্পের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ (২০১৪) এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও এই অধিদপ্তরের জন্য আইএলওর সহযোগিতায় এসওপি তৈরির জন্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়নি। এ ছাড়া শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হলেও শক্তিশালী যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ না থাকায় সালিসি কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে রাজউকের এখতিয়ারকে পাশ কাটিয়ে এখনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ভবনের নকশা অনুমোদন করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা না থাকায় এবং নিয়োগের অনুমতি না পাওয়ায় ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ হয়নি। পরিদর্শক নিয়োগ না দেওয়ায় ৮০ লাখ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান পরিদর্শক সংখ্যা (৬৫২) অপ্রতুল। অন্যদিকে শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় দীর্ঘদিন শ্রম কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়নি। ২০টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে এখনো ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আইন ও অধিকার, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কোন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এ ছাড়া শ্রম অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে সনাতন প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শিল্পাঞ্চলে ১১টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়নি, ফলে ৩০ মিটার উচ্চতার বেশি কোনো ভবনের অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি বিদ্যমান। এসব প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সেবা গ্রহণকারীদের দক্ষতার ঘাটতি, অনলাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবা গ্রহণে সাড়া কম পাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ ছাড়া এলআইএমএ পরিচালনার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিগুলোর সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি ও ফ্যাক্টরি থেকে প্রয়োজনীয় নথি প্রদানে অনাগ্রহ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে অনলাইনে নথি সংযুক্ত করা সত্ত্বেও ম্যানুয়ালি নথি প্রদানে জোর দেওয়ায় বাড়তি বিড়ম্বনা সৃষ্টি হচ্ছে। রাজউকের অনলাইন সেবা গ্রহণে প্রচারণার ঘাটতি ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণে সাড়া কম। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অনলাইনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি সেবা গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া বিজিএমইএর হেল্পলাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় এখনো কারখানা মালিকদের ১৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সনদ নিতে হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হলেও ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর না থাকার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস

কমিটির কার্যপদ্ধতি পরিষ্কার না থাকায় ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হচ্ছে। এর উদাহরণ হিসেবে সাম্প্রতিক (২০১৯) শ্রমিক আন্দোলনের সময় ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের পরিবর্তে সরকার গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সাথে আলোচনার কথা উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের আয়োজিত আলোচনা সভায় অনেক ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের এজেন্ডা গ্রহণ করা হলেও শ্রমিক নেতাদের এজেন্ডা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তীকালে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, রিমেডিয়েশন কার্যক্রমে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে।

কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সমন্বিত উদ্যোগের ৮৮০টি (প্রায় ২৮ শতাংশ) কারখানার অগ্রগতি ৫০ শতাংশের নিচে, যার অধিকাংশ জাতীয় উদ্যোগে পরিচালিত (৭১১টি)। জাতীয় উদ্যোগভুক্ত কারখানাগুলোর সংস্কারে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি এবং ভাড়া ভবনে অবস্থিত ৪০৭টি কারখানা সংস্কারে কৌশলগত চুক্তি না থাকা, মালিকদের অসহযোগিতা ও অনীহা এবং অধিকাংশ ফ্যাক্টরির সাব-কন্ট্রাক্ট ব্যবস্থায় কাজ করার কারণে কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিজিএমইএ কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা না মেনে ২০০ নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন) সুবিধা অব্যাহত রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার বিভিন্ন কারণে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগভুক্ত মোট ১ হাজার ১৭১টি (পরিদর্শনকৃত কারখানার ২৭ শতাংশ) কারখানাসহ ১ হাজার ২৫০টি কারখানা বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রায় চার লাখ শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। যদিও বিজিএমইএর তথ্য মতে ৮২০টি নতুন কারখানায় ৬ দশমিক ৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ছাড়া নতুন বা স্থানান্তরিত ৯৫০টি কারখানা এখনো কোনো পরিদর্শন কার্যক্রমে যুক্ত হয়নি।

উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে জাইকার তহবিল দীর্ঘদিন ধরে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। আবার পরিবেশবান্ধব কারখানায় (গ্রিন ফ্যাক্টরি) কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বায়ার যথে াপযুক্ত মূল্য প্রদান না করায় এ ধরনের কারখানা তৈরিতে নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। পোশাকপল্লি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর ও ছোট কারখানা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পোশাকপল্লি তৈরির পরিকল্পনার অগ্রগতি হয়নি। এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানার জন্য গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগের কোনো অগ্রগতি নেই।

বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ-পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সংস্কার বাস্তবায়নে আরসিসির কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণের

ঘাটতি বিদ্যমান। পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবহন সুবিধা না থাকা এবং মালিকপক্ষের প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার ঝুঁকির কারণে বায়ার সংগঠনের আস্থার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব বিদ্যমান। আবার আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণ ও অ্যাকর্ডের কার্যক্রম হস্তান্তরের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকারকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পরিবীক্ষণ (ট্রানজিশনাল মনিটরিং কমিটি) ব্যবস্থা তৈরি করা হলেও এখানে মালিকপক্ষের সংযুক্তি এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম শেষে পরিদর্শনকৃত কারখানা আনুষ্ঠানিকভাবে আরসিসি কর্তৃপক্ষের কাছে না দেওয়ার ফলেও আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

জবাবদিহি নিশ্চিত করায় চ্যালেঞ্জ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত ৪ হাজার ৯৪৭টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া মামলাজট ও দীর্ঘসূত্রতার দৃষ্টান্ত। কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অধীন দপ্তরগুলোতে জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। হেল্পলাইন সেবার প্রচারণা না থাকায় এবং অভিযোগ প্রদানে আস্থার ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ শ্রমিকের সরকারি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়নি। অধিকাংশ শ্রমিক অভিযোগের মাধ্যমে শুধু পাওনা বেতন পেলেও অন্যান্য সুবিধা পান না। আবার নির্ধারিত সময়ের (১৫ দিন) মধ্যে অভিযোগ সম্পন্ন করতে না পারার দৃষ্টান্তও রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়নি।

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় চ্যালেঞ্জ

কলকারখানা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংস্কার কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। কারখানা সংস্কার ও যাচাই পর্যালোচনাসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ (প্রায় ৭৫০টি) বায়ার এখনো সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ করেনি। অনেক ক্ষেত্রেই কমপ্লায়েন্ট কারখানা শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার পর পে-স্লিপ দেয় না। কিছু কারখানার বিরুদ্ধে বিজিএমইএর তৈরি সেন্ট্রাল ডেটাবেইজের বায়োমেট্রিক তথ্যের অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। যেমন শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করা এবং কারখানার প্রবেশদ্বারে নাম টাঙিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া এর মাধ্যমে এক কারখানা থেকে চাকরি হারানো শ্রমিককে অন্য কারখানায় চাকরি পেতে বাধার সৃষ্টি করা হয়।

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ

মজুরিবোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনা এবং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হয় না। প্রকৃত হিসাবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে যে মূল মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে তা বর্তমান বাজারমূল্যের

সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টসহ বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে আনা হচ্ছে না, অথচ বেতন বৃদ্ধিসংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন এসআরও নম্বর ৩৪৫, নভেম্বর ২৫, ২০১৮ অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্টসহ বেতন বৃদ্ধি করার কথা। মূল মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন গ্রেডে ২৩-৩৬ শতাংশ দাবি করা হলেও এ ক্ষেত্রে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট আমলে না নেওয়ার ফলে দেখা যায় যারা ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত তাদের ক্ষেত্রে মূল মজুরি যা হওয়া উচিত তা থেকে বিভিন্ন গ্রেডে গড়ে ২৬ শতাংশ কম। এর পাশাপাশি শ্রমিকের উৎসব ভাতা, ওভারটাইমের মজুরি এবং ছাঁটাই বা অবসরকালীন আইনানুগ পাওনার পরিমাণও কমে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকায় মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে অসংগত মজুরি বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৫ হাজার শ্রমিককে আসামি করা হয়। এ ছাড়া প্রায় ১৬৮টি কারখানায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা, ৪০ বছরের বেশি বয়সী শ্রমিকদের নানা অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা এবং জোর করে ইস্তফাপত্রে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় চাকরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মজুরি বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও পণ্যের মূল্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে বায়ারদের অনাগ্রহ দেখা যায়। এ ছাড়া শ্রমিকের মতামতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং শ্রমিকের ছুটি প্রাপ্তির অধিকার ঝুঁকির সম্মুখীন করে তুলেছে। গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন লক্ষ্য প্রায় ৩০ থেকে ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিকাংশ কারখানায় টার্গেট পূরণের চাপে শ্রমিকরা টয়লেটে যেতে কিংবা কাজ থেকে উঠতে পারেন না। কোনো কোনো কারখানা টার্গেট পূরণ না হলে মজুরিবিহীন অতিরিক্ত সময়ে কাজ করিয়ে নেয়। অধিকাংশ কারখানার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও গালমন্দ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিকাংশ শ্রমিক তাদের প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। তা ছাড়া কারখানাগুলোও শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে জানায় না কিংবা ছুটি দেয় না। আবার প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদান এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনো কোনো কারখানার বিরুদ্ধে এখনো প্রসূতিকালীন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ রয়েছে। উৎপাদন টার্গেট পূরণের চাপের কারণে অধিকাংশ নারী শ্রমিকের মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা এবং কর্মে অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।

বৃহৎ শিল্প স্থান বিবেচনায় পুরোনো ২৯টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র তৈরির ফলে বর্তমানে গড়ে ওঠা শিল্প নিবিড় স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। ফলে শ্রম অধিদপ্তরের প্রদেয় সেবা (স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন) থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। আইনগতভাবে যে হারে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা তা দেওয়া হয়নি। একটি বড় কারখানায় একজন মাত্র কল্যাণ কর্মকর্তা যথেষ্ট নয়।

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী মাত্র ৩ শতাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে অধিকাংশ ইউনিয়ন মালিকপক্ষ নিয়ন্ত্রিত (পকেট ইউনিয়ন) এবং নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির চর্চা রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকরিচ্যুতি, স্থানীয় মাস্তান ও ঝুট ব্যবসায়ীদের দ্বারা হুমকি, মারধর ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগও রয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ ছয় মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি কার্যকর না থাকা এবং নিয়মিত প্রতি মাসে ফায়ার ড্রিল না হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কার্যকর না হওয়ার ফলে যৌথ দর-কষাকষি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের শূন্য দশমিক ০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ গ্রুপ বিমা বাধ্যতামূলক করা হলেও কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিলের আপৎকালীন হিসাব থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম এবং বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধের কারণে কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণবিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১)-এ স্বাক্ষর না করার বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ ছাড়া শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এ ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি পেলেও এখনো তা অপ্রতুল। অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লাখ শ্রমিক চাকরিচ্যুত হলেও মাত্র দুটি কারখানার ৬ হাজার ৬৭৬ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। আবার দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, যা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার শামিল। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত মামলায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই বেঞ্চ ভেঙে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

শুদ্ধাচার চর্চায় চ্যালেঞ্জ

ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১০-১৫ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কলকারখানা অধিদপ্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স অনুমোদনে ৫০-৬০ হাজার টাকা, নবায়নে ৫-৭ হাজার টাকা এবং মাস্টার লে-আউট অনুমোদনে ৫০-৭০ হাজার টাকা, লে-আউট সংশোধনে ১৫-২০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শক অভিযোগ তদন্তে মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা শ্রমিক নিপীড়ন ও চাকরিচ্যুতির সুযোগ তৈরি করে দেয়। ফলে শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদানে আস্থার ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কোনো কোনো শ্রম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারখানার পিসি কমিটির নির্বাচনের সময় শ্রমিকদের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে এবং নামসর্বস্ব শ্রমিক নেতাদের যোগসাজশে 'কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন জমা হয়েছে' এরূপ ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মালিকপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উপসংহার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী ছয় বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে কারখানা নিরাপত্তা, তদারকি, শ্রমিকের মজুরি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। মালিকপক্ষ রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখাকে প্রাধান্য দিলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয়নি।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি হলেও ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবা ব্যবহারবান্ধব করা ইত্যাদি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দর-কষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। শ্রম আইন যতটা না শ্রমিক স্বার্থে প্রয়োগ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মালিকপক্ষ কর্তৃক এই আইনের সুবিধা নিয়ে শ্রমিকদের চাকরি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে। 'ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯' জারি করার মাধ্যমে ইপিজেডে অবস্থিত কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা হলেও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে এখনো আইনি সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে শ্রমিকের চাকরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার অধিকার, অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি।

শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ বজায় রাখা এবং এ খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মালিক, সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর না থাকায় অশান্ত শ্রম পরিবেশ সৃষ্টির ঝুঁকি বিদ্যমান। বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলেও জাতীয় উদ্যোগের কারখানাগুলোতে তেমন অগ্রগতি হয়নি। এ ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বিদ্যমান। আবার আরসিসির আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে নিরাপত্তাসহ যা অগ্রগতি হয়েছে তা টেকসই না হওয়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে। এ ছাড়া মজুরি বৃদ্ধিসংশ্লিষ্ট আন্দোলন-পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে নীতি সুবিধার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি বিদ্যমান। সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য টিআইবি নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

২. শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ ও ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ ২০১৯-এ বিদ্যমান, বিশেষ

করে শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা, শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা, চাকরির অবসানে শ্রমিকের প্রাপ্য ও আর্থিক সুবিধার পরিমাণ, মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা, সংগঠন করা ও যৌথ দর-কষাকষির অধিকারসংক্রান্ত ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা দূর করতে হবে।

৩. দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৪. শ্রম অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা নিশ্চিত করতে

- নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে পরিদর্শকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে;
- তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রম কল্যাণকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে;
- ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও শ্রম কল্যাণকেন্দ্রের প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি যুগোপযোগী করতে হবে।

৫. শ্রমিক আন্দোলন-পরবর্তী চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়েরকৃত উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ভয়ভীতিহীন শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এসব কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে কারখানার মালিকদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সব বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদারদের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ হবে।

৯. কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে।

১০. ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ন, নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি অনুসরণ, সব পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. তৈরি পোশাক খাতের সম্পূরক শিল্পে প্রণোদনা ও নীতিসহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে

- সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসির আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

- কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারখানার সংস্কার প্রতিবেদন নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রকৌশলীদের মাঠ প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে;
- কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ http://www.epb.gov.bd/, ৩০ মার্চ ২০১৯।

২ http://www.bgmea.com.bd/home/about/About Garments Industry, ১৩ জানুয়ারি ২০১৯।

৩ https://www.adb.org/sites/default/files/publication/203906/women-work.pdf, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

৪ দি ডেইলি স্টার, 'রানা'স মাদার জেলড ফর সিক্স ইয়ারস ফর অ্যামাসিং ওয়েলথ ইললিগ্যালি', ৩০ মার্চ ২০১৮।

৫ আমাদের সময়, 'তাজরীন ট্র্যাজেডির ৬ বছর, শেষ হয়নি বিচার', ১৭ এপ্রিল ২০১৯।

৬ দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, 'এক্সপোর্ট সোর্স ট্যাক্স কাট টু ০.৭%', ২৩ মার্চ ২০১৮।

৭ নিউ এইজ, 'অ্যাপারেল এক্সপোর্টারস টু গেট ১২% ক্যাশ ইনসেনটিভস', ২৩ মার্চ ২০১৯।

৮ দৈনিক প্রথম আলো, 'খেলাপির শীর্ষে পোশাক খাত', ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

চতুর্থ অধ্যায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অর্থায়ন

বন্যা ২০১৯ মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ*

মো. নেওয়াজুল মওলা, মো. মাহ্‌ফুজুল হক, অমিত সরকার, আবু সাইদ
মো. জুয়েল মিয়া ও এম জাকির হোসেন খান

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি বন্যাপ্রবণ দেশ। এর অন্যতম কারণ বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা– এই তিন বৃহৎ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এবং এর ৮০ শতাংশ এলাকা প্লাবনভূমি। আবার উজান থেকে বয়ে আসা আন্তমহাদেশীয় নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় নদীগুলোতে পানি ধারণক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলা ও বৃষ্টিপাতের সময়সীমায় অসামঞ্জস্য, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, খাল-বিল, জলাভূমি, নদী দখলসহ নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত বেড়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বন্যায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩ হাজার ৭০ কোটি ৮০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর অতিরিক্ত শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, বন্যার আকার ও ভয়াবহতার বিচারে ২০১৯ সালের বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বন্যার সময় যমুনা নদীর পানি বিপৎসীমার ১৬৪ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা ১৯৮৮ সালের বন্যায় বিপৎসীমার ১৩৪ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। বন্যাপ্রবণ কিছু এলাকার ৮০ শতাংশ পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া যমুনা নদীতে ১৯৮৮ সালের চেয়ে ৩৩ শতাংশ কম পানি প্রবাহিত হলেও এবারের বন্যায় ক্ষতির ব্যাপকতা বেশি। এর কারণ পলি পড়ে নদী ভরাট হওয়া এবং পানি নদীর তীর ছাপিয়ে যাওয়া। এ বন্যায় মোট ২৮টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্থানভেদে ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিল। বন্যার কারণে সারা দেশে মোট ১০৮ জনের প্রাণহানি (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন) হয়।

* ২০১৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

চিত্র ১ ও ২ : ২০১৯ সালের বন্যার বিস্তৃতি–নীল অংশ পানির ব্যাপ্তি নির্দেশ করছে

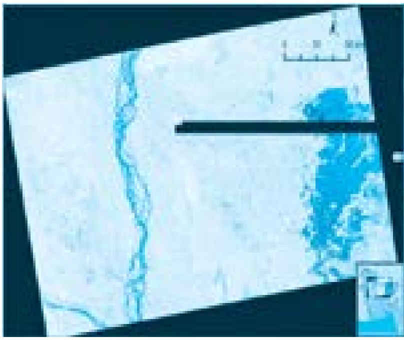

চিত্র ১ : বন্যার আগে (২৫ জুন ২০১৯ তারিখে গৃহীত) সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি

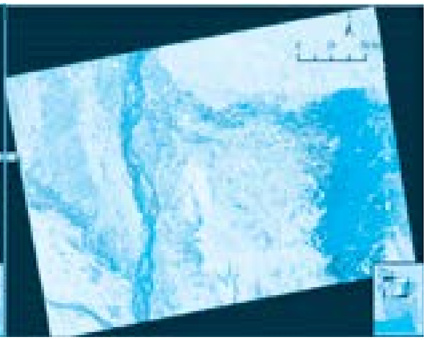

চিত্র ২ : বন্যাকালীন (১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে গৃহীত) সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি; সূত্র : ছারভির-নাসা

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট **১১** দশমিক ৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সব পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫ অনুসারে ২০১৫-২০৩০ সময়কালে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও কার্যকর সাড়া প্রদানব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫, দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে বন্যা-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯ সালের বন্যা মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। আবার গণমাধ্যমেও বন্যা মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে টিআইবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। টিআইবি ইতিপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯) ও রোয়ানুর (২০১৬) মতো দুর্যোগের পর গবেষণা পরিচালনা করে। এসব গবেষণায় দুর্যোগ মোকাবিলায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও অনুসৃত হলেও প্রায় প্রতিবছর সংঘটিত বন্যার মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, বন্যাকালীন সহায়তা ও পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা মোকাবিলায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকেও এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ২০১৯ সালের বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যবেক্ষণ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন এবং বন্যা-পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- বন্যা মোকাবিলা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এ গবেষণায় সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যা চলাকালে এবং বন্যা-পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত। তবে পুনর্বাসনের সব কাজ বাস্তবায়ন শুরু না হওয়ায় কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা পর্যন্ত দেখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ বিতরণকাজে সমন্বয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস ও গবেষণাপদ্ধতি

গুণগত ও পরিমাণগত গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বন্যা মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, যেমন জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিওর কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্যাকবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খানায় ফোকাস দল আলোচনা ও খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, দুর্যোগসংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় বা উপজেলা ও জেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৩ : তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় এবং খানা নির্বাচন পদ্ধতি

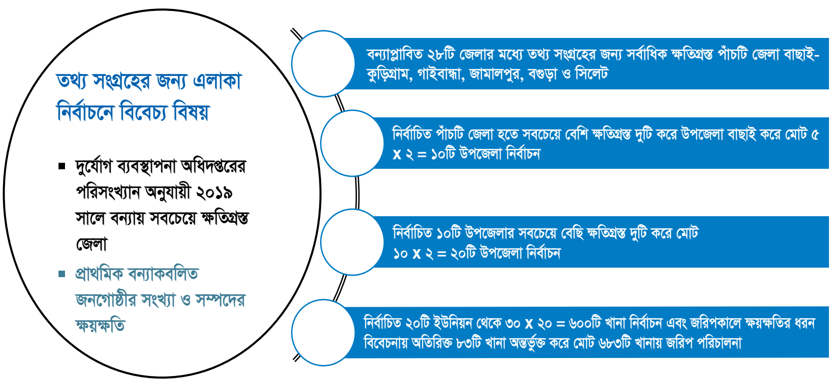

তথ্য সংগ্রহের জন্য পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে খানা নির্বাচন করে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা এবং প্রাথমিক বন্যাকবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে বন্যাপ্লাবিত ২৮টি জেলার মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচটি জেলা– কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া ও সিলেট বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত পাঁচটি জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দুটি করে উপজেলা বাছাই করে মোট ১০টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এসব উপজেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দুটি করে মোট ২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নির্বাচিত এসব ইউনিয়ন থেকে মোট ৬৮৩টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

সুশাসনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশক যেমন– স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয়,শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতার নিরিখে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ২০১০ সালের দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্যা-পূর্ববর্তী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়কে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো ঝুঁকি যাচাই, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি, আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহ এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি, ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও স্থানীয়ভাবে মজুদকরণ, মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রস্তুতি।

বন্যাকালীন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো যথাসময়ে দুর্যোগসংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রেরণ, জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালনা, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি ও ত্রাণ বিতরণ, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ জানানো ও নিরসনব্যবস্থা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়।

বন্যা-পরবর্তী পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়, সরকারি-বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রম, অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য বরাদ্দ, ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের খেত সংস্কার ও নাবি জাতের চারা বিতরণ পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অবকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা।

এ গবেষণার আওতায় মাঠপর্যায়ে জরিপকাজ ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার সময়কাল জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯।

গবেষণার ফলাফল

সরকারি হিসাবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি জেলায় বন্যায় ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গবেষণাভুক্ত ১০টি উপজেলায় ১৮ হাজার ৭১২টি পরিবার সম্পূর্ণ এবং ৩ লাখ ২৬ হাজার ২৫৮টি পরিবার আংশিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে ৯ হাজার ৬৩টি সম্পূর্ণভাবে এবং ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৪৫টি

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া ৩৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে এবং ১ হাজার ২৭৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার ২ হাজার ৮৬৩ কিমি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ দশমিক ৫৫৪ কিমি এবং আংশিক ক্ষতির শিকার ৫৩ দশমিক ৬ কিমি। এ ছাড়া ১২ হাজার ১৮৬ দশমিক ৫ হেক্টর ফসলি জমি সম্পূর্ণ এবং ৩২ হাজার ২৩৩ হেক্টর আংশিক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

সারণি ১ : ২৮টি জেলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র

ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্র	২৮টি জেলায় ক্ষয়ক্ষতি		১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতি	
	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি
প্রাণহানি	১০৮		৩৯	
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	৯৮৬৮৮	১৩৬০১০২	১৮৭১২	৩২৬২৫৮
ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি	৩৪৯৯৯	৫৪৭৯৬৭	৯০৬৩	১৩৮৮৪৫
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৪৬	৫০৫৬	৩৩	১২৭৭
ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা	৪৫০.২	৭৮২১	৩৩০.৭	২৫০৫.২৬
ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ	৩.০৫৫	২৩১	১.৫৫৪	৫৩.৬
ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমি	৪৫৪৯৩	৮১৭৬৩	১২১৮৬.৫	৩২২৩৩

চিত্র ৪ : বন্যায় সামগ্রিক ক্ষতির বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতির হার

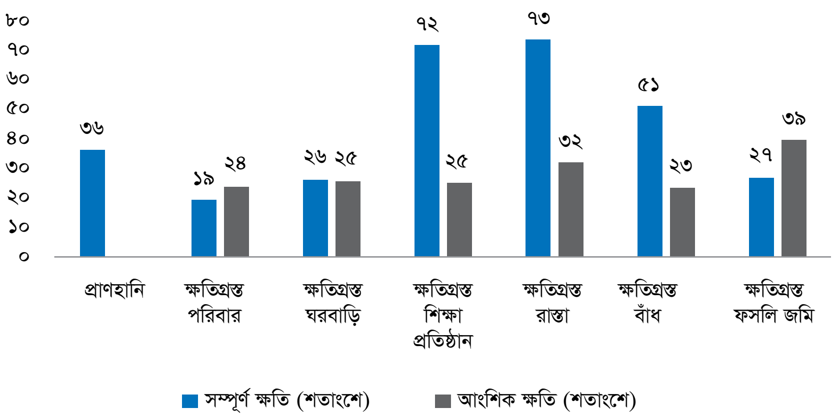

তথ্যসূত্র : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার জরিপে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

সরকারি হিসেবে প্রাণহানি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা, বাঁধ ও ফসলি জমির ক্ষতির বিবেচনায় উপর্যুক্ত চিত্র গবেষণা এলাকায় সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা নির্দেশ করে। এ ছাড়া প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি লক্ষণীয়। জরিপকৃত খানায় বিপুলসংখ্যক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ১৮ হাজার ১৬৯ টাকার এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৬৪ হাজার ৯০৮ টাকার ক্ষতির হয়েছে। খানার গবাদিপশু বাবদ গড় ক্ষতি ৮ হাজার ৯৩০ টাকা। উল্লেখ্য, খানাগুলোর গড়ে ৫৪ হাজার ৯১৩ টাকার গরু-মহিষ; ৩৩ হাজার ২৫০ টাকার ফ্রিজ; ১২ হাজার ৪৪৯ টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম; ১১ হাজার ১১০ টাকার ছাগল-ভেড়া; ১০ হাজার ৮৩১ টাকার মজুত ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চিত্র ৫ : জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)

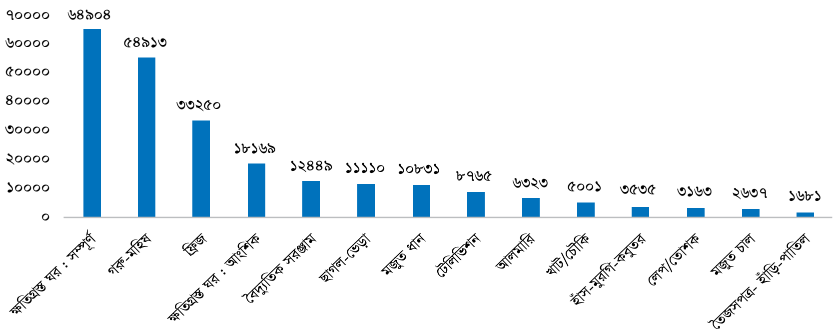

গৃহস্থালি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর ৯০ শতাংশের ঘরবাড়িই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ১৭ হাজার ৮৬৩ টাকা। খানাগুলোর ৭০ শতাংশের গৃহস্থালির মালামাল (বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাব, মজুত ধান ও চাল) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাবের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৯৩৭ টাকা; মজুত ধান ও চালের ক্ষেত্রে গড় ক্ষতি যথাক্রমে ১০ হাজার ৮৩১ এবং ২ হাজার ৬৩৭ টাকা। অন্যদিকে ৫৮ শতাংশ খানার গবাদিপশুর (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতর) ক্ষেত্রে গড়ে ৮ হাজার ৯৩০ টাকার ক্ষতি।

কৃষি ও ফসলি জমির ক্ষতি

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪৬ শতাংশ খানার কোনো না কোনো ফসলি খেত (বীজতলা, ধান, পাট, সবজি) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড় ক্ষতির পরিমাণ বীজতলা ১ হাজার ৬ টাকা, ধান ২৬ হাজার ২৫২ টাকা, পাট ৪১ হাজার ৭৭৪ টাকা ও সবজি ৫ হাজার ৮৪৯ টাকা।

৫ শতাংশ খানায় মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে খানাপ্রতি গড়ে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৪৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ৩১ শতাংশ খানার কোনো না কোনো ফসলি জমি বালি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জমিগুলোতে আগামী দুই-তিন বছর ভালো ফসল না হওয়ার আশঙ্কা করেছেন কৃষকরা।

চিত্র ৬ : খানার খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির গড় পরিমাণ (টাকা)

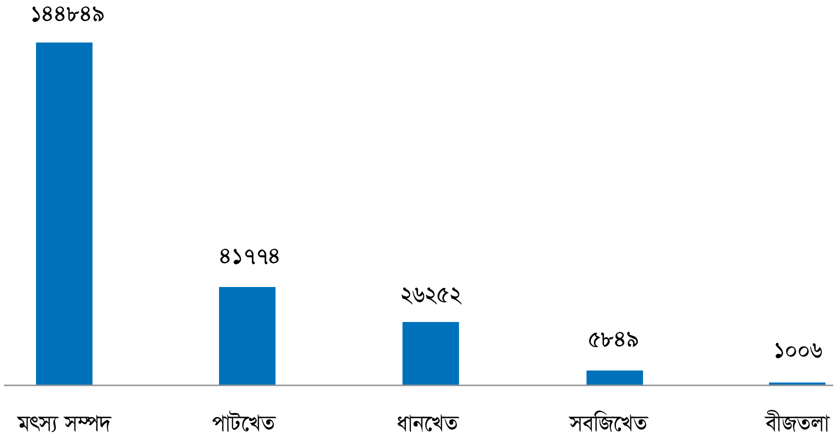

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি

৪৯ শতাংশ খানার নলকূপ এবং ৭৪ শতাংশ খানার ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে নলকূপের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৩ হাজার ৮৭ টাকা এবং ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে ৩ হাজার ৭৬১ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

চিত্র ৭ : বন্যায় নলকূপ ও ল্যাট্রিনের ক্ষতি

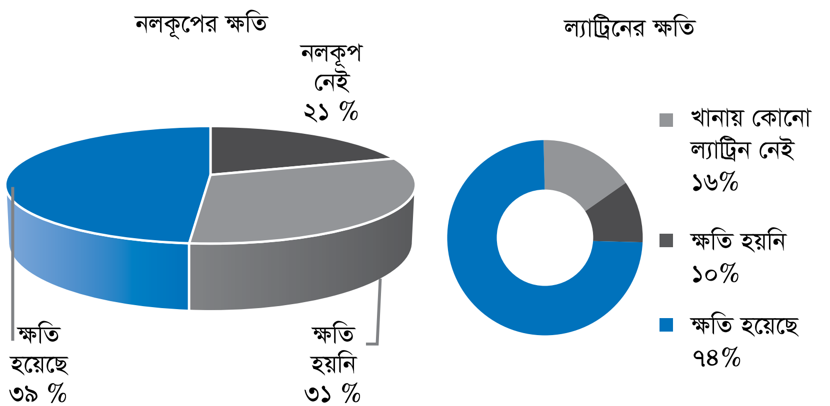

বন্যা ২০১৯ মোকাবিলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা মোকাবিলায় বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্যা-পূর্ববর্তী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নদীর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পূর্বাভাসসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান, বন্যা মোকাবিলা প্রস্তুতি গ্রহণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বন্যার সময় গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে সীমিত পরিসরে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ (জিআর চাল, শুকনা খাবার, তাঁবু, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য), জরুরি ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তহবিল ব্যবহার করে শুকনা খাবার, স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, রান্না করা খাবার বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে হটলাইন স্থাপন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন, মন্ত্রী, সাংসদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বন্যা এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় সীমিত পরিসরে চিকিৎসা সেবা প্রদান, নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা, পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, ভিজিএফের চাল, গো-খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বীজ ও সার বরাদ্দ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

সারণি ২ : গবেষণা এলাকায় সরকারি বরাদ্দ

বিবরণ	জামালপুর		বগুড়া		সিলেট		কুড়িগ্রাম		গাইবান্ধা	
	দেওয়ানগঞ্জ	ইসলামপুর	সোনাতলা	সারিয়াকান্দি	কোম্পানীগঞ্জ	গোয়াইনঘাট	উলিপুর	চিলমারী	গাইবান্ধা সদর	ফুলছড়ি
জি আর চাল (মে. টন)	৫২৪	৮২৪	৩৭৫.৫	৫৮১	৫৩	৬০	১৩৫	১৭৫	২৮৫	৩৬৭
জি আর (ক্যাশ)	৮৭০০০০	৯৩০০০০	৩৪৫০০০	১৩২১০০০	৫০০০০	১৫৩০০০	২৯৫০০০	৪৪৫০০০	৫০০০০০	৭২৫০০০
শুকনা খাবার (প্যাকেট)	১২৫৪	১৭০০	৫০০	২০০০	৩৫০	৪০০	২৯০০	৩৬৫০	৫০০	১৮৫০
তাঁবু (ফেরতযোগ্য)	১৫০	১৫০	০	০	০	০	১৩০	১৩০	২৫০	০
শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৩০০০০	৩০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৮৫০০	৪০০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৬০০০০	৬০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৩০০০০	১৩০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
নৌকা ক্রয় বাবদ অর্থ	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০০০০	০	০	০	০	১০০০০০	০	০
গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি	৭৫৯০০০	৮৭০০০০	৩০০০০০	৫২৫০০০	২৩১০০০	৩৬৩০০০	৬৬০০০০	৬৬০০০০	৭৫০০০০	৯০০০০০
ঢেউ টিন	২৫৩	২৯০	১৩২	২৪১	৭৭	১২১	২২০	২২০	২৫০	৩০০

বন্যা ২০১৯ মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা : চর ও হাওরাঞ্চলে বন্যার নিয়মিত প্রকোপকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে বন্যার ঝুঁকিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং যথাযথ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও সেগুলো সংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বন্যা শুরুর কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে সতর্কবার্তা প্রদানের দাবি করলেও জরিপে ৯১ শতাংশ তথ্যদাতা সতর্কবার্তা না পাওয়ার দাবি করেছেন। আবার দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় সতর্কবার্তা পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা ছিল। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগসংক্রান্ত মহড়ার আয়োজন না করার তথ্যও পাওয়া গেছে। আবার আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম বা হটলাইন নম্বর প্রচারে কার্যকর উদ্যোগ ছিল না।

স্থানীয় জনগণের সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপের ঘাটতি : ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস ও আপৎকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। আবার গৃহস্থালি সম্পদ রক্ষায় সমাজভিত্তিক উঁচু স্থান নির্মাণের নির্দেশনা থাকলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কমিটিতে প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। আবার কমিটিকে সহায়তা করার জন্য কোনো উপকমিটি গঠন করাও হয়নি। এ ছাড়া জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালনা ও ত্রাণ বিতরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে টিম গঠনও করা হয়নি।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি : নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ প্রশাসন থেকে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় কোনো কোনো এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। যথাযথ সুরক্ষার অভাবে জরিপকৃত খানায় বন্যার কারণে মোট ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে; পানিবন্দী অবস্থা থেকে সময়মতো উদ্ধার না করায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আর স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৯৪ শতাংশের মতে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে কোনো পদক্ষেপ ছিল না। এ ছাড়া নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ ছিল না।

বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং নদীভায়ন রোধে কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি : গবেষণা এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্রুততার সাথে তা মেরামত করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার বন্যা-পরবর্তী নদীভাঙ্গন প্রবল হলেও ভাঙ্গন রোধ এবং বিপদাপন্ন জনবসতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনর্নির্মাণেও

পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর নদীভাঙন প্রকট হলেও মানুষ ও সম্পদ স্থানান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপে ঘাটতি লক্ষণীয়।

আশ্রয় ও গৃহায়ণ

আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা : বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোয় পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র ছিল না। কাছাকাছি দূরত্বে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার্তদের দূরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা লক্ষ করা গেছে।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতে ঘাটতি : উপজেলা প্রশাসন থেকে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পরিদর্শন করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও (যেমন ধারণক্ষমতা, নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, ল্যাট্রিন ইত্যাদি) নিশ্চিত করা হয়নি।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রচারণার ঘাটতি : ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণে ঘাটতি ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়ার মাধ্যমে বন্যার সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত হলেও খাদ্য ও পানীয় মজুত এবং গবাদিপশু নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে জনগণের সক্রিয়তার ঘাটতিও লক্ষ করা গেছে।

সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা : জরিপকৃত খানার ৭ শতাংশ বন্যাকালীন সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যথাযথ সুবিধা নিশ্চিত না করায় জনগণের আগ্রহের ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আশ্রয়কেন্দ্রে নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় এবং পানিতে ডুবে থাকায় মানুষ আশ্রয় নিতে পারেনি।

চিত্র ৮ : জরিপকৃত খানার তথ্যমতে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যা

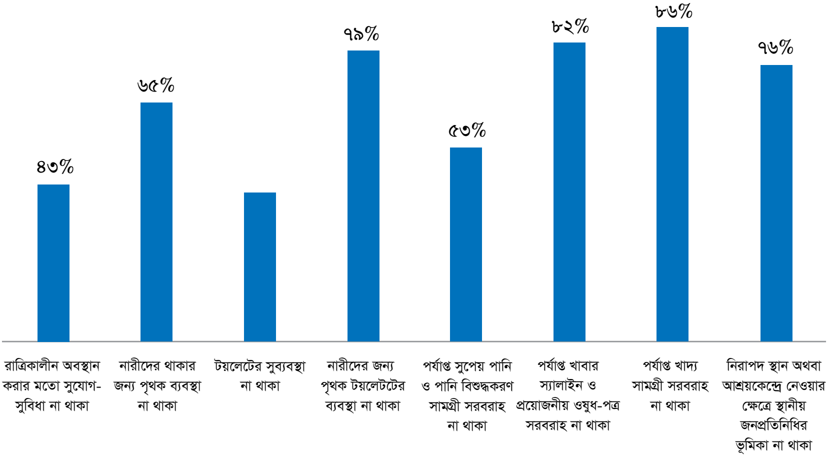

ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ : জরিপের ৯০ শতাংশ খানার ঘরবাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামত এবং গৃহনির্মাণ মজুরি বাবদ অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক সরকারি গৃহনির্মাণ মজুরি বরাদ্দ এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের হিসাবে উপজেলাভেদে ক্ষতিগ্রস্ত খানাপ্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৭২ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উপজেলাভেদে ৭৭ বান্ডিল থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ বান্ডিল ঢেউটিন বারদ্দ করা হয়েছে। সুবিধাভোগী প্রতি ৩ হাজার টাকা এবং ১ বান্ডিল টিন হিসেবে বরাদ্দকৃত টাকা এবং ঢেউটিন ১০টি উপজেলায় সর্বোচ্চ ২ হাজার ১০০ খানার মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ১০টি উপজেলায় ৯ হাজার ৬৩টি ঘর সম্পূর্ণ এবং ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮৪৫টি খানা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গৃহনির্মাণ মজুরি হিসেবে বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যার বিবেচনায় শুধু অপ্রতুলই নয়, ক্ষতির বিবেচনায় খুবই নগণ্য। উল্লেখ্য, জরিপকৃত খানায় শুধু ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গড়ে ১৭ হাজার ৮৬৩ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

চিত্র ৯ : সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘরপ্রতি গড় ক্ষতি এবং গৃহনির্মাণ মজুরি বাবদ গড় বরাদ্দ (টাকা)

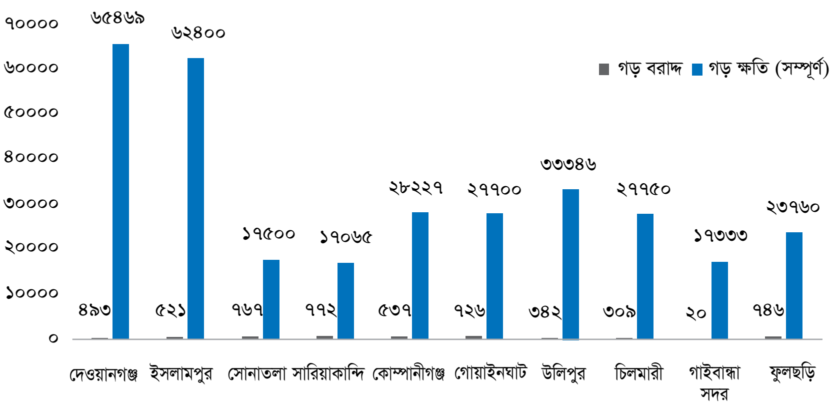

তথ্যসূত্র : উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ২০১৯।

পানি ও স্যানিটেশন

বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে ঘাটতি : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতার ঘাটতি ছিল। এসব ঘাটতির মধ্যে নলকূপ ও ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উঁচু স্থানে পর্যাপ্ত মোবাইল টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন না করা, দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ না করা, বাঁধ এবং রাস্তায় আশ্রয়গ্রহণকারী পরিবারগুলোর জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপের ঘাটতি : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে বন্যা-পরবর্তী পানি ও স্যানিটেশন সেবা পুনঃস্থাপনে প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বন্যার

পানি নেমে যাওয়ার পরও যেসব পরিবার তাদের বাড়িতে না ফিরে বাঁধ কিংবা রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি ছিল।

স্বাস্থ্যসেবা

বন্যাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি গ্রহণে ঘাটতি : ইউনিয়ন পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত করা হয়নি।

জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি : গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ছিল, যেমন গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য চিকিৎসক বা সহকারী, খাবার, চিকিৎসা, নিরাপদ পানি ইত্যাদি। কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হলেও বিকল্প ব্যবস্থায় সেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। আবার বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম ও পরিবহনব্যবস্থা না থাকায় সেবা প্রদান ব্যাহত হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা না পাওয়ায় পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত ৬০ শতাংশ খানার গড়ে দুজন সদস্য কোনো না কোনো পানিবাহিত রোগের শিকার হয়েছেন। আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য বন্যাকালীন চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারি সেবার অভাবে বন্যাকালীন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা বাবদ খানাপ্রতি গড়ে ২ হাজার ৭৭ টাকা ব্যক্তিগত খরচ হয়েছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি : স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরি পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থায় ঘাটতি ছিল। কোনো কোনো এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ডুবে গিয়ে ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী নষ্ট হলেও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণেও ঘাটতি ছিল।

শিক্ষা

শিক্ষাসামগ্রী রক্ষায় পদক্ষেপের ঘাটতি : দুর্যোগকালে বিদ্যালয় ভবন রক্ষা এবং ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা জারি করার কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়; বিশেষ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের আসবাব ও শিক্ষাসামগ্রী রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল। গবেষণা এলাকার ১০টি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৩টি সম্পূর্ণ এবং ১ হাজার ২৭৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানিতে ডুবে যাওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসবাব ও শিক্ষাসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত না করাসহ স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাসামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০-এ বন্যার সময় এবং বন্যার পরপরই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য কিছুসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করার ওপর জোর দেওয়া হলেও বন্যার পানি নেমে গেলেও গবেষণা এলাকার অধিকাংশ স্থানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি : স্থানীয় শিক্ষা অফিস থেকে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ছিল। এ ছাড়া দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ঘাটতি ছিল। আবার ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাসামগ্রী পুনঃ বিতরণে বিলম্বও লক্ষণীয়।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় চ্যালেঞ্জ

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি : দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০-এ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোকে কৃষি ও প্রানিসম্পদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে বীজ মজুত, বীজতলা, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকি হ্রাসমূলক কর্মসূচি এবং সচেতনতা ও শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল ও বীজ সংরক্ষণের কোনো প্রস্তুতি কোনো এলাকাতেই ছিল না এবং মৎস্য ও গবাদিপশু রক্ষায় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে ঘাটতি ছিল।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তার ঘাটতি : বন্যায় ক্ষতির হাত থেকে গবাদিপশু রক্ষায় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উঁচু স্থান নির্বাচন ও নির্দিষ্ট করা, গবাদিপশুর সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা এবং প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হলেও আক্রান্ত এলাকার জনগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অফিস থেকে এই সহায়তা না পাওয়ার কথা জানান। এ ছাড়া গবেষণা এলাকায় যেসব সহায়তার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে মৎস্য অফিস থেকে পুকুরের মাছ রক্ষায় সহায়তার কথা বলা হলেও মৎস্যচাষিদের এ-সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান না করা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক গবাদিপশু স্থানান্তরে সহায়তা না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই-তিন দিন পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখা; পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দিয়ে দূরবর্তী উঁচু স্থানে সেগুলো স্থানান্তর এবং প্রাণিসম্পদ অফিস কর্তৃক গো-খাদ্য সরবরাহ না করায় অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবে গবাদিপশুর মৃত্যু এবং ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিতে বাধ্য হওয়া উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপের ঘাটতি : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকি প্রদানে ঘাটতি ছিল। বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চলতি মৌসুমে কৃষি বরাদ্দ প্রদান না করে পরবর্তী মৌসুমে (রবি মৌসুম) বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আবার স্থানীয় নাবী জাতের ফসলের বীজতলা তৈরিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। অন্যদিকে, মাঠপর্যায়ে প্রাণিসম্পদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা ছিল না এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে অনুমাননির্ভর তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো অফিস কর্তৃক শুধু ৭০-৮০টি হাঁস-মুরগি মারা যাওয়ার তথ্য রিপোর্ট করা হয়েছে, যা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় খুবই সামান্য। আবার ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় মৎস্যচাষিদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। এ ছাড়া প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বন্যা-পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ ছিল না। ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে গো-খাদ্য মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকায় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট লক্ষ করা গেছে।

ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

ত্রাণের চাহিদা যাচাই ও ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতিতে ঘাটতি : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপজেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা ক্ষতির পরিমাণ এবং চাহিদা নিরূপণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণের চাল বিতরণ করেছে, যা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে মুখ্য তথ্যদাতারা জানান, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে 'ডি ফরম' পূরণ করে উপজেলা প্রশাসনে পাঠানো হয় না। যে তথ্য পাঠানো হয় তা অনেকটাই অনুমাননির্ভর এবং সেখানে ক্ষতির বিপরীতে ঠিক কী পরিমাণে ত্রাণ প্রয়োজন তার সঠিক চাহিদা নির্ণয় করা হয় না; বিশেষ করে বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য ত্রাণের চাহিদা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি। আবার গবাদিপশুর জন্য ত্রাণের (গো-খাদ্য) চাহিদা বন্যা মোকাবিলা প্রস্তুতিতে রাখা হয়নি। এ ছাড়া দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না এবং ত্রাণ পরিবহনের জন্য বাজেট ও পরিবহনের ঘাটতি ছিল।

স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি : স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি লক্ষণীয়; বিশেষ করে কোনো ইউনিয়ন পরিষদেই বরাদ্দকৃত মোট ত্রাণের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এ ছাড়া উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণসংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতিসহ ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত নগদ টাকার বিপরীতে ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি : উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ হিসেবে ক্রয়কৃত শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বিধান রয়েছে, তবে তা উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয় না। ত্রাণ হিসেবে শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বিধানও রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সময়ে ক্রয় করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশনায় ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ক্রয় কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এককালীন ৫ লাখ টাকা করে ৪০ লাখ পর্যন্ত এই কমিটি ক্রয় করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ক্রয়ে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে মুখ্য তথ্যদাতারা জানান। অন্যদিকে কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণসামগ্রীর ঘাটতির সুযোগে সিন্ডিকেট সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বাড়তি দামে ত্রাণসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয় স্থানীয় প্রশাসন।

ত্রাণের পণ্য নির্বাচনে জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা : স্থানীয় জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করে এবং কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ ক্রয়ের আগে মাস্টার রোল তৈরি না করে ত্রাণের খাদ্যসামগ্রী ক্রয় এবং বিতরণ করায় তা ওই এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠী খেতে পারেনি; বরং ত্রাণের অপচয় হয়েছে। বিশেষ করে বগুড়ায় বন্যাকালীন ত্রাণের খাদ্য হিসেবে নুডলস প্রদান করায় আক্রান্ত জনগণ তা খেতে পারেনি এবং ফেলে দিয়েছে। এ ছাড়া বরাদ্দকৃত ত্রাণে শিশুখাদ্য না থাকা এবং পরবর্তী সময়ে বরাদ্দ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিশুখাদ্য হিসেবে অনুপযোগী হওয়ায় ফেলে দিতে হয়েছে।

অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ : গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ বরাদ্দ অপ্রতুল ছিল যা ৭-৮ দিন স্থায়ী বন্যার বিবেচনায় খুবই সামান্য। উপজেলাপ্রতি ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৩ লাখ ২১ হাজার টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ৪ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৬ টাকা। আবার জিআর চাল উপজেলাপ্রতি ৫৩ মেট্রিক টন থেকে সর্বোচ্চ ৮২৪ মেট্রিক টন, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ২ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৬৮ কেজি পর্যন্ত। এ ছাড়া উপজেলাপ্রতি শিশুখাদ্যের জন্য বরাদ্দ ৮ হাজার ৫০০ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। উপজেলাপ্রতি গো-খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

চিত্র ১০ : উপজেলাভিত্তিক খানাপ্রতি জিআর ক্যাশ ও চালের গড় বরাদ্দ

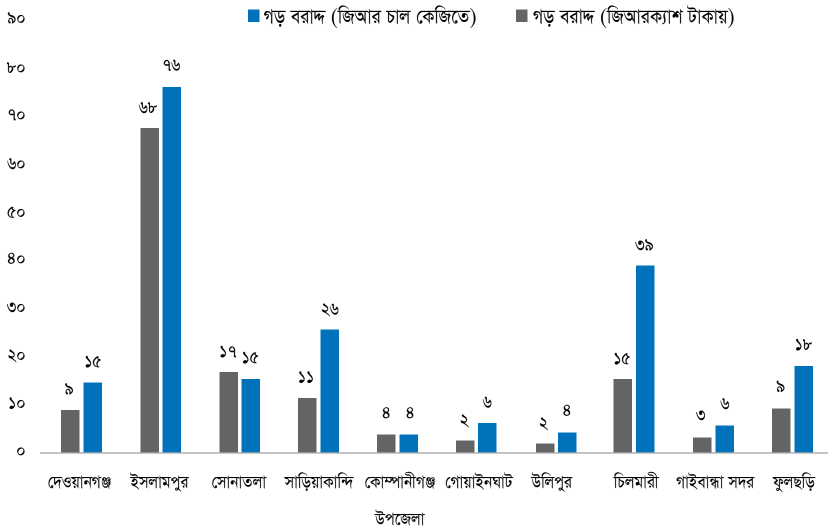

স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম : কোনো কোনো ইউনিয়নে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকটাত্মীয়দের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আবার সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ইউনিয়নে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকটাত্মীয় ও সমর্থকদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জনপ্রতিনিধিরা ত্রাণ বিতরণে প্রভাব খাটিয়েছেন। আবার কোনো কোনো এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে কম ত্রাণ প্রদান করা হয়েছে। যেমন জিআর চাল ১০ কেজির স্থানে তিন থেকে আট কেজি পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে। আবার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ১১ : জরিপকৃত খানার প্রদত্ত তথ্যমতে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম (শতাংশে) (একাধিক উত্তর*)

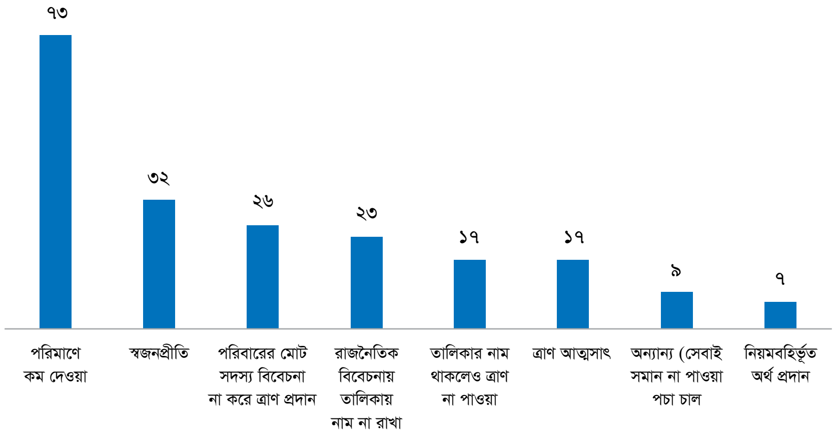

*শুধু যারা ত্রাণ প্রাপ্তিতে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন তাদের তথ্যের ভিত্তিতে (n=81)

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ন্যায্যতার ঘাটতি : ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে দুর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি ছিল। আবার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ঘাটতি ছিল।

আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতি ও দুর্নীতির ঝুঁকি : ত্রাণ পরিবহন খরচ অর্থাৎ ট্রাক ও ট্রলার খরচ, শ্রমিক খরচ, বিতরণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচে বরাদ্দ না থাকায় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তা মেটানো হয়েছে। ফলে সেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। উপজেলা পর্যায়ে জিআর-ক্যাশ ব্যবহার করে পরিবহন খরচ মেটানোর ফলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বস্তা চাল পরিবহনে সর্বনিম্ন ১৫ টাকা খরচ হলেও এ খাতে সরকারি বরাদ্দ না থাকার অজুহাতে চেয়ারম্যানরা প্রতি সুবিধাভোগীকে বরাদ্দকৃত চাল থেকে কম দিয়েছেন। এ ছাড়া ত্রাণের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে মন্ত্রীর পরিদর্শন বাবদ খরচ জোগানোর অভিযোগ রয়েছে। আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে বন্যাকালীন চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ থাকে না। একটি ইউনিয়নে মেডিকেল টিমের দুর্গম চরে যেতে নৌকা ভাড়া ১ হাজার থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়। বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসেবা প্রদানে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি : ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা, বাঁধ বা বেড়িবাঁধ, সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও মেরামতে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। আবার উদ্ধারকাজ পরিচালনা, মেডিকেল টিম প্রেরণ, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এনজিওদের ত্রাণ বিতরণ কাজেও সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এনজিওরা শুধু তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে

ত্রাণ বিতরণ করেছে। সমন্বয়ের অভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে তাদের কার্যক্রমের দ্বৈততা লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিও নিয়ম ভঙ্গ করে বন্যার সময়ও কিস্তি আদায়ের চেষ্টা করেছে। আবার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনজিওদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার ঘাটতি ছিল। যেমন এনজিওদের বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রম সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে করা হয়নি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে না জানিয়ে গৃহ পুনর্নির্মাণ সহায়তা, নগদ অর্থসহায়তা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এমনকি বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে না থাকারও তথ্য পাওয়া গেছে।

সক্ষমতার ঘাটতি : বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা ছিল না। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে নৌকার ব্যবস্থা না করায় গৃহস্থালির মালামাল সরিয়ে নিতে দরিদ্রদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। পরিবহনের অভাবে কিছু ক্ষেত্রে অধিক দুর্গত এবং দুর্গম এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানো কিংবা এবং ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব হয়েছে। অন্যদিকে জনবলের ঘাটতির কারণে অনুমাননির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ করা হয়েছে। যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্থানীয় কৃষি, প্রাণী ও মৎস্যসম্পদ কার্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। আবার প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। এ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও জনবল না থাকায় জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতে বিলম্ব হয়েছে।

জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা : ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত খানা পরিদর্শন না করে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এ ছাড়া ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। আবার অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করায় প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতি ছিল।

অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি : ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণসংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা ছিল না। উপজেলা প্রশাসন ত্রাণ বিতরণসংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ করলে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আবার ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নাম প্রকাশ না করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেও সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া গণমাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করায় ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি হয়রানিও করা হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে উদ্যোগের ঘাটতি, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা এবং মেরামতের অভাবে বাঁধ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বন্যা মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা ও স্থায়ী আদেশাবলি প্রতিপালনে ব্যত্যয় লক্ষণীয়, বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে এনজিওর সমন্বয় না করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি না করা, দুর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার না করা এবং অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য না দেওয়া। আবার ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য সরকারি বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না। সে কারণে বন্যাপ্লাবিত অসংখ্য মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

চিত্র ১২ : জরিপে প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যা মোকাবিলায় সার্বিক চ্যালেঞ্জ (শতকরা হার)

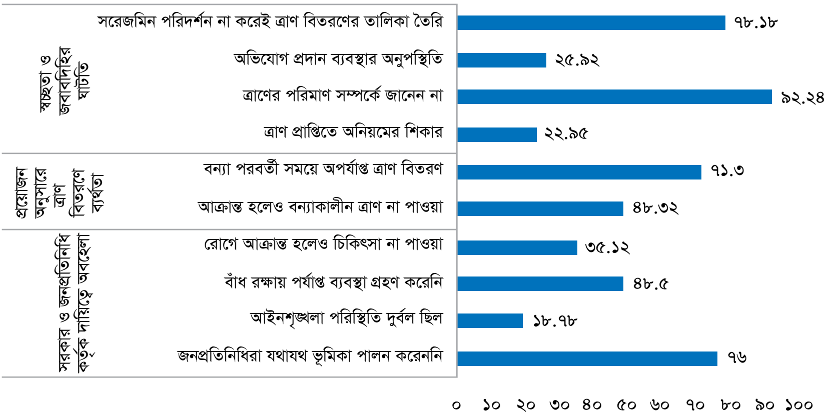

এ ছাড়া স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষণীয়। সে কারণে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ প্রদান, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণের চাল কম দেওয়া, একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া, অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করলে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বন্যাকালীন প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যা আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ঘাটতি ছিল। সার্বিকভাবে ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায্যতা ও জন-অংশগ্রহণের ঘাটতির পাশাপাশি বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনের সার্বিক তদারকিতে দুর্বলতা লক্ষণীয়।

সুপারিশ

বন্যা মোকাবিলা ও ত্রাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শুদ্ধাচারের ঘাটতি পূরণে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

বন্যা-পূববর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১. জনসংখ্যা অনুপাতে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং বন্যা শুরুর আগেই সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

২. গবাদিপশু ও সম্পদ রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা এবং সম্পদ সুরক্ষার কৌশল হাতে-কলমে শেখানো।

৩. বন্যার ২৪ ঘণ্টা আগে সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারব্যবস্থা উন্নত করাসহ বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা।

৪. নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি যেমন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহড়া, পরিবহন ইত্যাদি গ্রহণ করা।

৫. বর্ষা মৌসুমের আগেই বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার করা।

বন্যাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য

৬. ত্রাণ ক্রয় ও বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ, ক্রয়কৃত ত্রাণের পরিমাণ ও তালিকা এবং বিতরণকৃত ত্রাণের তথ্য প্রকাশ, প্রশাসন কর্তৃক তদারকি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যা বিবেচনায় ত্রাণের তালিকা প্রস্তুত করা।

৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা। এ ক্ষেত্রে দুর্গম এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান।

৯. জরুরি সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, তদারকি নিশ্চিতে কার্যকর আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা– উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন এবং এনজিওসহ সব অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১০. জবাবদিহি নিশ্চিতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসনব্যবস্থা কার্যকর করা।

১১. ত্রাণকার্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পরিবহন এবং যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ।

বন্যা-পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১২. পানিবাহিত রোগ মোকাবিলায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।

১৩. ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১৫. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং কমিউনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও ভাসমান বীজতলা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান; সরকারি উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বিমা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

১৬. ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা সংস্কার, বাড়িঘর মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনর্নির্মাণে সহায়তা করা।

১৭. ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং পুনর্নির্মাণে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা।

১৮. বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রতি অর্থবছরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা।

তথ্যসূত্র

ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর, ২০১৩, এর দ্বিতীয় সংস্করণ, সিডিকেএন প্রকাশিত পৃ. ৩২০ হতে সংগৃহীত।

খান, মু. জা. হো.; খোদা, মই (২০১০) 'বাংলাদেশের আইলা উপদ্রুত উপ*কূলীয় অঞ্চলে বাঁধ : ব্যবস্থাপনা ও পুনর্নির্মাণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি'* ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২।*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, *দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১০*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *দুর্যোগবিষয়ক জরিপ-২০১৫*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, *ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রতিবেদন*, ৩১ মে ২০১৬।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, *মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩*।

Akram, M.S.; Mahmud, T.; Iftekharuzzaman, 2007, *`Integrity in Humanitarian Assistance: Issues and Benchmarks'* Transparency International Bangladesh.

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের বাংলাদেশে অবস্থান : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় *

মো. শাহ্‌নূর রহমান, নাজমুল হুদা মিনা ও গোলাম মহিউদ্দীন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ একটি পুরোনো সংকট। ১৯৭৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকারের দমন-পীড়নের ফলে বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭৮ সালে মিয়ানমার সরকার প্রথম ‘অপারেশন নাগমিন’ (ড্রাগন কিং) পরিচালনার মাধ্যমে রাখাইন ও কাচিন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দমন-পীড়ন ও গণহত্যা শুরু করে। এর ফলে প্রায় ২ লাখ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার আলোচনার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত নেওয়ার জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর ১৯৭৯ সালে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। বাকি ২০ হাজারের মধ্যে ১০ হাজার বিভিন্ন সময়ে মারা যায় এবং ১০ হাজার নিখোঁজ ছিল।

১৯৮২ সালে মিয়ানমার সরকারের নাগরিক আইনে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় টানাপোড়েন শুরু হয়। ১৯৯১ সালে গণহত্যা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এই পরিস্থিতি বিবেচনায় তখন বাংলাদেশ সরকার সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো সঙ্গে নিয়ে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কাঠামোগত কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নেয় এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন (আরআরআরসি) গঠন করে। এই কমিশনের প্রচেষ্টায় এবং জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) মধ্যস্থতায় ২ লাখ ৩০ হাজার শরণার্থীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়।

এরপর আবার ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। ২০১৬ সালে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নতুন করে পালিয়ে আসে আরও ৯০ হাজার এবং ২০১৭ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৭৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী। সর্বশেষ ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন

* ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

রাজ্যে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৮৪১ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে, যা স্মরণকালের ভয়াবহতম অনুপ্রবেশ এবং পৃথিবীর দ্রুততম শরণার্থী বিপর্যয়।[১] জাতিসংঘ কর্তৃক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সবচেয়ে 'নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের এই নৃশংসতাকে 'জাতিগত নিধন' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] এ ছাড়া অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা একে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[৩]

রোহিঙ্গা সংকটের ফলে শুধু বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না; বরং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অনেক দেশের সরকার ও মানুষের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের আগে বাংলাদেশ ইউএনএইচসিআরের শীর্ষ শরণার্থী আশ্রয় প্রদানকারী দেশের তালিকায় ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম শরণার্থী আশ্রয়প্রদানকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত।[৪] রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয়ভাবেও এ বিশাল অনুপ্রবেশকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বাগত জানানো হয়, যদিও এর বহুমুখী প্রভাব ও বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

২০১৭ সালের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহৎ হওয়ায় এবং স্বল্প সময়ে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়ার ফলে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বহুবিধ চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা ও এর গুরুত্ব বিবেচনায় টিআইবি ২০১৭ সালে একটি দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় এ সমস্যার স্বল্প, মধ্যম, দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুশাসন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে রোহিঙ্গাদের আগমন ও আশ্রয় স্থাপনে দুর্নীতির শিকার; ত্রাণ বিতরণসহ অন্যান্য সহায়তার ক্ষেত্রে অসমতা; ত্রাণের টোকেন বিক্রয়, ত্রাণ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে।[৫] সম্প্রতি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলোর একটি বড় অংশ এখনো একই মাত্রায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিত পরিসরে বিদ্যমান। এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হওয়ায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনার বিষয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে অধিকতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জের বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করার জন্য গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকদের ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- রোহিঙ্গাদের জন্য গৃহীত উদ্যোগ এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রম ও সমন্বয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা;

- রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণের পাশাপাশি অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা;
- সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও মাঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়, ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ, ক্যাম্প-ইন চার্জ (সিআইসি), সাইট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়, বন বিভাগ, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য হিসেবে রোহিঙ্গা সংকট ও ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও সংশ্লিষ্ট নথি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গুণগত গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়া আশ্রয় ক্যাম্পের প্রকারভেদে সব ধরনের ক্যাম্প (নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত) পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি ও সময়কাল

এ গবেষণায় রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায়, বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয়, সাড়া প্রদান, জবাবদিহি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যাবর্তন বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ ও চ্যালেঞ্জ আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং তাদের প্রত্যাবাসন-প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় সৃষ্ট ঝুঁকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবেশগত প্রভাবের পাশাপাশি রাজনৈতিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণাটি ১৩ জুলাই-৩০ অক্টোবর ২০১৯ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি অংশীজন

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয় খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে। এনজিওবিষয়ক ব্যুরো এফডি-৭-এর আওতায় এনজিওগুলোর কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদান করছে। অপরদিকে মাঠপর্যায়ে (কক্সবাজারে) ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে আরআরআরসি এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়। এ ছাড়া যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে।

বেসরকারি অংশীজন

হিউম্যানিটারিয়ান অংশীজনদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কৌশলগত নির্বাহী দল (এসইজি) নেতৃত্ব প্রদান করছে; এর সহপ্রধান হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) চিফ অব মিশন, জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর এবং জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) প্রতিনিধি। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের কাজে বিভিন্ন সেক্টর বা খাতভিত্তিক (খাদ্য, শিক্ষা, আশ্রয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) সমন্বয়ের জন্য রয়েছে ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি)। উল্লেখ্য, সাতটি খাতের সবগুলোতেই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বে রয়েছে।

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উদ্যোগ

২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় রোহিঙ্গা সংকটের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকিসহ সুশাসন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করার পাশাপাশি এর থেকে উত্তরণে যেসব সুপারিশ করা হয়, তার মধ্যে নিচের উদ্যোগগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

- অনাথ শিশুদের (৩৬ হাজার ৩৭৩ জন) তালিকা সম্পন্ন করা;
- অভিযোগ নিরসণে 'কমপ্লেইন ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু করা;
- পরিবেশ, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি নিরূপণে সমীক্ষা পরিচালনা ও ক্ষতিরোধে সুপারিশ প্রণয়ন;
- অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে আগে প্রচলিত ত্রাণের টোকেনের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের কার্ড, যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড, অ্যাসিস্ট্যান্স কার্ড, ফ্যামিলি কাউন্ট কার্ড, আরসিএন কার্ড, ফুয়েল কার্ড ও ফুড কার্ড চালু করা;
- আইএসসিজি ও আরআরআরসির কার্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট বিরতিতে যথাক্রমে 'সিচুয়েশন রিপোর্ট' ও 'মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা' প্রকাশ; এবং
- মানবিক সহায়তায় বিভিন্ন খাতের বছরভিত্তিক (২০১৭-১৯) আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করা।

এ ছাড়া অন্যান্য গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পগুলো পরিচালিত করা; ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় ২৮টি সিআইসি

অফিস নির্মাণ ও সিআইসি নিয়োগ; রোহিঙ্গাদের জন্য ভাসানচরে আবাসন নির্মাণ : ১২০টি গুচ্ছগ্রাম, ১ হাজার ৪৪০টি ব্যারাক ও ১২০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ; রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যৌথ ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা; আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহস্থালি বর্জ্য রিসাইক্লিং প্রকল্প গ্রহণ; ১ লাখ ২৭ হাজার ৮৫২টি পরিবারকে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি সরবরাহ; ই-ভাউচার পদ্ধতিতে প্রতি রোহিঙ্গার জন্য মাসিক ৭৭০-৭৮০ টাকা মূল্যের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা চালু এবং ক্যাম্পের ভেতরে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে দুটি ক্যাম্পের দুটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্যাম্প প্রতিনিধি বাছাই উল্লেখযোগ্য।

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

সমন্বয়ের ঘাটতি

রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান। সরকারি অংশীজনের মধ্যে এনজিও কার্যক্রমের তদারকিতে, বিশেষত কার্যক্রমের অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদান এবং ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে জেলা প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং আরআরআরসি কার্যালয় একই ভূমিকা পালন করে। এর ফলে এনজিওগুলোর প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি এবং নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ডিসি অফিস ও আরআরআরসির মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পের ভেতরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণায় অস্পষ্টতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং আরআরআরসির মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল এবং এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে ক্যাম্প পর্যায়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাজের পুনরাবৃত্তি ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকা সত্ত্বেও একটি ক্যাম্পে দুটি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লার্নিং সেন্টার তৈরিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে ওই ক্যাম্পে ডোবা, নালা ও পাহাড়ের ওপর বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে লার্নিং সেন্টার স্থাপন হয়েছে। অথচ যেসব ক্যাম্পের যোগাযোগব্যবস্থা ভালো নয়, সেখানে লার্নিং সেন্টারের অপ্রতুলতা রয়েছে।

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি

জনবলের ঘাটতি

ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান। ১২ জন সিআইসি ও ২২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সিআইসিসহ মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা দ্বারা প্রায় ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর বসবাসরত ৩৪টি ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। জনবল ঘাটতির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সিআইসিকে ৩-৫টি ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সার্বিকভাবে জনবল ঘাটতির কারণে ক্যাম্পের তদারকি ব্যাহত হয় এবং ক্যাম্প পরিচালনা ও ত্রাণ বণ্টনে ‘মাঝি’দের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়, ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

ক্যাম্প পরিচালনায় সিআইসিদের দক্ষতা ও মানবিক নীতি-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ঘাটতি

শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থাপনা প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সমন্বয় রেখে 'মানবিক নীতি' মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অধিকন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় পরিচালিত কর্মসূচি সমন্বয় করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায়, বিশেষত 'মানবিক সহায়তার নীতি' বিষয়ে সিআইসিদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে সিআইসি ও তার সহযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবিক নীতি না মেনে চলার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সাথে খারাপ আচরণ এবং শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, মাত্র ৯ জন সিআইসিকে 'মানবিক নীতি'বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি

রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত একবারও প্রয়োজনের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ যথাক্রমে ৭৩, ৬৯ ও ৫৫ শতাংশ। ফলে খাতভিত্তিক মৌলিক চাহিদা পূরণে (বিশেষত খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশন, আশ্রয় ও সাইট ব্যবস্থাপনা) সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে রোহিঙ্গা সংকটের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে, ফলে অর্থ সহায়তা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পগুলোতে মানবিক ত্রাণ কর্মসূচি সংকুচিত হয়ে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপর বর্তাবে যা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ ৪৪৩ দশমিক ৩০ মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮ শতাংশ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কি না, সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন-প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এ ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়সহ সামগ্রিকভাবে কোনো আর্থিক প্রাক্কলন এবং কৌশলগত কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ফলে রোহিঙ্গা সংকটের কারণে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি তৈরিসহ দীর্ঘমেয়াদে সংকট মোকাবিলায় ঝুঁকি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

এফডি-৭-এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনায় এনজিও ব্যুরোর পক্ষ থেকে জবাবদিহিকাঠামো লক্ষণীয়। তবে অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে (কর্মসূচি বাস্তবায়নে) বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। অপরদিকে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরকারের

কোনো নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিকাঠামো নেই। এ ছাড়া তাদের অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত (পরিচালন ব্যয়, কর্মসূচি ব্যয়) সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার এফডি-৭-এর আওতায় পরিচালিত কর্মসূচির ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জটিল ব্যবস্থা থাকলেও জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও তাদের অনুদানে পরিচালিত সংস্থাগুলোর বিতরণকৃত ত্রাণের কোনো যাচাই ব্যবস্থা নেই।

এফডি-৭-এর আওতায় যেকোনো প্রকল্প প্রস্তাবনায় মোট অনুদানের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করার নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণে ঘাটতির পাশাপাশি তা কীভাবে অনুসরণ করা হবে তার কোনো নির্দেশনা বা কাঠামো নেই। আবার ক্যাম্প পর্যায়ে চলমান কর্মসূচির তালিকা ও বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ক্যাম্প প্রশাসনকে অবহিত করার নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা তা করে না। আরআরআরসির ওয়েবসাইটে ক্যাম্পে কর্মরত এনজিওদের তালিকা, সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। এ ছাড়া ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না।

অপরদিকে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওর একাংশের পরিচালন ব্যয় তাদের কর্মসূচির ব্যয়ের তুলনায় বেশি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জাতিসংঘের সাতটি সংস্থার প্রদত্ত তথ্য (২০১৭-১৯) অনুযায়ী, সর্বোচ্চ পরিচালন ব্যয় ইউএন ওম্যান (৩২ দশমিক ৬ শতাংশ) ও সর্বনিম্ন জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (৩ দশমিক শূন্য শতাংশ)। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাগুলোর প্রদত্ত কর্মসূচি ব্যয়ের মধ্যে তাদের অনুদানে পরিচালিত এনজিওগুলোর পরিচালন ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় জাতিসংঘের অনুদানে পরিচালিত কর্মসূচির পরিচালন ব্যয়ের হারের সঠিক হিসাব শুধু সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক করা সম্ভব। তবে তা অবশ্যই নিচে প্রদত্ত হারের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি।

সারণি-১ : রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় (২০১৭-২০১৯) জাতিসংঘের ৭টি অঙ্গ সংস্থার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিচালন ব্যয় ও কর্মসূচি ব্যয়ের হার

জাতিসংঘ অঙ্গ সংস্থার নাম	পরিচালন ব্যয় (%)	কর্মসূচি ব্যয় (%)
জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)	২৫.৯৮	৭৪.০২
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)	১৪.৭	৮৫.৩
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP)	১০.৩	৮৯.৭
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)	১৮.০	৮২.০
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)	৩.০	৯৭.০
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭.০	৮৩.০
ইউএন ওম্যান (UN WOMEN)	৩২.৬	৬৭.৫

তথ্যসূত্র : জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়, ৩০ অক্টোবর ২০১৯, ঢাকা

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে চ্যালেঞ্জ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি ক্যাম্পে 'কমপ্লেইন্ট ফিডব্যাক রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট' ব্যবস্থা চালু থাকলেও অধিকাংশ রোহিঙ্গা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। এ ছাড়া সিআইসি অফিসে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা রূঢ় আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। সার্বিকভাবে ক্যাম্পপর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রচারণার ঘাটতি ও এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংবেদনশীলতার ঘাটতির কারণে বেশির ভাগ রোহিঙ্গা অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির (মাঝি) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করে। অপরদিকে মানবিক সহায়তার কার্যক্রম ও কর্মসূচিসংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা (যেমন অভিযোগ বাক্স স্থাপন) লক্ষ করা যায়নি।

মানবিক সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

খাদ্য ও পুষ্টি

২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতে প্রয়োজন ছিল যথাক্রমে ২৫৫ ও ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে যথাক্রমে ১৫৯ মিলিয়ন ও ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে যা প্রয়োজনের যথাক্রমে ৬২ ও ৩৫ শতাংশ।[৬] রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি, নতুন অনুপ্রবেশ, আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে খাদ্য সহায়তার ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়।

ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ বিতরণে চাহিদা নিরূপণে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। পরিবার পর্যায়ে নির্দিষ্ট ত্রাণ বিতরণে শুধু মাথাপিছু সদস্যসংখ্যা বিবেচনা করা হয়। ফলে যেসব পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য বেশি তাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে প্রদত্ত ত্রাণ অপর্যাপ্ত হয়। এ ছাড়া নিয়মিত ত্রাণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া ও নিম্নমানের পণ্য সামগ্রী বিতরণের অভিযোগ রয়েছে। বিতরণকৃত চালের বস্তায় ৩০ কেজি লেখা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২৬-২৮ কেজি চাল দেওয়া হয়।

আবার খাদ্যবৈচিত্র্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় শুধু চাল, তেল ও ডাল দেওয়া হয়। বর্তমানে খাদ্যবৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে চালুকৃত ই-ভাউচারের আওতায় মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ২ দশমিক ৯ শতাংশ (২৬ হাজার ৫৪২ জন) সহায়তা পাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গার খাদ্যবৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজ খরচে কিনে খেতে হয়। পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী (২০১৯), ক্যাম্পসমূহে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ও ৫০ শতাংশ রক্তশূন্যতায় ভুগছে; এ ছাড়া ৬-২৩ মাস বয়সীদের মধ্যে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ শিশু ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য পায়।

এলপিজি গ্যাস সরবরাহের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও এখন পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ রোহিঙ্গা পরিবার দৈনন্দিন জ্বালানি চাহিদার জন্য বনের ওপর

নির্ভরশীল। প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ ব্যক্তিদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ না করা লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণকেন্দ্রগুলো দূরবর্তী হওয়ায় প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ত্রাণ নিতে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এ ক্ষেত্রে অন্যের সহযোগিতা নেওয়ায় ত্রাণের একটি অংশ সাহায্যকারীকে দিতে হয়।

স্বাস্থ্য

২০১৯ সালে স্বাস্থ্য খাতের জন্য প্রয়োজন ছিল ৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে যা চাহিদার তুলনায় মাত্র ৩৫ শতাংশ।[৭] রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় ৭টি ফিল্ড হাসপাতাল ও ১৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু তা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও রোগীর চাহিদা তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। হাসপাতালগুলোতে সাধারণ শল্যচিকিৎসা এবং জরুরি প্রয়োজনে রক্ত সরবরাহে ব্লাড ব্যাংক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি রয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পগুলোতে ম্যালেরিয়া, টিবি, এইচআইভি, হেপাটাইটিস-বি জাতীয় রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির ঘাটতি রয়েছে।

ক্যাম্পগুলোতে পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গড়ে প্রায় ৮৫-৯০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করছে। ক্যাম্পগুলোতে নিবন্ধিত মোট এইচআইভি রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৬০০। এইচআইভি আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা থ াকলেও এ ক্ষেত্রে কোনো স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। বাংলাদেশে ডিপথেরিয়া নির্মূল হওয়ার কাছাকাছি থাকলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এর মহামারির ঝুঁকি লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ডিপথেরিয়ায় ৮ হাজার ৬৪১ জন আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যু হয় ৪৫ জনের। ক্যাম্প পর্যায়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ওষুধের সবগুলো না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে যেকোনো অসুখের ক্ষেত্রে শুধু প্যারাসিটামল দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণে দালালের সহায়তা নিতে বাধ্য করা এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা

শিক্ষাসেবার জন্য ২০১৯ সালে প্রয়োজন ছিল ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিন্তু ২২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রয়োজনের বিপরীতে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়া গেছে, যা প্রয়োজনের ৫০ শতাংশ।[৮] ক্যাম্পগুলোতে কোনো অনুমোদিত পাঠ্যক্রম না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান করে। এ ক্ষেত্রে লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক বা শিখনকাঠামো তৈরিতে বিলম্ব লক্ষণীয়। ক্যাম্পে প্রায় ১ লাখ ১৭ লাখ রোহিঙ্গা কিশোরের জন্য কোনো শিক্ষা পদ্ধতি না থাকায় ধীরে ধীরে তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে কাজ করাসহ অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার সামাজিক বাধানিষেধ ও চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে অধিকাংশ রোহিঙ্গা অভিভাবক তাদের কিশোরী মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ পোষণ করে। এ

ছাড়া স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পের কারণে তহবিল শেষ হয়ে গেলে অনেক লার্নিং সেন্টার বন্ধ হয়ে যায়, ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

পানি ও স্যানিটেশন

পানি ও স্যানিটেশন খাত পরিচালনায় ২০১৯ সালে অর্থের প্রয়োজন ছিল ১৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা চাহিদার মাত্র ২২ শতাংশ।[৯] ক্যাম্পগুলোতে পানি সরবরাহে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। ক্যাম্পের ভেতরে বিভিন্ন পয়েন্টে অগভীর নলকূপ ও হস্তচালিত পাম্প টিউবওয়েল নষ্ট। এ ছাড়া বেশির ভাগ ক্যাম্পেই নলকূপগুলো অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে খাবার পানি অনেকদূর থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

ক্যাম্পগুলোর একাংশের নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। কিছু ক্যাম্পে পর্যাপ্ত টয়লেট না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী সাইট ম্যানেজমেন্ট অফিস কর্তৃক টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা করা হয় না। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে টয়লেটগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। ক্যাম্পগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন ও বৃষ্টির পানিনিষ্কাশনব্যবস্থা অপরিকল্পিত ও নাজুক হওয়ায় বর্ষাকালে ভারী বর্ষণে নালা ও নর্দমার পানি উপচে পড়ে। এর ফলে ক্যাম্পের রাস্তাঘাটে পানি জমে থাকে এবং হাঁটাচলায় সমস্যা হয়।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

২০১৯ সালে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদার পরিমাণ ছিল ৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৩৪ মিলিয়ন ডলার যা মোট চাহিদার ৩৯ শতাংশ।[১০] এ খাত পরিচালনায় চাহিদা অনুযায়ী তহবিল না পাওয়ায় সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে।[১১]

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দিনের বেলা নিরাপত্তাব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও রাতের বেলা নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। ৩৪টি ক্যাম্পের মধ্যে দুটি নিবন্ধিত ক্যাম্প ব্যতীত বাকিগুলোতে সিআইসির অধীনে নিরাপত্তাকর্মী নেই। নিরাপত্তার ঘাটতির কারণে সিআইসি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সিআইসি রাতের বেলা এসব ক্যাম্পে অবস্থান করেন না। ফলে দুটি নিবন্ধিত ক্যাম্পের তুলনায় বাকিগুলোতে অপরাধ বেশি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যৌথবাহিনী ক্যাম্পের ভেতরে শুধু যেসব জায়গায় যোগাযোগব্যবস্থা ভালো সেখানে টহল দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, যৌথ বাহিনী উখিয়ায় অবস্থিত ২৬টি ক্যাম্পে ৮টি দল এবং টেকনাফের ৮টি ক্যাম্পে ২টি দলে ভাগ হয়ে টহল দেয়।

মিয়ানমারে অবস্থানকালে নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও শিক্ষার সংকট এবং স্থানান্তরজনিত অনিশ্চয়তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনোসামাজিক অসহায়ত্ব, সহিংস মনোভাব ও অপরাধপ্রবণতা তৈরি করেছে। ফলে ক্যাম্পগুলোতে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, মাদকপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ বাড়ছে। কক্সবাজার জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন

অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে মোট মামলা হয়েছে ৪৭১টি, এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ১ হাজার ৮৮। এ ছাড়া ক্যাম্পগুলোতে পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানির ঘটনা বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে এতিম শিশু ও অল্পবয়সী মেয়েদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ৭টি সন্ত্রাসী গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী গ্রুপের হুমকির কারণে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করা নারীদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ক্যাম্পভিত্তিক দালাল চক্রের সহায়তায় রোহিঙ্গাদের পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এ জন্য প্রাথমিকভাবে দালালদের ১০-২০ হাজার টাকা এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর দেড়-দুই লাখ টাকা দিতে হয়। পাচারের ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ হিসেবে মহেশখালীর সোনাদিয়া, জেটি ঘাট, নাজিরাটেক, কক্সবাজার পৌরসভার সোহলান্দি ঘাট, সদরের চৌফলন্দি ঘাট এবং টেকনাফের বাহারছড়া শিলখালী পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নারীদের পাচারের সংখ্যা বেশি।

অপরদিকে ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তাদের একাংশ স্থানীয় রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় জনগণের সাথে মূল স্রোতে মেশার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিজ ক্যাম্পের বাইরে চলাচল সীমিত করা হলেও ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় টমটম ড্রাইভারদের সহায়তায় ২৫০-৩০০ টাকার বিনিময়ে মরিচ্যা চেকপোস্ট এড়িয়ে ক্যাম্প ত্যাগ করার অভিযোগ রয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি অংশীজন

এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনে (এফডি-৭) দীর্ঘসূত্রতা এবং অনুমোদন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন দাবির অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পেতে কমপক্ষে ৭-১৫ দিন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক মাসেরও অধিক সময়ক্ষেপণের অভিযোগ পাওয়া যায়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র সংগ্রহে যথাক্রমে প্রকল্প প্রতি নিয়মবহির্ভূতভাবে ২০-৫০ হাজার ও ৫০-৭০ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এ ছাড়া জেলা প্রশাসক ও ইউএনও কার্যালয়ের সংস্কার এবং একটি স্থানীয় অটিস্টিক বিদ্যালয়ে সহযোগিতার নামে সংস্থাগুলোকে টাকা দিতে বাধ্য করার অভিযোগ রয়েছে। আবার ক্যাম্পে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন বা ছাড়পত্র পেতে সিআইসি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত টাকা ও অনৈতিক সুবিধা, যেমন বিমানের টিকিট, আত্মীয়স্বজনের কেউ বেড়াতে এলে গাড়ি ও হোটেল সুবিধা ইত্যাদি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

তবে এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর ভাষ্য অনুযায়ী দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ সঠিক নয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ে যৌক্তিক সময় নেওয়া হয়। এনজিওগুলো প্রকল্প দাখিলের পর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সঠিক প্রতীয়মান হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মহাপরিচালক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড়ের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এনজিও কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প দাখিল, দাখিলকৃত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আইটেমের সাথে জেলা প্রশাসন ও আরআরআরসি কর্তৃক প্রেরিত তালিকার গরমিল, ইতিপূর্বে সম্পাদিত প্রকল্পে আরোপিত শর্ত মোতাবেক চাহিত প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট, প্রত্যয়নপত্র, সমাপনী প্রতিবেদন, আরআরসি ও ডিসি কক্সবাজারের কাছে দাখিলকৃত এফডি-৭-এর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র) ইত্যাদি দাখিল না করা এবং বাজেটে অসমাঞ্জস্যতা।

ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ভিন্ন ভিন্ন যাচাই ব্যবস্থার কারণে সমন্বয়ের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সময়ক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক নিয়মিত ও বিশেষ ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে ত্রাণের মালবাহী গাড়িপ্রতি নিয়মবহির্ভূতভাবে ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা আদায় করে এবং না দিলে ৫-১৫ দিন সময়ক্ষেপণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। যেসব সংস্থা ঘুষ দেয় তাদের ক্ষেত্রে মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে শিথিলতার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য গৃহীত নমুনা ফেরত দেওয়া হয় না এবং প্রায়ই নমুনার সংখ্যা জোর করে বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে।

সিআইসিদের একাংশ এনজিওদের কার্যক্রম তদারকিতে বিশেষত কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে প্রতি কর্মসূচি বাবদ নিয়মবহির্ভূতভাবে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই টাকা দিতে কোনো সংস্থা অপারগ হলে পরবর্তী সময়ে তাদের কাজে অসহযোগিতা করার অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি অংশীজন

ক্যাম্প পর্যায়ে এফডি-৭ এবং জাতিসংঘের অনুদানে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর একাংশের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন ঘর নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, লার্নিং সেন্টার স্থাপনসহ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন) বাস্তবায়নে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার, কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ না করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তাদের একাংশ এনজিওবিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত 'এনজিওগুলোর কর্মপরিধি' লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন নিয়ম ভেঙে রোহিঙ্গাদের নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে কাজের সুযোগ ও চাকরি দেওয়া, মানবিক সহায়তার বাইরে প্রত্যাবাসনবিরোধী ভূমিকা রাখা, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে সহায়তা ও টি-শার্ট বিতরণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া, প্রকল্পে অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিতরণ, রোহিঙ্গাদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণের অভিযোগ রয়েছে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা সমাবেশের ব্যানার তৈরিতে

সহায়তা ও টি-শার্ট বিতরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো দুটি আন্তর্জাতিক এনজিওর কার্যক্রম বন্ধ ও ব্যাংক হিসাব সাময়িক স্থগিত করেছে।

বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তিতে 'মাঝি'দের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা আদায় ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'মাঝি'দের দ্বারা অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেকোনো বিচার-সালিসের মীমাংসার জন্য মাঝিদের টাকা ও ত্রাণের অংশ দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এ টাকার পরিমাণ ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা।

সারণি ২ : ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত ও পরিমাণ

নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
এফডি-৭ অনুমোদন	সুনির্দিষ্ট নয়	এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তাদের একাংশ
ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাই	২,৫০০-৩,০০০ (গাড়ি প্রতি)	ডিসি অফিসসংশ্লিষ্ট কমিটির একাংশ
প্রকল্প সমাপ্তির ছাড়পত্র	২০,০০০-৫০,০০০	ইউএনও অফিসসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	৫০,০০০-৭০,০০০	ডিসি অফিসসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
	২০,০০০-২৫০০০ (ক্ষেত্রবিশেষে)	সিআইসি অফিসসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশ
ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে বের হওয়া	২৫০-৩০০	দালাল ও 'টমটম' ড্রাইভার পুলিশ চেকপোস্ট
মানব পাচার	১০,০০০-২০,০০০ (প্রাথমিক) ১,৫০,০০০-২,০০,০০০ (পৌঁছানোর পর)	দালাল
বিশেষ ত্রাণের টোকেন প্রাপ্তি	৫০০-১,০০০	মাঝি
ক্যাম্পভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি	২,০০০-৩,০০০	মাঝি

প্রত্যাবাসনের চ্যালেঞ্জ

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিটার্ন অব ডিসপ্লেসড পারসন্স ফ্রম রাখাইন স্টেট' ও ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ৩০ দফা 'ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট' শীর্ষক

চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর এবং ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

রোহিঙ্গা-সংকট উৎপত্তির মূল কারণ মিয়ানমার সরকারের অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক দায়দায়িত্বও মিয়ানমার সরকারের ওপর বর্তায়। মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ অর্থাৎ প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রত্যাবাসনের আস্থা সৃষ্টি হয়নি। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীজনের ভূমিকার ঘাটতি রয়েছে। রোহিঙ্গা-সংকট সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে চীন, ভারত ও জাপানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ তিনটি দেশ বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবেও পরিচিত। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ-সম্পর্কিত কারণে এ তিনটি দেশই মিয়ানমারের পক্ষে ভূমিকা পালন করে। ফলে এ-সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি কার্যত বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা পরিবারের তালিকা তৈরি ও যৌথ যাচাইয়ের কাজে বিলম্ব হওয়া লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, ইউএনএইচসিআরের সহায়তায় যৌথ যাচাইয়ের কাজ ২০১৮ সালের ২৪ জুন শুরু হলেও ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৬ লাখ ৬০ হাজার ৮৮৭ জনের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের ঝুঁকি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তা বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রভাব ও ঝুঁকি বিদ্যমান।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি

রোহিঙ্গা শ্রমিকদের সহজলভ্যতার ফলে স্থানীয়দের (উখিয়া ও টেকনাফ) কাজের সুযোগ কমেছে। অল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয়রা বিভিন্ন কাজে (লবণ চাষ, চিংড়ি হ্যাচারি, চাষাবাদ) রোহিঙ্গাদের নিয়োজিত করছে। ফলে স্থানীয় দিনমজুরদের মজুরি গড়ে ১৫ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে।[১২] এ ছাড়া স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন পণ্যের হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে শাকসবজি থেকে শুরু করে মাছ-মাংসের দাম ৫০-৬০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩] এ ছাড়া উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার সড়কগুলোতে প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা, মানবিক সহায়তায় নিয়োজিত কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তাদের যানবাহন এবং ত্রাণবাহী ট্রাকের অতিরিক্ত চলাচল ও চাপে যানজটসহ রাস্তাঘাটের ক্ষতি হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী (২০১৯), এ এলাকায় যানজট ২ দশমিক ৫ গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৪]

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল (৩ নভেম্বর) পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও

ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে অর্থছাড়ের পরিমাণ ২ হাজার ৩০৮ দশমিক ০২ কোটি টাকা।

সারণি ৩ : রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থছাড়ের পরিমাণ (২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থছাড়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	খাত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৩.২০	কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণ
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২.৪৫	দুটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড নির্মাণ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪.৫৫	আইডি কার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে সরঞ্জাম ক্রয়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১.৩২	এতিম শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯.৬৮	রাস্তা সংস্কার, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২,২৬৫.৯১	আবাসন ও নিরাপত্তায় অবকাঠামো নির্মাণ
জননিরাপত্তা বিভাগ	.৯০৯৭	সেনাসদস্যদের দৈনিক ভাতা ও কন্টিনজেন্সি
মোট	২,৩০৮.০২	

তথ্যসূত্র : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ নভেম্বর ২০১৯।

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের বড় অংশ জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আসছে। ইন্টার-সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের 'যৌথ সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ৯২ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে অক্টোবর পর্যন্ত ৫০ দশমিক ৬ কোটি ডলার অনুদান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সংস্থাভিত্তিক অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে (২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত) জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থার (ইউএনএইচসিআর, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, আইওএম, ইউএনএফপিএ, এফএও, ইউএন ওমেন, ডব্লিউএইচও) তহবিল প্রায় ৪৪ দশমিক ৩ কোটি মার্কিন মিলিয়ন ডলার যা প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮৮ শতাংশ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয় বহন করতে পারবে কি না, সে প্রশ্নটি এখন সামনে আসছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গাদের জন্য বড় ধরনের আর্থিক ব্যয় করতে হয়নি। এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের আংশিকও যদি বহন করতে হয় তাহলে তা বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার তহবিলে বাংলাদেশের অনুদান ২৫ লাখ ডলার। উল্লেখ্য, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি (২০১৮) ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিন ৩০০ রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বছরভিত্তিক খরচের একটি প্রাক্কলন করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবস্থান ২০২৫ সাল পর্যন্ত হলে ৪৪৩

দশমিক ৩ কোটি ডলার, ২০২৬ সাল পর্যন্ত হলে ৫৮৯ দশমিক ৮ কোটি ডলার এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হলে ১০৪৫ দশমিক ৬ কোটি ডলার ব্যয় হবে[১৫]। উল্লেখ্য এই ব্যয়ের মধ্যে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সামাজিক ঝুঁকি

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মোট জনসংখ্যার ৩৪ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল স্থানীয় অধিবাসী ও ৬৩ দশমিক ২ শতাংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।[১৬] এ ছাড়া আগে উখিয়া ও টেকনাফে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল যথাক্রমে ৭৯২ ও ৬৮০, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩ হাজার ৪৬৮ ও ২ হাজার ৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে।[১৭] ফলে এই দুটি উপজেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্লোবাল নেটওয়ার্ক এগেইনেস্ট ফুড ক্রাইসিসের গ্লোবাল রিপোর্ট, ২০১৯ অনুযায়ী কক্সবাজারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৩ লাখ। এদের মধ্যে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা উভয়ই রয়েছে। আবার কক্সবাজার জেলার সরকারি হাসপাতালগুলোকে তাদের মোট চাহিদার ২৫ শতাংশের অতিরিক্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া এইডস আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে স্থানীয়দের মধ্যে এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা বিদ্যমান। রোহিঙ্গা-সংকটের কারণে স্থানীয় প্রশাসনের ৫০ শতাংশ মানবসম্পদ ও লজিস্টিকস সহায়তা বর্তমানে রোহিঙ্গা-সম্পর্কিত কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর ফলে কক্সবাজার জেলাসহ উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক ঝুঁকি

দীর্ঘ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে ৫৯ হাজার ১৭৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আটকের সংখ্যা ছিল ৬৯০। পুলিশ, পাসপোর্ট অফিস ও নির্বাচন কমিশনের কিছু অসাধু কর্মচারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগসাজশে রোহিঙ্গাদের একাংশ জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরিসহ মোবাইল সিম কার্ড সংগ্রহ করছে। এ ছাড়া সরকারের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ঘাটতির কারণে ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা মোবাইল ফোন ব্যবহারের পাশাপাশি অনলাইনভিত্তিক ১০টি ইউটিউব চ্যানেলে সক্রিয় রয়েছে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়াসহ নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে (টেকনাফ ও উখিয়া) সন্ত্রাসী বাহিনীর তৎপরতা লক্ষণীয়। ক্যাম্পগুলোতে প্রায় ৭টির মতো সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মুক্তিপণ না পেলে হত্যা করে লাশ গুম করা, ইয়াবা ও মানব পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া আধিপত্য বিস্তার, মাদক ব্যবসা, জমি দখল এবং বিভিন্ন কোন্দলের কারণে রোহিঙ্গাদের

একাংশ কর্তৃক স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হামলার শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট একজন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে একদল রোহিঙ্গা ওই ব্যক্তিকে তার বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং পাশের একটি পাহাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার পর ২৪ আগস্ট বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা একটি রোহিঙ্গাশিবিরে হামলা চালিয়ে অস্থায়ী ঘরবাড়ি ও এনজিও অফিসগুলোতে ভাঙচুর করে এবং টেকনাফ পৌরসভা থেকে লেদা পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) রোহিঙ্গা-সংকটকে ঘিরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে।

পরিবেশগত ঝুঁকি

পরিবেশগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে ভূমিধস, বন উজাড়, খাবার পানির সংকট এবং বন্য প্রাণীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ক্যাম্পে বসবাসরত পরিবারগুলোর দৈনন্দিন রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ৭ লাখ ৫০ হাজার কেজি কাঠ এবং বিভিন্ন গাছের শিকড় সংরক্ষিত বন থেকে সংগ্রহ করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলনে (২০১৯) কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ক্যাম্প নির্মাণের ফলে প্রায় ৬ হাজার ১৬৪ একর সংরক্ষিত বনভূমি, যার স্থানীয় হিসাবে মূল্য প্রায় ২ হাজার ৪২০ কোটি টাকা, উজাড় হওয়ার পাশাপাশি প্রায় ১ হাজার ৪০৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া হাতির চলাচলের পথ নষ্ট হওয়াসহ বন্য প্রাণীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন নিধনের এই ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজার জেলার পুরো বনাঞ্চল, হাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর আবাসস্থল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ মিলিয়ন ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে উখিয়া ও টেকনাফে পানির সংকট আরও প্রকট হয়েছে। উল্লেখ্য, টেকনাফ এলাকায় ৬০০ ফুট বা ১ হাজার ফুট গভীরতার টিউবওয়েলগুলোতেও পানির সংকট তৈরি হয়েছে।

উপসংহার

২০১৭ সালে আসা রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সমন্বয়, আন্তযোগাযোগ এবং তদারকিতে ঘাটতিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। জনবল ঘাটতির ফলে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। ক্যাম্পভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা মাঝিকেন্দ্রিক হওয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ডেটাবেইসের অনুপস্থিতি ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতির কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে।

রোহিঙ্গা-সংকটের গুরুত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় মানবিক সহায়তায় অনুদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, ফলে খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহায়তায় অপ্রতুলতা তৈরি হচ্ছে। আবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিতকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ও অগ্রগতির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের ওপর আর্থিক ঝুঁকি ও অর্থনীতির ওপর চাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। এসব সত্ত্বেও অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ও তা মোকাবিলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি প্রত্যাবাসন-প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তায় ঝুঁকিসহ পরিবেশ ও বনায়ন বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশ

সমন্বয় ও সক্ষমতাসংক্রান্ত

১. রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় এফডি-৭-এর আওতায় প্রকল্পগুলোকে বিশেষ ও জরুরি হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরুর অনুমতি ও ছাড়পত্র প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আরআরআরসির মাধ্যমে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিসি ও ইউএনও অফিসকে কাজ শুরুর আগে ও কাজ শেষ হওয়ার পর অবহিত করতে হবে।

২. ত্রাণের মান ও পরিমাণ যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে একীভূত যাচাই ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় আরআরআরসির জনবল বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি সিআইসির আওতায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে; প্রতিটি ক্যাম্পে রাতের বেলা ক্যাম্প ইনচার্জদের (সিআইসি) অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সিআইসিদের মানবিক নীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতাসহ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. মানবিক সহায়তায় খাতভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে কর্মকৌশল তৈরি করতে হবে।

৭. রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব নিরূপণ করে তা মোকাবিলায় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধসংক্রান্ত

৮. মানবিক সহাতায় প্রকল্প, অর্থ ব্যয়ের বিভিন্ন খাত, বাস্তবায়নের স্থান ও অগ্রগতিবিষয়ক তথ্য একটি সমন্বিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং তা হালনাগাদ করতে হবে।

৯. সিআইসি কর্তৃক ক্যাম্প পর্যায়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে; কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ নিয়ন্ত্রণে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

১০. মানবিক সহায়তায় কার্যক্রম ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে আরআরআরসি কার্যালয়ে কাঠামোবদ্ধ 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসনব্যবস্থা' চালু করতে হবে; ক্যাম্প পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. ক্যাম্প পর্যায়ে প্রতিটি ব্লকে নির্বাচনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত

১২. রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য দ্রুত সময়ে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাদের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিতে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা-সংকট নিরসনে প্রত্যাবাসনসহ যেকোনো চুক্তিতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যৌক্তিক প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ ISCG, Situation report, July 2019.

২ দি কনভারসেশন, 'The history of the persecution of Myanmar's Rohingya', সেপ্টেম্বর ২০১৭; https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040

৩ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/

৪ COAST and CCNF, *Crisis within the Crisis*, July 2018.

৫ টিআইবি, 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বাংলাদেশে অবস্থানজনিত সমস্যা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জবিষয়ক সমীক্ষা', ২০১৭।

৬ ISCG, *Rohingya Refugee Crisis: Joint Response Plan 2019 funding update*, 22 October, 2019, Cox's Bazar.

৭ *প্রাগুক্ত*।

[৮] *প্রাগুক্ত।*

[৯] *প্রাগুক্ত।*

[১০] *প্রাগুক্ত।*

[১১] *প্রাগুক্ত।*

[১২] Policy Research Institute (PRI), *Rohingya crisis and the host community*, 31 July 2019.

[১৩] *প্রাগুক্ত।*

[১৪] *প্রাগুক্ত।*

[১৫] Implications of the Rohingya crisis, Centre for Policy Dialogue (CPD), 2018

[১৬] COAST and CCNF, *Crisis within the Crisis,* July 2018.

[১৭] *প্রাগুক্ত।*

জলবায়ু ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিরূপণ কোনটি অধিক দক্ষ, কার্যকর ও স্বচ্ছ? *

ড. এ কে এনামুল হক, ইশতিয়াক বারী ও ড. রুমি শামিন

প্রেক্ষাপট

বিদ্যমান বৈশ্বিক সাহিত্য মতে, উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে (আয়ার এবং হক, ২০০৯; স্কিপার এবং ডুিবৃহ, ২০০৫)। কিন্তু এ রকম দাবির যৌক্তিকতা থাকলেও এখনো বিতর্ক রয়েছে এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক কোনো তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু প্রকল্প প্রভাবসংক্রান্ত মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সেই শূন্যতা পূরণে চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশে উন্নয়ন অর্থায়নে পরিচালিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে গৃহীত বা বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য বা ভিন্নতা রয়েছে তা পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) মূলত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়। অর্থায়নের ভিন্নতার ভিত্তিতে এই গবেষণায় আরও অনুসন্ধান করা হয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ, কার্যকর ও টেকসই কি না।

গবেষণাপদ্ধতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য বা ভিন্নতা রয়েছে তা নিরূপণের জন্য বেশ কয়েকটি মানদণ্ডে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মতামত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পগুলোর চার ধরনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক. অর্থনৈতিক, খ. দারিদ্র্য বিমোচন, গ. সামাজিক ও ঘ. সহনশীলতা সৃষ্টি। উল্লিখিত চার ধরনের প্রভাব লাইকার্ট মানদণ্ডে সংগৃহীত মতামতের (গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের) ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়।

* ২০১৯ সালের ১০ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

উল্লেখ্য, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে ক. উপকারভোগী, খ. স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারাসহ), গ. প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন। এ ছাড়া দুই ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য বা অমিল আছে তা বোঝার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতকে ওইসিডির ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি (ডিএসি) প্রদত্ত মানদণ্ডের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে মাঠপর্যায়ে প্রকল্পভিত্তিক উপকারভোগী, স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারাসহ) এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের জন্য একটি জরিপ চালানো হয়। এই জরিপটি বাংলাদেশের চারটি উপকূলীয় জেলা বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরার ৩১টি প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হয়। জরিপের আওতায় ১৭টি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ও ১৪টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পের অংশীজন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ (যারা উপকারভোগী নন তারাসহ) সর্বমোট ৩৯০ জন উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রায় ৪০০-এর বেশি প্রকল্প থেকে ১৭টি প্রকল্প (দ্বিস্তরবিশিষ্ট) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাদের মতামত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গবেষণার ফলাফল

বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল প্রবাহ

এখন পর্যন্ত ধনী দেশগুলো প্রায় ৩০ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করলেও এর বিপরীতে প্রকৃত অর্থে ২৬ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মাত্র ৬ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করা হয়েছে। নন-এলডিসি বা স্বল্পোন্নত নয় এমন দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে প্রায় ৭৭ শতাংশ প্রকল্প বরাদ্দ করা হলেও এসব প্রকল্পে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৭৯ শতাংশ। মোট প্রতিশ্রুতির মাত্র ২৩ শতাংশ শুধু স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি লো-ইনকাম এলডিসি দেশগুলোর জন্য। নন-এলডিসি দেশগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক তহবিলের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অর্থনৈতিক প্রভাবের পাঁচটি সূচকের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং গরিব জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের তুলনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো অধিকতর সহায়ক ও কার্যকর। তবে প্রকল্প পর্যায়ে অন্য তিনটি অর্থনৈতিক সূচক যথাক্রমে– বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও উপজেলার উন্নয়নে দুই ধরনের প্রকল্পের প্রভাবের মধ্যে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড) কোনো ভিন্নতা পাওয়া যায়নি।

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচন প্রভাবের অন্তর্গত সাতটি ভিন্ন সূচকের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া অন্য ছয়টি সূচকের ফলাফলের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। অন্যদিকে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ সুবিধা ও বিদ্যুৎ সংযোগের প্রসার, উন্মুক্ত জলাধারে মাছ ধরা, মাছ চাষ ও পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে উভয় ধরনের প্রকল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি।

সারণি ১ : প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের ধারণা

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মতামত	অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মতামত (শতাংশে)			
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
	প্রকল্পের প্রভাব		কার্যক্রমের প্রভাব	
অর্থনৈতিক প্রভাব				
এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন	৭৮	৮৪	৬৯	১০০*
এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি	৭৬	৮১	৬৮	৯৫*
এলাকার বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম	৮৩	৭৯	৭২	৯৬
স্থানীয় জনসাধারণের বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি	৮৪	৭৫	৭৬	১০০
সামগ্রিকভাবে উপজেলাটি লাভবান হয়েছে	৯৫	৭৯	৮৪	১০০
দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রভাব				
এলাকার যাতায়াত সুবিধার উন্নয়ন	৮৫	৮৩	৭৬	১০০
কমিউনিটিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিকাশ	৫২	২৯	২৯	৯৮**
স্থানীয় জনসাধারণের মৎস্য আহরণের সুযোগ বৃদ্ধি	৬১	৮৬	৬৫	৯৯
স্থানীয় কমিউনিটির মাছ চাষের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি	৭৮	৫০	৫৫	৯৮
কৃষকদের জন্য সেচের পানি ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি	৫৬	৪৩	৩২	৯৮ প্রযোজ্য নয়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মতামত	অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মতামত (শতাংশে)			
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
	প্রকল্পের প্রভাব		কার্যক্রমের প্রভাব	
স্থানীয় কমিউনিটির বিদ্যুৎসেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি	৬৭	৬৭	৬০	১০০
এলাকায় পর্যটনশিল্পের প্রসার	৬৪	৭৪	৫৮	১০০
সামাজিক প্রভাব				
নারীর ক্ষমতায়নের বিকাশ	৯৩	৮৭	৯২	৯৬
শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি	৯১	৭৮	৭৮	১০০
স্বাস্থ্যসেবা প্রপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি	৫৩	৬৯	৫৯	১০০ প্রযোজ্য নয়
কমিউনিটিতে স্যানিটেশন সেবার উন্নয়ন বা সুযোগ বৃদ্ধি	৬৭	৩৯	৫২	১০০
সুপেয় পানি পানের সুযোগ বৃদ্ধি	৪০	২০	২৯	৯৮ প্রযোজ্য নয়
পরিবেশগত প্রভাব				
পরিবেশের উন্নয়ন	৭৫*	৩৩	২৮	১০০ প্রযোজ্য নয়
এলাকার জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন	৭৮	৮৩	৬৫	১০০*
মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলা করার সক্ষমতা তৈরি	৭৭	৮৭	৭২	৯৮
বন্যার ঝুঁকি হ্রাস	৭৮	৭৫	৬১	১০০*

তথ্যসূত্র : এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের স্টেকহোল্ডার জরিপ ২০১৮।

বি.দ্র: * সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১০ শতাংশ, ** সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ৫ শতাংশ, ***সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১ শতাংশ। 'প্রযোজ্য নয়' বলতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত উপাত্ত পাওয়া যায়নি।

সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব

সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই বলে মনে করেন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামাজিক প্রভাবের পাঁচটি সূচক যথাক্রমে শিক্ষাসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধায় বিশুদ্ধ খাবার পানির প্রাপ্যতার কোনোটিতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

জলবায়ু সহিষ্ণুতায় সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব

জলবায়ু সহিষ্ণুতায় সক্ষমতা তৈরি ও পরিবেশের ওপর প্রভাব মূল্যায়নে মোট চারটি সূচকের বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিবেশ উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা ও বন্যার ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স কমিটি (ডিএসি) মূল্যায়ন মানদণ্ড

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা মনে করেন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর তুলনায় অধিকতর কার্যকর (উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত সুবিধা বিবেচনায়) এবং দক্ষ (ভালো ব্যবস্থাপনা বিবেচনায়)।

সারণি ২ : প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন মানদণ্ডের ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের শতাংশ

মূল্যায়ন মানদণ্ড	কার্যক্রম অনুযায়ী		তহবিলের উৎস অনুযায়ী	
	বিসিসিটিএফ	এডিপি	জলবায়ু পরিবর্তন	উন্নয়ন
ডিএসি মানদণ্ড				
প্রাসঙ্গিকতা	৯৬	৯৮	৯৬	১০০
কার্যকারিতা	৮৮	৯৭**	৮৭	১০০**
দক্ষতা	৬৪	৯৩***	৬৭	১০০**
সময়মতো বাস্তবায়ন	৭০	৮২	৬৫	১০০**
প্রকল্প সুফলের স্থায়িত্বশীলতা	৭৫	৮৯	৭৫	৯০
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানদণ্ড				
আর্থিক স্বচ্ছতা	৮৬**	৫৭	৬২	১০০*
কাজের মানের গ্রহণযোগ্যতা	৬৩	৯৪***	৭২	৯০
সঠিক বা কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপকারের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ	৮৭	৯২	৮৩	১০০**
স্থানীয় কমিউনিটির কাছে প্রকল্পের স্বচ্ছতা	৮০	৮৮	৭৩	১০০**
প্রকল্প কাজে স্থানীয়দের নিয়োগ প্রদান	৬১	৮৫*	৬৮	৮০

তথ্যসূত্র : এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের স্টেকহোল্ডার জরিপ ২০১৮।

বি.দ্র: * সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১০ শতাংশ, ** সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ৫ শতাংশ, ***সিগনিফিকেন্ট লেভেল যখন ১ শতাংশ।

এ ছাড়া অন্যান্য ডিএসি মানদণ্ড, যেমন উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে প্রকল্পে কর্মকাণ্ডের সংগতি, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পকাজ সমাপ্ত হওয়া এবং টেকসই ইত্যাদি বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর মধ্যে তেমন কোনো ভিন্নতা পাওয়া যায়নি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

জরিপে অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশ মনে করেন, উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলো আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ হলেও সম্পাদিত কাজের মান গ্রহণযোগ্য নয়। এই পরস্পর সাংঘর্ষিক মতামতের দুটো কারণ হতে পারে। (ক) যদিও এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি, সেটা হলো প্রকল্প বাজেট এবং বরাদ্দ বিবেচনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর আকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর তুলনায় গড়ে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি; (খ) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়িত বা বাস্তবায়নরত প্রকল্পগুলোর সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

উপসংহার

গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্পগুলোর উপকারভোগীসহ বিভিন্ন অংশীজনের মতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত (ক) বেশি কার্যকর এবং (খ) বৈদেশিক সাহায্যের মূল্যায়নে ব্যবহৃত ডিএসি মানদণ্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ করা যায় যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে বাস্তবায়নরত বা পরিকল্পনাধীন নতুন প্রকল্পগুলো যদি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তবে তা অধিকতর কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত অনেক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে অধিকতর অভিগম্যতা অর্জনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত এসব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলামূলক কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট ও পৃথক করা গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

Ayers, J. (2009). International funding to support urban adaptation to climate change. Environment and Urbanization, 21(1), 225–240. https://doi.org/10.1177/0956247809103021

Ayers, J. M., & Huq, S. (2009). The Value of Linking Mitigation and Adaptation: A Case Study of Bangladesh. Environmental Management, 43(5), 753–764. https://doi.org/10.1007/s00267-008-9223-2

BCCTF. (2019, April 28). Bangladesh Climate Chnage Trust Fund. Retrieved April 30, 2019,

from http%3A%2F%2Fwww.bcct.gov.bd%2Fsite%2Fpage%2Fe6fb75e8-f5e5-4bed-8adc-e6183e69353a%2F-

Gray, A. (2016, November 4). 5 charts that explain the Paris climate agreement [World Economic Forum]. Retrieved April 30, 2019, from World Economic Forum website: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/5-charts-that-explain-the-paris-climate-agreement/

Haque, A. K. E., Lohano, H. D., Mukhopadhyay, P., Nepal, M., Shafeeqa, F., & Vidanage, S. P. (2019). NDC pledges of South Asia: are the stakeholders onboard? Climatic Change. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02417-6

Klein, R. J. T., Schipper, E. L. F., & Dessai, S. (2005). Integrating mitigation and adaptation into climate and development policy: three research questions. Environmental Science & Policy, 8(6), 579–588. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2005.06.010

OECD. (1991). PRINCIPLES FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT ASSISTANCE (p. 12). Paris: OECD.

Risse, N. (2018, December 18). Bangladesh, UN Consider Expected LDC Graduation in 2024 | News | SDG Knowledge Hub | IISD. Retrieved April 30, 2019, from SDG Knowledge Hub website: https://sdg.iisd.org:443/news/bangladesh-un-consider-expected-ldc-graduation-in-2024/

গবেষক পরিচিতি

অমিত সরকার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিদ্যা ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং ব্যবস্থা (খেলাপি ঋণ), বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্ট নীতি গবেষণা (স্বর্ণ নীতিমালা) দুর্যোগপরবর্তী ত্রাণ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা (জাতীয় সংসদ) জননিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ, মানব পাচার ইত্যাদি।

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেভেলপমেন্ট এভালুয়েশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রায়োগিক কাজের মাধ্যমে তিনি উন্নয়ন গবেষক ও মূল্যায়নকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তিনি উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় (যেমন সরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন, আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা, নারী ও যুবাদের কার্যকর নাগরিক হিসেবে তৈরি, সামাজিক জবাবদিহি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, এনজিও খাতে সুশাসন, কমিউনিটি পর্যায়ে আইনগত সহায়তা, পানি-স্যানিটেশন-স্বাস্থ্যবিধি, টেকসই চিংড়ি চাষ ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি অ্যাকশনএইড, ব্রিটিশ কাউন্সিল, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন।

ইশতিয়াক বারী

বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (ব্যাচেলর ইন সোশ্যাল সায়েন্স) এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর (মাস্টার অব সায়েন্স) সম্পন্ন করেছেন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে যোগদানের আগে তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগে সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি ও বাণিজ্য। ইশতিয়াক বারী বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল ও গবেষণা প্রতিবেদনের প্রণেতা।

ড. এ কে এনামুল হক

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক। তিনি প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনীতির ওপর পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে বন, জ্বালানি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্লেষণসহ পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি। ১৯৯৯ সাল থেকে অধ্যাপক এনামুল হক সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকসের একাডেমিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। তার সম্পাদিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন ইন সাউথ এশিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি ইস্ট ওয়েস্ট জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড সোশ্যাল স্টাডিজের সম্পাদক এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল ইকোনমিকসের জার্নাল ইকোলজি, ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত কমপেন্ডিয়াম অব এনভায়রনমেন্টের প্রথম ভলিউমের প্রণেতা।

কুমার বিশ্বজিত দাশ

ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ অন্যান্য গবেষণার সাথে জড়িত।

গোলাম মহিউদ্দিন

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিটে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভূগোল ও পরিবেশ' বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা; বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনসংক্রান্ত গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) ব্যবস্থাপনায় সুশাসনসংক্রান্ত বিষয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। তিনি অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ণায়ক এবং অভিবাসন খাতে সুশাসনবিষয়ক গবেষণায়ও জড়িত ছিলেন।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ) জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া, তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

দিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততাব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত, বিচার বিভাগ ও ভূমি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত।

নিহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম ও জাতীয় সংসদ)। এ ছাড়া তিনি এনজিও খাত, (বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত) সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মহুয়া রউফ

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন। তিনি কানাডার কার্লটন ইউনিভার্সিটি থেকে 'প্রোগ্রাম ইভালুয়েশন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং নিকারাগুয়ায় ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে 'ভ্যালু চেইন' বিষয়ে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করেন।

মারুফিয়া নূর শিফা

১৫ বছর ধরে মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা, নারী ও সমাজ উন্নয়নের কাজের সাথে যুক্ত আছেন। প্রকল্প পরিচালনা, প্রতিবেদন লেখা, নেটওয়ার্কিং, প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনার আয়োজন, মডিউল ও প্রকাশনা তৈরি, প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে তার পেশাগত দক্ষতা রয়েছে। এ ছাড়া গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি বিষয়েও তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অতিদ্রিদ্র জনগোষ্ঠীবিষয়ক গবেষণাপত্র, পারিবারিক সহিংসতা, কৃষিশ্রমিকদের জীবন, বস্তিবাসী নারীদের জীবনাচরণ বিষয়ে তার কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি মানবাধিকার সংস্থা 'নাগরিক উদ্যোগ'-এ কর্মরত।

মো. শাহনূর রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি হতে উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় টিআই নেপাল-এ দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে এক বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য, পাসপোর্ট সেবা শরণার্থী ব্যবস্থাপনা, নগর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। রবিউল ইসলাম স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, ভূমি অধিগ্রহণ, নিরাপদ খাদ্যসংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি সাউথ-সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নেপাল-এ *ফ্রেডসকর্পসেট* ফেলো হিসেবে কর্মরত।

মো. নেওয়াজুল মওলা

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন ইউনিটে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর থেকে নেওয়াজুল মওলা এশিয়া ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিডিডিআরবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় কাজ করেন। তার গবেষণার বিষয় হচ্ছে জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, জীবিকায়ন, পরিবেশের সাথে অভিযোজন, জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং পরিবেশ পরিবর্তনজনিত অভিবাসন।

মো. মাহ্‌ফুজুল হক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে বিএসসি ও এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি বর্তমানে টিআইবির ক্লাইমেট ফিন্যান্স পলিসি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি (সিএফপিআই) প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত এবং গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি টিআইবি ও হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট তার প্রধান গবেষণার ক্ষেত্র। তার প্রধান গবেষণা কাজের মধ্যে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন ও সুশাসন, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন : প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মো. গোলাম মোস্তফা

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং সুশাসন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। মো. গোলাম মোস্তফা টিআইবির রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও চা-বাগানের কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের অধিকারবিষয়ক গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সেভ দ্য চিলড্রেনে ম্যানেজার, এমআইএস হিসেবে কর্মরত।

মু. জাকির হোসেন খান

টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন ইউনিটে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, পানিসম্পদ খাত, পরিবেশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিবিষয়ক সুশসান ও নীতি বিশ্লেষণ তার গবেষণার বিষয়। তার বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত এনভায়রনমেন্টাল ভ্যালুয়েশন ইন সাউথ এশিয়া, ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি গ্লোবাল আউটলুক ২০১৭-সহ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকস, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকস, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকাশনায় ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গবেষণার বিষয়ে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন।

মো. খোরশেদ আলম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরবর্তীকালে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিষয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া

তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় টিআই নেপালে দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে বছরমেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, সমুদ্রবন্দর ও কাস্টম হাউসের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও জলবায়ু অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেইজলাইন জরিপ পরিচালনাসহ জাতীয় খানা জরিপ ও টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় সহায়কের ভূমিকা পালন করেন।

মো. জুলকারনাইন

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরবর্তীকালে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির খানা জরিপসহ বিভিন্ন জরিপের সাথেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. মোস্তফা কামাল

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি শিক্ষণ খাত, বৈদেশিক অর্থায়ন পরিচালিত এনজিও খাত, আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সরকারিসেবায় অন্তর্ভুক্তি, তৈরি পোষাক খাত, ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যববস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় জরিপ ও গবেষণার সাথে জড়িত। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. শহিদুল ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই বিভাগ থেকে 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব গুড গভর্ন্যান্স : আ স্টাডি অব এরশাদ রেজিম' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি থেকে 'উন্নয়ন পরিকল্পনা'র ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সুশাসন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জবাবদিহিতা, নগর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। টিআইবি ছাড়াও তিনি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে কাজ করেছেন।

ড. মো. রুমি শামিন

কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর স্নাতকোত্তর এবং ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশবিজ্ঞানে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জ্বালানি ও জলবায়ু পরিবর্তন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর নীতিগত প্রভাব, জ্বালানি ও সম্পদের ব্যবহারের ওপর মানব আচরণের প্রভাব, পরিবেশ অর্থনীতি এবং শরণার্থী শিবিরে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা। তার বিভিন্ন প্রকাশনায় জ্বালানির জীবন আবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তননীতি, নগর কৃষি, শহুরে পরিবেশের মূল্য, পরিবেশগত যোগাযোগ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ড. শামিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাইডিং ওবারলিন উইথ এফিশিয়েন্সি রেসপনসিবিলিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে ওবারলিন কলেজে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মোরশেদা আক্তার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সংসদ এবং সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত।

শাম্মী লায়লা ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে জাতীয় সততাব্যবস্থা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দুর্নীতিবিরোধী জাতিসংঘ সনদ ও এর প্রয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ইত্যাদি।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিক চাহিদা সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে ‘বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক ৯টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের দশম সংকলন ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে দেশের শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা ও অধিকার; তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারাংশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

9 789843 487575